॥ এবং ভাঙ্গাকুলো ॥

॥ অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য ॥

প্রাপ্তিস্থান :

কথা ও কাহিনী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা—৭০০০৭৩

EBONG BHANGA KULO

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, মহালয়া।

প্রকাশক : সানুশ্রী ভট্টাচার্য,
পোঃ : বালি-দুর্গাপুর
জেলা : হাওড়া, পিন ৭১১২০১

মুদ্রক : সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : দোলা বসুরায়

এক কাকাতুলো

ঈশ্বর

নগেশ্বর

স্মরণে

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ভূমিকা ॥

সংস্কৃত আলংকারিকদের ব্যাখ্যায় প্রবন্ধের ধাতুগত অর্থ হলো, 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'—রচনার পারম্পর্য ভাব ও ভাষার সংহত রূপের মধ্যে। এই ভাব অংশটিতে মূলত বিস্ফারিত হয় লেখকের স্বতন্ত্র সৃজন-বৈচিত্র। প্রবন্ধ তার ব্যাপ্তি খুঁজে নেয় এই ভাবের বৈচিত্রময় প্রকাশনায়। ইংরেজিতে যেমন Expository এবং Familiar বা Personal Essay-এর অস্তিত্ব রয়েছে, বাংলা ভাষাতেও তেমনি রয়েছে—বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত—এই দু' ধরনের প্রবন্ধ।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অনেক লেখক বিচিত্র বা বিবিধ প্রবন্ধ নাম দিয়ে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। বিষয়গত প্রবন্ধের ধরাবাঁধা ছককে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অগ্রাহ্য করেছে প্রথম থেকেই। বিষয়গত প্রবন্ধে রয়েছে বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের যে দায়, তা ব্যক্তিগত প্রবন্ধে থাকে না। ভাবনা-প্রতিভা সেখানে আত্মকথনের নিজস্ব ভঙ্গিমার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সঞ্চরণশীল। কিছু লেখা চলে হালকা চালে, কিন্তু চিন্তায় অগভীর নয়; আবার কিছু লেখা বহুমাত্রিক ভাবনার আভাসে স্ফুরিত, চলনে মেদবর্জিত ঋজুতা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একাধিক রচনা ও রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বেশ কিছু রচনায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে, বুদ্ধদেব বসু, পরিমল রায়, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাটিকে যথেষ্ট পরিপুষ্ট করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর মজলিসি কথনভঙ্গিমা বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (সুনন্দর জার্নাল) বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক একসময় ব্যক্তিগত গদ্যকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এ-গুলিকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সারিতে ফেলা যায় কিনা সাহিত্যের গবেষকেরা তা বিবেচনা করবেন! তবে তাঁদের সমসাময়িক ও উত্তরসূরি এক ঝাঁক লেখক চটুল ভাব ও ভাষার প্রলোভনে ব্যক্তিগত গদ্যকে 'রম্যরচনা'র স্তরে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মূল সুরটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনষ্ট করেছেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সার্থক লেখক তিনিই, যিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তের অন্তর্লীন ভাবনাকে যুক্তি-প্রমাণে ভারী না-করে রসবোধে ভাসিয়ে তোলেন; এবং বাচনভঙ্গির প্রসাদগুণে তার চলনে আনেন গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা।

২.

শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের এই 'এবং ভাঙা কুলো' গ্রন্থটি সেদিক থেকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধমালার একটি মনোগ্রাহী সংকলন। লেখক দর্শনের একজন প্রবীন অধ্যাপক। জীবনের নানা নিয়মবিধি, গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র, টানাপোড়েন,

প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন ও শূন্যতা তাঁর দার্শনিক কলমের অনায়াসভঙ্গিতে অনুযোজিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। ভাষারীতি সংযত, গতিশীল ও তির্যক-তীক্ষ্ন ; কোথাও গুরুগম্ভীর নয়। ধূসর পাতার জ্ঞান, নীতিবাক্য বা অযাচিত পাণ্ডিত্য বর্ষণের চেষ্টা নেই তাঁর কলমে। নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ যে-জীবন, তার ওপরে নানাভাবে আলো ফেলেছেন তিনি—নানা চিত্রকল্পে ও বর্ণনায়। মানুষের Destiny যে কত অমোঘ ও প্রাকৃতিক নিয়মের আজ্ঞাবহ সেই চরম সত্যের উপলব্ধি তিনি নানাভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, '...মনে হয় আর একবার জীবনটাকে প্রথম থেকে শুরু করলে কতই না ভালো হত। সঠিক করে বেঁচে নেওয়া যেত। কিন্তু জীবন একটাই, উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী একটাই। মাঝপথে ফিরে যাবার পথ নেই।' (জীবন প্রবাহ)। অন্য এক প্রবন্ধে লেখেন, 'আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই যদিগুলো এক একটি মোড় বা সন্ধিস্থল।...দুই পথেই একই সঙ্গে যাওয়া যায় না। তাই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়, এক বা একাধিক বিকল্প সম্ভাবনা ছেড়ে দিতেই হয়। একটাকেই বেছে নিতে হয়। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা জীবন নিজেই পছন্দ করে না, সায় দেয় না।' (যদি)।

মানুষের জীবনে তো এরকম কম-বেশি স্বপ্নের ঘোর ও বাস্তবতার আলোড়ন, দুটোই প্রবহমান ; এবং সেই অমোঘকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। তবু কি স্বপ্নের অন্ত আছে! স্বপ্ন অপারিসীম। লেখক তাই প্রসঙ্গতই চলে আসেন এই সিদ্ধান্তে যে, ফিরে যাবার পথ নেই বটে কিন্তু ফিরে দেখার সুযোগ তো আছে! 'মানুষ ইচ্ছে করলেই দ্বিজ হতে পারে। একবার সে সময়ের প্রবাহে বাঁচে, দেহ-জীবন যাপন করে। দ্বিতীয়বার সে ইচ্ছে করলেই সময়হীন কল্পনার প্রবাহে বেঁচে নিতে পারে।...আমরা সকলেই কমবেশি এই দ্বিতীয় জীবন যাপন করি ; কিন্তু অধিকাংশই সেই দ্বিতীয় জীবন অপরের সঙ্গে ভাগ করে বাঁচি না।...যদি সেই ক্ষমতা আমাদের থাকত যা থাকলে এই অ-সময়ের জীবনের অলস অনুভবগুলোকে অপরের মনের দুয়ারে পেঁছে দিতে পারতাম তাহলে এই অপেক্ষাটুকুও কেমন অনায়াসেই সফল হয়ে উঠতো! সব অনুভবই তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; তার মধ্যেও যদি কোনও অনুভবকে দিয়ে অপরের মনকে ছুঁয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই অনুভব তো আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না। (জীবন প্রবাহ)।

গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ২৪টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলিত। এক একটি গদ্য যেন জীবনের এক একটি দিকের পুনর্বিবেচনা। সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে শৈশবের মধুর স্মৃতি, বল্গাহীন তারুণ্য, প্রৌঢ়ত্বের স্থিরতা, বার্ধক্যের সংকট। কিছু গদ্য (যেমন 'সম্পর্ক', 'অভাব' 'পরগাছা জীবন', 'শূন্যতা') স্থির

বিষয়মুখী হয়েও জীবনসম্পর্কে এক সামগ্রিক চিন্তার সূত্র খুলে দেয়। 'জীবন প্রবাহ', 'যদি', 'শত আর শাশ্বত' প্রবন্ধগুলি যেন মৌলিক অনুভবের সংহত আবেগময় অভিব্যক্তি। শেষ গদ্যটির নাম 'চশমা আর ভাঙ্গা কুলো'। লেখক শুরু করেছেন, 'কতো রকমের চশমা দিয়েই তো জীবনকে দেখলাম। সকলেই দেখেন। তারপর এক সময় চশমাগুলো নিজেরাই 'ছানি'র পদশব্দে ভারী হতে হতে বোতলের তলা, অথবা চ্যাপ্টা পেপারওয়েট হয়ে সব কিছুকেই আবছা করে দেয়।'

কী ভাবে এক জীবন পাল্টে যায় অন্য জীবনে—সংসারের নিয়মে, প্রকৃতির নিয়মে, রক্তের নিয়মে। একদিন বার্ধক্য এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে এবং মানুষ তখন 'ভাঙ্গা কুলো' অথবা 'বেবিসিটার'। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখক পরিবেশন করেছেন প্রয়োজনীয় মানসিক আয়োজনসমূহ।

গ্রন্থটিতে সময় মনে হয় নিজেই একটি চরিত্র। সে কখনো জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেকার পরিমিতি, কখনো রূপ-রূপান্তরের প্রতিভূ আবার কখনো দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সোপান। ঠিক সময়টিকে কেউ কাজে লাগাতে পারে, কেউ হেলাফেলা করে। কেউ আবার সময়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কাটিয়ে দেয় এক নতুন স্বর্ণশস্যের স্বপ্নে। এরপর আছে সময়ের নিজস্ব অভিব্যক্তি। যৌবনে মানুষ সময়কে ঝড় হিসেবে পেতে চায়, আবার 'পারানির কড়ির প্রার্থনায় অঞ্জলিবদ্ধ অপেক্ষা যখন অনিবার্য'—তখন যুদ্ধ নয়, সংঘর্ষ নয়; স্নিগ্ধ-মধুর বাতাসের প্রত্যাশা সময়ের কাছে। এমনতরো অনেক মহৎ উপলব্ধির শরিক হবেন পাঠক গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

॥ লেখক পরিচিতি ॥

অর্ধেন্দু শেখরের জন্ম পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে যেখানে আদরে ও উপেক্ষায় কেটেছে তাঁর দুরন্ত বাল্যকাল যৌথ পরিবারের বিচিত্র তাপ ও সন্তাপের আকর্ষণ-বিকর্ষণে। সেখানে খেলার মাঠ-প্রান্তর জাঙ্গাল-নদী আর ফলন্ত ফসলের উদার ক্যানভাসে নিকট-দূরের সকলেই তাঁর মননে ফেলেছে গভীর ছাপ। কৈশোরে তিনি পরবাসী অংকন শিল্পী হবার একাগ্র প্রত্যাশায়, কিন্তু স্থানীয় ও পারিবারিক দুর্যোগের যুগপৎ আক্রমণ নান্দনিক জগৎ থেকে উৎপাটিত করে তাঁকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত করে কোলকাতায় এবং পরে সেখান থেকে ঢাকায়। শূন্য পুঁজি নিয়ে জীবিকার সন্ধানে এক উদ্যোগ থেকে ভিন্নতর উদ্যোগের বাস্তব পটভূমিতে আশানিরাশার টানাপোড়েনে যথার্থ অবলম্বনের সন্ধানে তিনি তখন অস্থির। সেই সময় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় তাঁর জীবনধারা প্রবাহিত হয় ভিন্নতর খাতে। বৃদ্ধ পিতামাতা আর নাবালক ভ্রাতা ভগিনীরা সদ্যস্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে যাতে ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ে অনেকের মত নিঃশেষে হারিয়ে না গিয়ে উন্নত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সতেরো বছরের এই তরুণকে নিতে হয় নিজস্কন্ধে। সেই কর্তব্য কঠোর ভাবে পালন করার পথে আর কোনও দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত তাঁর মেলেনি। ভিতরের ও বাইরের পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে সরিয়ে সরিয়ে এক অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে উত্তরণের অবিরাম যে ঘটনাপুঞ্জ তাঁর দৃঢ়চিত্ত যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলিকে সতত দুর্বার গতিসম্পন্ন করে রেখেছিল সেই পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থার অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত অন্যতর এক প্রসঙ্গ। কিন্তু মানসিক ভাবে সুস্থিত হতে হতে আর না হতে হতে সময় তাঁকে পৌঁছে দেয় বার্ধক্যের মধ্যপর্বে যখন সরকারী কলেজের কৃতি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় সমাসন্ন। আর এই পর্যায়েই তাঁর কোমল শিল্পীমনে সুদীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা বিচিত্র অনুভবগুলো প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকেই অবলম্বন করে নেয়। অধুনা সুখ্যাত এক সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এবং অতঃপর আরও হতে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস, কারণ অমৃতের সন্ধানে আজও তিনি এক ক্লান্তিহীন তরুণ পথিক। সাহিত্যের অঙ্গনে অধ্যাপক অর্ধেন্দু শেখরের প্রবেশ বিলম্বিত অবশ্যই, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। ঘটনার ঘনঘটা যদিও তাকে তাড়িত করেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে, যখন মাঝে মাঝেই ঘটেছে তাঁর আকস্মিক প্রান্তবদল, তবুও তাঁর শিল্পীসত্তা প্রত্যয়ের বর্তিকায় ভাস্বর হয়ে অনুশীলনে অর্জিত অভিধার ধারায় সুস্নাত হতে হতে সর্বদাই সৃষ্টিশীল থেকেছে তাঁর অন্তরের নিভৃত উপত্যকায়।

তাঁর রচনায় সমান গুরুত্বে উম্মোচিত একদিকে হৃদয়সঞ্জাত সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি অন্যদিকে মেধানির্দেশিত শাণিত বিচারবোধ। আর সর্বত্র ছড়িয়ে

আছে প্রকৃতির সবুজ, আকাশের নীল, পাখির গান এবং বাতাসের মৃদু ব্যজন। ছোট ছোট স্পর্শের মতো। (এবং জলবাংলার মনচিত্র)। নারীর স্নেহ-বিশ্বাস-ভালবাসার প্রেরণা আশ্চর্য যাদুমন্ত্রের মত কি ভাবে পুরুষকে ও পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তোলে তা যেমন তাঁর লেখায় উদ্ভাসিত, পুরুষ শাসিত সমাজে অত্যাচারিত নারীর যন্ত্রণার কথাও তেমনি তাঁর গল্পে নিপুণভাবে বিধৃত। (এবং তুমি, এবং প্রেম-অপ্রেম)। আবার ভোগ্যপণ্যবাদী সামাজিক প্রেক্ষাপটে শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মিক বিপন্নতার বিষয়টিও বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর লেখায় মর্মস্পর্শীভাবে বিশ্লেষিত। (এবং ভাঙ্গাকুলো, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা) এমন কি যখন তিনি ছোটদের জন্য সাবলীল রচনায় মগ্ন তখনও মনে হয় একই সঙ্গে তিনি বড়দের বোধকেও প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। (এবং ভূত)। আন্তরিকতা ও সংবেদনশীলতার সার্থক মেলবন্ধন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থাপনাকে রসগ্রাহী করে তুলেছে যা আমাদের মত সাধারণ পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। জড়তামুক্ত প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব টেকনিকটি এখন তাঁর আয়ত্বাধীন বলেই মনে হয়। তাঁর পরবর্তী রচনার জন্যেও আমরা তাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকবো।

—প্রকাশক।

॥ পূর্বাভাষ ॥

লেখাগুলি লেখকের ষাট ছুঁইছুঁই বয়সের এবং সম্ভবতঃ ঐ বয়সের পাঠকদের জন্যই লেখা বলে প্রথমে মনে হতে পারে। যে বয়সে সংসার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে নতুন করে কিছু গড়ে তোলার উদ্যম প্রায় অবসিত হয়ে যায়; কর্মহীন একাকিত্বের ক্লান্তিকর দুর্বিসহ যন্ত্রণা নিয়ে 'কোথায় শান্তি-স্বর্গ' বলে হা-পিত্যেশ করে বেড়াতে হয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত বর্তমানকে প্রত্যাখ্যানের ঝোঁকে খিড়কি দ্বার দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় মনোরম অতীতের লুপ্ত সাম্রাজ্যে। মানসিক নৈরাজ্যের সেই দিনগুলিকে কি করে সুন্দর করে পরিপাটি করে সার্থক করে তোলা যায় এ লেখাগুলি কখনও কখনও তারই এক পথ-নির্দেশ অবশ্যই। কিন্তু যেহেতু চাপিয়ে দেওয়া কোনও দায়বদ্ধতার গণ্ডি লেখকের নেই তাই বোধহয় লঘুপদ প্রজাপতির মতই কখনও তিনি মুক্তপক্ষ, শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত প্রগাঢ় অনুভবগুলিকে ছুঁয়েছুঁয়েই যেন তখন তাঁর নন্দিত সঞ্চরণ। সে জন্যই—বোধহয় বিষয় নির্বাচনে আকাশই তাঁর সীমানা। তিনি সম্পর্কের সূত্র ধরে টানেন, সমঝোতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, অন্তপর্যায়ের জীবন-প্রবাহ নিয়ে ঔচিত্যের দিক-চিহ্ন নির্দিষ্ট করেন। আবার কখনও 'চশমা আর ভাঙ্গাকুলো' হওয়া অবসর জীবন বা বয়স নিয়ে বাস্তব কিছু পরিকল্পনাকে আভাসিত করেন। 'প্রেম ভালবাসা একাকিত্ব', 'শত আর শাশ্বত', 'ঝড়-বাতাস' 'অভাব'—ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের রচনাগুলির মধ্যে টেনে আনেন এরকম হরেকরকম বিষয় যা প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়েই আমাদের মননে তরঙ্গের অভিঘাত তোলে কিন্তু সেগুলিই তাঁর কলমে বিশ্লেষিত হয়ে এক নতুন মাত্রা আনে। এক 'মন'কে নিয়েই কত যে তাঁর বক্তব্য যার বর্ণালি পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। অসংখ্য কঠিন কথা তিনি পর্যাপ্ত সহজ করে বলতে পারেন তাই শুধু বিশেষ বয়সেরই নয়, সর্বশ্রেণীর পাঠকই রচনাগুলির মধ্যে রসের নিশানা খুঁজে পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যাপনাসূত্রে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তথ্যগুলি নিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে লেখককে। সেই অভিজ্ঞার উদ্ভাস রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে দ্যুতি ছড়ায়, কিন্তু আলোর সেই ঝলকানিতে পাঠকচিত্ত ধাঁধিয়ে না গিয়ে ঝলমল করে ওঠে; তাঁর কারণ বোধহয় এই যে রচনাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে চালিকাশক্তি হয়ে যা বিরাজিত তা হল হৃদয়—প্রগাঢ়তায় গভীর ব্যাপকতায় বিস্তৃত ঔদার্যে নিঃসীম। কোনও ভাবনাই তাই জীবন-বিমুখ নয়; যেজন্য বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্যগুলিও নিছক তার্কিক কচ্‌কচিতে আটকে থাকেনি। বরঞ্চ জীবন-যাপনের অতিবাস্তব প্রশ্নগুলিকেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে লেখক এমন স্থানে এসে থেমে যান যখন পাঠক আশ্চর্যবিস্ময়ে এক ভিন্নতর জীবনবোধের উত্তালগ্নকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ

করেন। শাণিত কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে স্নিগ্ধ তাঁর বাক-ভঙ্গীটির বাঁধন কখনও কখনও এমনই সহজ আর সাবলীল যে পাঠকের পক্ষে বিনা আয়াসে চড়াই-উতরাইগুলো পার হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায়; তখন তাঁর মনে হতেই পারে যে জীবনের বাঁকে বাঁকে এত যে কথা আছে, পর্বে পর্বে এত যে অনুভাবনা আছে, সেগুলি একান্ত আপন হয়েও এমন করে তো ধরা দেয়নি এতদিন!

সাজানো ফুলবাগানের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে একেবারে ওপারে একান্ত আপন শক্তিতেই বেড়ে ওঠা একটা শিমুল গাছ। চারদিকের তাচ্ছিল্য উপহাস অনুকম্পা ঘৃণা আর হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিদ্রোহের দ্যোতক অসংখ্য কণ্টকে আকীর্ণ ওর কাণ্ড। ওর সমুন্নত বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাগুলিতে যেন ধ্বনিত হয়ে চলেছে প্রসারিত হৃদয়ের আকুলতা। নির্বান্ধব লাল ফুল কি ওর বজ্রমুষ্টি আত্মঘোষণা! ফলের পুরু আবরণটি কি ওর বৈদগ্ধ্যের আপাত-কঠিন বর্ম যার মধ্যে পরম স্নেহের নিরাপত্তায় লালিত ফলের সারাংশ রজতশুভ্র অংশু যা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নমনীয় অমলিন সৌন্দর্যের প্রতীক; যা উন্মোচিত হতে হতে রেণু রেণু হয়ে দিকবিদিকে ছড়িয়ে যায়, আবার সংগৃহীত হয়ে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে আনে শান্তির করস্পর্শ।

আর একটি গাছ; কৃষ্ণচূড়া। পুষ্পকুঞ্জের সীমানা যেখানে শুরু সেখানে গৃহ-বাতায়নের অতি নিকটে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে ঊর্ধ্বশির বৃক্ষটি মৃদুমন্দ আন্দোলিত। নয়নমনোহর সুমসৃণ এর ত্বক—সে কি জীবনে পাওয়া সব দহন বেদনা যন্ত্রণাকে আত্মীকরণ করে স্থিতধী হয়েছে বলে! তার সবুজপত্রের সূক্ষ্ম আলপনা কি জগতের আনন্দযজ্ঞে উত্তরণের হর্ষে! ছত্রাকারে ছড়ানো দৃষ্টি-নন্দন ওর লোহিত পুষ্পাঞ্জলি বুঝি সায়াহ্নে সূর্যের রক্তিম আভার মতই শান্ত বর্ণময় রমনীয় সহৃদয় ও মমতাবর্ষী।

সাহিত্যের ফুলবাগিচায় যেখানে গোলাপ হাসনুহানা রজনীগন্ধা চামেলী যুঁই গন্ধরাজ বেলি এবং আরও অজস্র বনেদী অভিজাতেরা আপন আপন নৃত্যছন্দে আনন্দের হাট বসিয়েছে সেখানে এই নব্যপ্রস্ফুটিত অনামী পুষ্প-সম্ভারের স্থানটি কোথায় হবে তার ভাবনা ভবিষ্যতের। তবে লেখাগুলি পড়তে পড়তে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ঐ দুটি বৃক্ষের রূপকল্প আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। আর সেই সব রূপকল্প কখনও এককভাবে কখনও পর্যায়ক্রমে কখনওবা মিলে মিশে অনাস্বাদিত রসের সৌন্দর্যে একাকার হয়ে যায়।

সুনীল আচার্য

।। লেখকের কথা ।।

লেখার কাজ শেষ হলে লেখকের দায় বেড়ে যায়। অসম্পূর্ণতার দায়, ভাল করে বলতে না পারার দায় এবং ভুলভ্রান্তির দায়। সে সব বইবার মতো মনটি তৈরি করে চলেছি। কিন্তু যাদের চেষ্টায় এবং যত্নে লেখাটুকু বই হয়ে প্রকাশ পায় সেই আপনমন্যদের ভালবাসা আর ঐকান্তিকতার প্রস্রবণ এক অন্যতর দায়ভার স্বাভাবিকই বইতে হয়—সেক্ষেত্রে অবশ্য আনন্দটুকু সঙ্গী হয়ে থাকে বলে ক্লান্তি নয় তৃপ্তি ঘটে।

সুনীল দিল চিন্তার আকাশ, সমীর দিল ভাবনায় ব্যঞ্জন আর সুব্রত করল ছাপার ব্রত পালন। সব মিলে যা দাঁড়াল তার ভাল অংশ ওদের, মন্দের দায় আমার। আর ভাল মন্দ মিলেই হবে পাঠকের মূল্যায়ন। তথাস্তু।

*　　*　　*　　*

সংযোজন ঃ

সুখ্যাত কবি প্রাবন্ধিক শ্রীসুনীল কুমার নন্দী মহাশয় সাগ্রহে ভূমিকা লেখার গুরুভার বহন করেছেন আর আমার লঘুভার মনকে তাঁর মনস্বী মনের প্রশস্তচিত্ততার ছোঁয়ায় আপন করে নিয়েছেন; কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ব্যাপারটাকে কেমন যেন একেবারেই প্রাসঙ্গিক থাকতে দিলেন না।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

॥ জীবন প্রবাহ ॥

সময়কে অনেকেই নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবনও তো নদীর মতো। দু'টো কি আলাদা আলাদা পথে বয়ে চলে? বহমানতা দু'টি ক্ষেত্রেই সমান সজীব। নদীকে প্রশ্ন কর, অথবা জীবনকে : কোথা হইতে আসিয়াছ? জিজ্ঞাসা সমান নিরুত্তর থেকে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন যখন আছে উত্তরের প্রচেষ্টাও ঠিক তেমনি থাকবে। বিজ্ঞানে, দর্শনে, কাব্যে আর ধর্মবিশ্বাসে নানান উত্তর এই প্রশ্নের জটিলতা ভেদ করতে চাইছে। নদীকে প্রশ্ন কর, অথবা জীবনকে : কোথায় যাইতেছ? মৃত্যুর মোহনায় ছাড়া সেখানেও শেষ উত্তর দেখি না। মৃত্যু যেমন একটা পর্বান্ত, মোহনাও তেমনি একটা পর্যায়ান্ত মাত্র। উৎস বিষয়েও সম্যক জানি না, সমাপ্তির সীমানা সম্পর্কেও যথার্থ কোনও ধারণা গড়ে উঠলো না। কিন্তু একটা দীর্ঘ জীবন তো বহমান থেকে বিকেলের অবেলায় এসে পৌঁছে গেল। সকালে খেলাধুলোয় সময় কাটালাম, দিনের সকল সময়টাই সংসারের খড়কুটো সংগ্রহ আর প্রয়োজনের খিদমদগারি করে আনন্দ-বিষাদে পার করে দিলাম। আর এখন মোহনার কাছাকাছি এসে বার বারই ফেলে আসা পথটুকু ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করি। আমরা সকলেই তাই করি, করতে বাধ্য হই। কিন্তু কেন? কেন এই পর্বান্ত পর্যায়ান্ত হারিয়ে যাওয়ার অনুভব আমাদের আঁচলের অবশিষ্ট সম্পদ বলে মনে হবে?

এই যে একটা জীবন না চাইতেই পেলাম, এটা নিয়ে কি করব, কি করার আছে, কিভাবে একে সার্থক করে তোলা যায়—এ-সব প্রশ্ন ছোটবেলার প্রশ্নই নয়। দিনের তাপে ঘর্মাক্ত সংসার-জীবনে এ-প্রশ্ন তোলার মতো সময়ই তো পেলাম না; এখন এই জীবনের অপরাহ্ণে আমাদের সকলেরই যখন সময় হল, গতানুগতিক আটপৌরে ঘড়ির চলনে বাঁধা সহস্রপদীর বাইরে চোখ তুলে তাকানোর, তখন তিনমাথা জীবনের শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতির শত সহস্র অব্যবস্থার মধ্যে, মনে হয়, এটিই সব থেকে বড় অব্যবস্থা! সময় যখন সামনে থাকে তখন প্রশ্ন আসে না; আর সময় যখন পিছনে চলে যায় তখন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা হাপিত্যেশ করে লাঠির উপর মাথার ভার রেখে ভাবতে বসি! সব

ট্র্যাজেডীই বিষয় ও সময়-কেন্দ্রিক। এই ট্র্যাজেডী জীবন-কেন্দ্রিক। এটাই, তাই, বোধহয় সর্ববৃহৎ ট্র্যাজেডী!

আমাদের সকলের জীবনেই তো সমস্যা আসে। তার সমাধানের জন্যেও তো আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলি। কাজচলা গোছের সমাধান পেলেই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অন্য সমস্যায় মন দেই। তেমনই জীবনের মোড়ে মোড়ে অনেক প্রশ্ন খড়্গের ধারাল বাঁকানো বক্র-দৃষ্টি নিয়ে মূর্তিমান গলা ধাক্কার মতো আমাদের চোখে চোখ পাকিয়ে তাকায়। বারে বারেই তাকিয়ে কখনও ভয় দেখিয়েছে, কখনও বিব্রত করেছে, কখনও অস্তিত্বের গভীর পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেছে। সেই সব তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রশ্নের মুখোমুখী হয়ে সমাধানের জন্যে হাঁকপাঁক করেছি, পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছি, ধামাচাপা দিয়ে এড়িয়ে গেছি অথবা তীব্রতর রক্তচক্ষু দেখিয়ে প্রশ্নকেই ধমকিয়ে উঠেছি। খেলতে গিয়ে যেমন জয়ের লক্ষ্যটিই সামনে থাকে জীবন প্রবাহে চলতে গিয়েও তেমনি স্বার্থের সিদ্ধিটিই চোখে ভাসে। আর এই করতে গিয়েই তো আমরা প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছি। র‍্যাশনের প্রশ্নের কাছে জীবনের উৎসের প্রশ্ন মার খেয়ে গেছে; পুজো-ষষ্ঠীর বাজার-সমস্যার কাছে অনেক 'কেন, কোথায় কি উদ্দেশ্যে'-র প্রশ্ন অতলে হারিয়ে গেছে। স্বার্থ বড় বালাই, প্রয়োজন ভীষণ কড়া শিক্ষক, আর বর্তমানগুলোর তাপ এবং চাপ আমাদের সকল চলমান মুহূর্তগুলোকে অধিকার করে নিঃশেষে শুষে নেয়। তাই বোধ হয় যাদের পিছনে ফেলে আসি, নিচে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাই, যে সব প্রশ্নের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেবার মতো মন ও সময় করে উঠতে পারি না, তারাই, সেই সব প্রশ্নই মহীরূহ হয়ে অলস অনুভবে বড় বড় ঢেউ তোলে! হবেও বা!

সুদূর অতীতের কোন্ অচেনা অজানা জীবন থেকে এই জীবনের যে শুরুটি হয়েছিল তা বুঝে উঠতে উঠতেই তো বেলা বেড়ে যায়। আনন্দের ঝর্ণাধারায় উপলখণ্ডে ঘা দিয়ে দিয়ে উচ্ছল জীবন যখন প্রবাহের গতিটি পায় তখন একদিকে তার শক্তি বাড়ে অন্যদিকে দিক পাল্টাতে থাকে। জীবনের জটিল জঙ্গল, পাথর পাহাড় পার হয়ে হয়ে যখন সে সমতল সংসারের পলিমাটিতে ঘুরপাক খেতে খেতে সটান সামনে এগিয়ে যেতে চায় তখন বার বার পাড় ভাঙে, জলঘোলা হয়, বাঁকে বাঁকে মোড় নিতে থাকে। জীবনে জীবন যোগ হয়, জীবন হারায়, আনন্দের সংগ্রহ বাড়ে, বেদনার থলিটি পূর্ণ হতে থাকে। সংসার বড় হয়, সংসার ছোট হয়; জন্ম আসে, মৃত্যু পথ থেকে তুলে নেয় আপনজনদের। প্রবাহ

থেমে থাকে না, থাকতে পারে না। একই আনন্দকে অনন্তকাল ধরে সঙ্গী করা যায় না ; একই বিরহকে দীর্ঘদিন বহন করা চলে না। প্রবাহের নিজের টানে জীবন এগিয়ে যায়, যেতে বাধ্য হয়। প্রকৃতিতে যেমন দিনের পরে রাত্রি আহ্নিকগতির অনিবার্য নিয়মেই চক্রাকার, শীতের পরে বসন্ত হয়ে বার্ষিকগতির আবর্তনেই ছয় ঋতুর আবির্ভাব-তিরোধান ঘটে, আমাদের জীবন প্রবাহেও তো তেমনিই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, জন্ম-মৃত্যু ঘুরে ঘুরে আসে। আসে এবং চলে যায়। চলে যেতেই হয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র প্রবাহই দীর্ঘস্থায়ী। এই প্রবাহের একই স্থানে দু'বার ডুব দেওয়া যায় কি ?

এই ছুটে চলতে গিয়েই একদিন চলাটাই নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। চলাটাই সংসার। আমরা সব কিছুকেই সংসারের কষ্টিপাথরে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে পরখ করি। কাজের বস্তুর ভিড় বাড়ে, অকাজের জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দেই। এই করতে গিয়েই তো আমরা পরশপাথরকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি অনায়াসে অবহেলায়। দিয়েই থাকি।

শিল্পের সৌন্দর্য, কবিতার অনুভব, নীতিশাস্ত্রের মহান আদর্শ আর দর্শনের গভীর অনুসন্ধান সংসারের কোন্ কাজে লাগে ? ক্ষুধার অন্ন ? দেহের আবরণ ? বাসগৃহের সংস্থান ? শিশুর মুখে দুধের যোগান ? তাহলে ? সংসারের প্রবাহ তাই ঘোলা জলের প্রবাহ, হিসেব-নিকেশের কাদামাটির মেশামেশি। অন্যদৃষ্টি, স্বচ্ছদৃষ্টি হবার সময় কোথায়, সুযোগ কোথায় ? গতি বাড়ে, প্রসার বাড়ে, ঘোলা জলের তীব্রতা বাড়ে। যৌবন এগিয়ে যায় প্রৌঢ়ত্বের দিকে, প্রৌঢ়ত্ব এগিয়ে যায় মন্থরগতি বার্ধক্যের প্রান্তে, মোহনার কাছাকাছি। থেমে যায় গতি, শক্তি এবং সংসারের টান। জীবন প্রবাহের জোয়ার শেষে ভাঁটার সময় স্থায়ী হয়ে অলস অবসর নেমে আসে সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তখন থাকে শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। থাকে ফিরে ফিরে দেখা, অলস অনুভব এবং অকারণ উৎকণ্ঠা।

প্রবাহ যখন তরুণ তখন উচ্চকিত অনুভবে জীবনে জীবন যোগ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে তীব্র। বন্ধু-প্রবাহ প্রাণের স্পর্শে সমৃদ্ধ করে। যখন যুবক তখন নোতুন জীবন যুক্ত হয়ে উদ্বেলিত গতিপথকে তেজে আর উপলব্ধিতে সার্থক করে তোলে। জীবন বেড়ে ওঠে, ফুলে ওঠে, জোয়ারের উত্তাল আবেগে ধেয়ে চলে চেতনার গভীরে, সুন্দরের অঙ্গনে আর প্রাণের প্রসারে। অনেক কিছুই তখন জানা থাকে না, চেনা যায় না, বোঝা হয়ে ওঠে না। তাই ফুলের সঙ্গে কাঁটার মতো সেইসব অচেনা, অজানা অবুঝ বিষয়গুলো প্রৌঢ়ত্বের ঢিলা গতিতে

প্রবাহের তলদেশে পলি হয়ে জমে উঠতে থাকে। যেসব সমস্যাকে এড়িয়ে এসেছি, পাশ কাটিয়ে সরে এসেছি তারা সোজা সামনে তাকায়। যেসব প্রশ্নকে হাতের এক ঝটকায় নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছি, তারা এখন পথরোধ করে উত্তরের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে অপেক্ষা করে।

তাই তো মনে হয় আর একবার জীবনটাকে প্রথম থেকে শুরু করতে পারলে কতই না ভাল হত! সঠিক করে বেঁচে নেওয়া যেতো। কিন্তু জীবন একটাই, উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী একটাই। মাঝ পথে ফিরে যাবার পথই নেই।

ফিরে যাবার পথ নেই; কিন্তু ফিরে দেখার সুযোগ আছে। তাই বা কম কি? প্রাণী জগতে মানুষেরই এই সুযোগ আছে মাত্র। প্রাণীরা একবারই বাঁচে; মানুষ ইচ্ছে করলেই দ্বিজ হতে পারে। একবার সে সময়ের প্রবাহে বাঁচে, দেহ-জীবন যাপন করে। দ্বিতীয়বার সে ইচ্ছে করলেই সময়হীন কল্পনার প্রবাহে বেঁচে নিতে পারে। এই বাঁচাটার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন নেই, সংসারের দায় নেই, সমস্যার কণ্টক নেই। আমরা সকলেই কমবেশি এই দ্বিতীয় জীবন যাপন করি; কিন্তু অধিকাংশই সেই দ্বিতীয় জীবন অপরের সঙ্গে ভাগ করে বাঁচি না। একা একা, একেবারে নিজের মনের মধ্যে বেঁচে নেই। আর অন্য অনেকেই তাঁদের একাকিত্বকে সৃষ্টিশীল অনুভবের তরঙ্গে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে সার্বিক করে তোলেন। নিজেরা তাঁরা একা একা বাস করেও সকলের সঙ্গে, সকলের হয়ে, বাঁচতে থাকেন। কবিতায়, গানে, শিল্পে আর সাহিত্যে যেমন তারা সর্বজনের মনের কাছে নিজেদের দ্বিতীয় জীবন পৌঁছে দেন তেমনি তাঁরা একাকিত্বের বোঝাটিও মনের হাটের ঠিক মাঝখানটিতে নামিয়ে দিয়ে চিরায়ত হয়ে ওঠেন।

আমরা যারা নেহাতই সংসারের প্রয়োজন মিটিয়ে মোহনায় পৌঁছে যাই, আমরা যারা একটাই জীবন বাঁচতে বাঁচতে একসময়ে ফুরিয়ে যাই, তারাই অলস অবসরে অপেক্ষাকে একাগ্র করে কষ্ট পাই। যদি সেই ক্ষমতা আমাদের থাকত যা থাকলে এই অ-সময়ের জীবনের অলস অনুভবগুলোকে অপরের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারতাম তাহলে এই অপেক্ষাটুকুও কেমন অনায়াসেই সফল হয়ে উঠতো! সব অনুভবই তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক; তার মধ্যেও যদি কোনও অনুভবকে দিয়ে অপরের মনকে ছুঁয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই অনুভব তো আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না!

॥ বয়স ॥

বয়স বেশ একটা মজার ব্যাপার মানুষের জীবনে। কিন্তু একে নিয়ে মজা করা চলবে না যতক্ষণ বয়সটি একটা দন্তহীন অবস্থানে না পেঁছোচ্ছে। ছোটো বয়সটা ছেলেমির জন্যে উপযুক্ত হলেও আমাদের অনেকেরই তো মনে মনে বয়সটা বেশ আর বাড়তেই পায় না! সূর্যের অনিবার্য আহ্নিক-বার্ষিক গতির টানে এরা সারাজীবনই ঠোক্কর খেতে খেতে অস্ত গগনে পেঁছোয়। আবার এর উল্টোটাও কম দেখতে পাওয়া যায় তা নয়। বাইরের আস্তরণটা বেশ সবুজ-সবুজ দেখালেও অনেকেরই ভিতরটা বেশ পাকা পাকা গড়ে ওঠে। এদের অকালপক্ক বলে পাশ কাটালেই তো আর এরা মিথ্যে হয়ে যায় না! কবি সাহিত্যিকদের বেলায় আহ্নিক-বার্ষিকের অনিবার্যতা মার খেয়ে যায় শুনেছি; ওঁদের নাকি বয়সই বাড়ে না। এই ত্রিবিধ বয়স-চোরাদের—সবুজ, হলুদ আর চির-সবুজদের—বাদ দিলে যে অসংখ্য আমরা পড়ে থাকি সেই আমাদেরই যত যন্ত্রণা! এই যন্ত্রণার প্রকৃতি, মাত্রা আর পর্ব সারাজীবনই এধার-ওধার হয়ে হয়ে, এ-ঘাট ও-ঘাট ঘুরে ঘুরে পাক খেতে খেতে জীবনের সঙ্গেই যেন মিশে যায়।

দিনের বেলায় মা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সন্তানকে তৈরি করে চলেছেন স্কুলে ভর্তি করানোর আশায়। দিনান্তে বাবার কসরৎ চলছে সম্ভাব্য ছাত্রের বুদ্ধির শিকড় কতটা সতেজ বেড়েছে তার নিরিখ-নির্ণয়ে। নির্বাচন পরীক্ষার ঠিক আগে আগে শ্রাবণের ধারার মতো ঝরো ঝরো অফুরন্ত খৈ-ফুটছে-গোছের একটা প্রস্তুতি নিয়ে যখন মা-বাবা (বাবা অবশ্যই দপ্তর থেকে ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছেন, স্ত্রীর সৌজন্যে।) তিরু-তিরু বুকে উপস্থিত তখন হয়তো জানা গেল "বয়স হয় নি, সামনের বছর আনবেন।"

অনেক আগে, আমাদের কালে, সময়টা অন্যরকম ছিল। বয়সটাকে আমরা বোঁড় হিসেবে পাই নি। মানসিক বয়সটাই কাঁচা-পাকার মাপকাঠি ছিল। বারো-তেরো বছরে আমাদের অনেকেই তখন ম্যাট্রিক পাশ করে বৃহত্তর জগতের দোরগোড়ায় পেঁছে যেতো। এখন গোঁফের রেখা আর ক্যালেণ্ডারের পাতা মানসিক বয়সের স্থান গ্রহণ করেছে। এখন কাঁচারা আর মহাবিদ্যালয়ের খোপে-কোঠায় স্থান গ্রহণ করে না, ওদের তাই আর ঘা মেরে মেরে তাজা করে তুলতেও

হয় না, বরং এতো পাকা হয়েই ওরা মহাবিদ্যালয়ের চত্বরে আনাগোনা করে যে সেখানে যাঁরা বিদ্যাছত্রের জ্ঞানবারি পরিবেশনে নিয়োজিত তাঁরাই এদের ঘায়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বয়স বড় বালাই!

আমাদের সমাজে মেয়েদের শত দুঃখ, সহস্র যন্ত্রণা। তার মধ্যে ওরা সেই কত আগে থেকেই দেখুন মায়েদের গঞ্জনা শুনে আসছে; বয়স হয় নি! ধুমসীর মতো মাঠে-ঘাটে দস্যিপনা করার কি বয়স আছে আর? শুধু কি গ্রামের মেয়েদের কপালেই এই বয়সের খোঁটাটা কাঁটার-খোঁচা হয়ে দেখা দেয়? শহরের ব্যাপার-স্যাপার একটু অন্যরকম। সে কিন্তু শুধু প্রকাশেই, শব্দ ব্যবহারেই: এখন বড় হয়েছো, বয়স হয়েছে, এখন থেকে বুঝে-শুনে চলতে শেখো। বিষয় এবং বক্তব্য একই; প্রকাশে-পালিশে গ্রাম-শহরের তফাৎ মাত্র। তাই গ্রামে বয়স হলেই মেয়েদের 'গজ-ব্যান্ডেজে মুড়ে-ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চলে। শহরে ব্যাপারটা তখনও খোলামেলাই চলতে থাকে! (তবে এখন গ্রামেরও বয়েস হচ্ছে, হয়েছে। তাই সেখানেও ভিক্টোরিয়া আমলের আচার-ব্যবস্থা অতীত হয়ে গেছে, যাচ্ছে।) প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের বেলায় বয়স হয়ে ওঠে শিল্পী। সেই শিল্পী তার তুলির টানে সুন্দরকে যেমন ফুটিয়ে তোলেন দেহ-বল্লরীর কান্ডে-শাখায়-পত্রে-পল্লবে, তেমনি ভিতরে ভিতরে, সেই শিল্পীরই ছোঁয়া লেগে, জেগে ওঠে কলতান, কুহুকণ্ঠ আর বিহঙ্গ-ভঙ্গ লতা-বিতান। নিজেদের কাছেই নিজেদের তখন অচেনা ঠেকে, অজানা লাগে। অনাদি-অনন্তের আহ্বানে উচ্চকিত-কম্পিত তখন সাদি-সান্ত বয়স, প্রকৃত বয়স। শিল্পীর ছোঁয়ায় সেও তখন শিল্প-শ্রীতে উদ্বেল, মুখর, আনত-অপাঙ্গ!

ওদিকে বোবা চোখে ছেলেরা তখনও অতীতের বালু-মরুতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। নির্বোধ বিস্ময়; তারা হকচকিয়ে গোছিয়ে পড়ে। বোঝে না বলে হাস্যাস্পদ হয়, যে অতীত একপক্ষের হারিয়ে গেছে সেই অতীতকে জোর করে হাতড়াতে গিয়ে ধিকৃত হয়। অভিধানের যত নিষ্করুণ শব্দ আছে তা যেমন ছেলেদের শিরে বর্ষিত হয়, ঠিক তেমনি অনাভিধানিক অভিধাগুলোও যেন ওদের তাড়া করে ফেরে! একপক্ষ বয়সের শিল্পসমৃদ্ধ পক্ষপুটে শশীকলা হয়ে পূর্ণতার পথিক, আর অন্যপক্ষ বয়সের মার খেয়ে নীরস মরুর আঁধি-ঝড়ে পযুর্দস্ত। বয়সের মার তাই বড় মার!

কিন্তু হিসেবের কড়ি বাঘে ছোঁয় না; প্রকৃতির নিয়ম বেশ কাঁটায়-কাঁটায় মিল করা বলে বোঝা যায়! মেয়েরা তর তর করে বেড়ে উঠে সেই যে থেমে যায়, মনে

হয়, যেন আর ঋতু-পরিবর্তন নেই, ক্যালেন্ডারের পাতা পুরোনো হয় না, ষোল-আঠারোর ছবি যেন ছাব্বিশ-আঠাশেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওদের দেহঝর্ণায় সময়ের জলস্রোত অবিরত-অবাধিত-অনিবার্য ছুটে চলে যায় কিন্তু বয়সের কোনও ছাপ পড়ে না চলনে-বলনে ঝংকারে। ঝর্ণাটি যেখানেই ছিল যেন সেখানেই থেকে-থেমে আছে। ওদিকে ছেলেদের বয়স নদীর জল হয়ে, চাকরি আর কর্মজীবনের গোলকধাঁধা বেয়ে, সংসারের কর্কশ-ঘর্ষণ-মুখর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ওঠা-পড়া, গভীর-অগভীর প্রবাহ হয়ে এগিয়ে চলে। ওদের দেহ-মনে নদীপাড়ের সব ভাঙনের রূপরেখা যেন দাগ রেখে যায়। সময়ের প্রবাহ তাই ছেলেদের প্রকৃতিতে বয়সের ছাপ ফেলে যায়।

এই দ্বিতীয়বার মার খেতে বসে ছেলেরা মেয়েদের আঘাত হানার মতো দুরন্ত পেয়ে যায়। আক্রমণ করে বয়সকে : বয়স লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে তোমার মা-বাবা! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে ওঠার মুখে, সেখানেই ছেলেরা সন্দেহের বিষ-তীরটি ছুঁড়ে মারে। কখনও প্রকাশ্যে কখনও মনে মনে। মেয়েদের স্থির-নিটোল-মসৃণ বয়সটাকে ঈর্ষার জ্বালায় আর তখন নিজের একান্ত আপন করে পাওয়া ব্যাপারটা স্মরণ থাকে না! যেন মনে মনে ছেলেরা বলে : আমি মরছি নানান জ্বলায়,—ভিড়ে চ্যাপ্টা, দপ্তর-পিষ্ট, বাজারের ঊর্ধ্বগতি দামের ঘর্ষণে চূর্ণ, জলে কাদায়, ঝড়ে বৃষ্টিতে পর্যুদস্ত—আর তিনি কেমন ঘরে বসে নিস্তরঙ্গ দিঘিটি হয়ে অনন্ত আকাশের মতো বয়সটিকে বুকে করে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন!'

কিন্তু এই থাকাটা কোনও নিরবধি থাকা নয়! কিছুদিনের ব্যাপার মাত্র। মধ্যবিত্ত জীবনে নামতার ফলকে বিদ্ধ হয়ে বয়স হারায় মেয়েরা : কুড়িতেই বুড়ি। এক থেকে দুই হলেই বয়সের পুচ্ছ তাড়নায় অধিকাংশ মেয়েরাই আর ঝর্ণা থাকে না, দিঘিত্বের ঢলঢলে আবরণটি ঘুচে যায়। এখানেও সেই প্রকৃতির মার খেয়ে মেয়েরা অতীতের পুঁজি থেকে বর্তমানের দেউলেপনায় ধ্বসে আসতে পারে, এসেই থাকে। পুরুষ তখন ড্যাং ড্যাং করে যেমন ছিল তেমনি থাকে আর ক্রমশই যেন ইতি-উতি দৃষ্টি ফেলে ফেলে নোতুন কোনও ঝর্ণার উচ্ছকিত ঝংকার শোনে, নোতুন নোতুন দিঘির সৌন্দর্যের ঔপন্যাসিক স্বাদ গ্রহণে ব্যাপৃত হয়! আর অন্যদিকে মেয়েরা তখন 'ওঁয়া' 'ওঁয়া' সঙ্গীত আর পাশাপাশি রাশি রাশি ভিজে ভিজে বাস্তব আর আঠা-আঠা না-ছোড় জান্তব fevicol পরিষ্কার করতে কুঞ্চিত-নাসা ক্লান্ততায় নিমজ্জিত। প্রকৃতির বিধান? প্রকৃতির প্রতিশোধ?

বয়সের কথা বলতে বসে বয়সের কারচুপি যেমন বলা দরকার ঠিক তেমনি বয়সের কারিকুরিও বলতে হয়। আমরা আগেই দেখলাম প্রকৃতি কিভাবে বয়সের কারচুপিতে সামিল হয়। পরে আরও জানা যাবে। কিন্তু দূরদৃষ্টি আর অদূর-দৃষ্টিতেও অনেক কারচুপি ঘটে থাকে। সামান্য ক'এক মাসের জন্যে শিশুটি বিদ্যালয়ে স্থান পাচ্ছে না? দাও বয়স বাড়িয়ে। পড়াশুনা করলে এখন আর গাড়ি ঘোড়া চড়ার কথা কোনও মা-বাবাই বলেন না। গাড়ি-ঘোড়া তো এমনিতেই চড়তে হবে, সকলকেই। (কিন্তু ঘোড়া? তত কি সুলভ বর্তমানের জীবনে? অতীতে তবু পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটরা গ্রামে-গঞ্জে যেতেন আসতেন। এখন?)। বয়স বাড়িয়ে স্কুলে ভর্তি না হয় হল কিন্তু চাকরিতে প্রবেশের মুখে সেই বয়সই তখন ফাঁস হয়ে দেখা দেবে না তো? কাউন্সিল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন পরীক্ষা পাসের প্রত্যয়ন-পত্রটি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, বা কোনও ক্ষেত্রে উদ্ধার করা যাবে, তখন বেলা চলে যাবার ঘণ্টা বেজে যেতেই পারে যে! সোনার চাঁদ অথবা সোনার টুকরো হলে হাতে অন্ততঃ পাঁচ; কিন্তু যদি তা না হয়? বয়সের মার তখন যে বিষম মার হয়ে দেখা দেবে!

আর কি শুধু চাকরিতে প্রবেশের সিংহদ্বারেই বয়সের প্রহরী মোতায়েন করা আছে? নিষ্ক্রমণের দিনটিও যে স্থির হবে বয়সের ঢেউ গুনে গুনে তখন? সব থেকে প্রতিষ্ঠিত সময়ে, সর্বাপেক্ষা সচ্ছল আর্থিক অবস্থায় ফুলস্টপটি যে সেই ক'একমাস এগিয়ে এসে ঘাড়ের কাছে অর্ধচন্দ্রের মতো বিকর্ষণ করবে! বলবে: তুমি নেই, তুমি নেই; সরে পড়, কেটে পড়, ভেগে পড়! বয়স তাহলে শাঁখের করাত? সকালে একদিকে কাটে; জীবনের সন্ধ্যায় অন্যদিকে।

মানুষের কারচুপিতে বয়সের ডেবিট-ক্রেডিট হিসেব 'নিল্' হয়ে যাবে, বা, সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতির হিসেবে গোঁজামিলের ভাগ অনেক বেশি। বলা যায় প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার শেষ নেই। কাউকে রেহাই দেয় না; বয়সের চাবুক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মারের পর মার লাগায়। হাড় জিরজিরে পেটে পিলে নিয়ে বহু লোকই তো জীবনের মধ্যদিনেই দিনান্তের ছবি হয়ে যায়। আবার যাদের রেহাই দেয় তাদের পঁচিশ যেন আর বাড়েই না। এদের উজ্জ্বল সকাল যেন দুপুর গড়ায়ই না। এ ব্যাপারটা এতোই মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে বিজ্ঞাপন-মনোবিদরা একে কাজে লাগাচ্ছেন: যাকে তন্বী-কুমারী ভেবে ভাবী পুত্রবধূ করার বাসনায় 'বাত্ চালাউঁ?' বলে ভাবা যাচ্ছে তার কাছে ছ-সাত বছরের পুত্রটি 'মা'-বলে ছুটে আসছে। অথবা থার্টি প্লাস? এ তো শুধু

র‍ুপালী পর্দায় সত্য নয়; এসব আমাদের চারপাশে অনেক দেখা যায়। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ বক্ষে যেমন শুভ্র-ফেন-নিভ বরফরাশি সময়কে নীবর-নিথর করে ধরে রেখেছে, তেমনি আমাদের মধ্যে অনেকেই তো মধ্যজীবনে তাদের অতীত-আর-বর্তমান, বর্তমান-আর-ভবিষ্যৎকে নিষ্পলক স্থির ধরে রেখেছে। টান্ টান্ এই সব জীবনে বয়স তো মার খেয়ে গেল? এ-সব কারচুপি নয়?

আমরা সকলেই তো শরীরের ব্যাট হাতে মনের উইকেটে এক একজন খেলোয়াড়। সময় বোলারের হাতে বয়সের বল। ক্যালেন্ডারের পাতা দৌড়োয়, সামনে ছুটে আসে আর ক্রমশই পিছনে চলে যায়। এই পাতাগুলোই তো এক একটা বল। আমরা সেই বল খেলি। অর্ধশতকের কাছাকাছি রান তুলতে বেশ তরতাজা ভাবটি বজায় রাখি। দেখে বোঝাই যায় না কতক্ষণ উইকেটে আছি, কত বল খেলেছি। এবারে যখন বেশির ভাগ খেলাটাকেই পিছনে ফেলে এসেছি তখন শুরু হয় কারিকুরি। টিঁকে থাকার লড়াই, বয়সের গোলাকে এড়িয়ে যাওয়া, সঠিক ব্যাট-চালনা। ব্যাটস্ম্যান যেমন জল চায়, হেলমেট নেয়, ঘামে ভেজা শার্ট পাল্টে ফেলে, আর প্রয়োজনে, গ্লাভস-প্যাড পরিবর্তন করে নেয়—আমরাও তেমনি নিজের ঘষা লেন্সকে জোরালো করতে বাইরের লেন্স-এর সাহায্য নেই, দাঁতের সংখ্যা সঠিক রাখতে ডেন্টিস্টের দ্বারস্থ হই আর শরীর-ব্যাটটিকে মজবুত রাখতে ফিগার-সচেতন হয়ে পড়ি। দোকানের সাজানো পণ্য থেকে শুরু করে plastic surgery পর্যন্ত ছুটোছুটি করি। কাগজে-পত্রে, রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে নিজেদের ক্ষয়ে-যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া অতীতকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠি। শীতকালে যেমন ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে মাথাকে monkey cap-এর আড়াল করে রাখি, তেমনি বয়সের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে নানান প্রকারের টান্ টান্ প্রক্রিয়ার সাহায্য নেই। এই সময়ের কারিকুরিগুলো প্রায়ই প্রকাশে লাবণ্য হারায়, পাউডার পমেটম কেমন যেন গোল-গোল তাকিয়ে থাকে, মাথার কলপ আর হাতের শিরা-উপশিরা যেন চা'এর বিজ্ঞাপনের মতো ড্যাব-ড্যাব করে চৌরঙ্গী হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শৈশবে বয়স আসে হামাগুড়ি দিয়ে, যৌবনে সেই আবার হাজির হয় উত্তাল মাতাল বুক টান্‌টান্ হন্‌হন্ করে। ঢল নামে, চারধার কানার কানায় ভরাট করে দুকুলবাহী সম্পন্নতায় বয়স তখন নিজের বয়সেরই হিসেব রাখতে ভুলে যায়। হঠাৎই আশ্বিনের কাশফুল, একটা দুটো করে শুরু করে কবে কখন ধবধবে করে তোলে আমাদের মাথার উপরের যৌবন পতাকাকে। মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগের

গর্ভে সদাসর্বদার সেই কাঁচের অতি-প্রিয় প্রতিফলক টুকরোটা কখন যেন আর মনের মতো প্রতিফলন ঘটায় না ; তাকে দেখলেই যেন স্মৃতিগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে অনেক বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড ছড়ায় ; বর্তমান সেই বাষ্পে আবছা হয়ে যায় আর সময়ের নদী বেয়ে বয়সের মধ্যদিনে চলে যেতে যেতে ন-যযৌ-ন-তস্থৌ হয়ে, ঝুলন্ত হয়ে, বাস্তবকে হারাতে বসে। অত আগ্রহের আর সমাদরের বিয়েতে-পাওয়া ত্রিভাঁজ সাজ-টেবিলের আয়নাটাও আর তেমন করে মন টানে না ! নিজেরই অতীত যেন বর্তমানকে ভ্যাংচাতে থাকে !

অথচ তখন কি কখনও ভেবে দেখেছি যে দিন আছে বলেই রাত আছে, শুক্লপক্ষ থাকে বলেই কৃষ্ণপক্ষকে থাকতে হয় ? সকালে আনন্দ আছে বলেই কি বিকেলের নিরানন্দ হৃদয়বিদারী ? সময়ের নদীতে যদি বয়সের জোয়ার কাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে সেই নদীতে বিকেলের ভাঁটাটা সত্যি হবে না কেন ? বয়স কি আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ? সে কি শক্তির অভাবে, সে কি আশাহীন অপেক্ষার কর্মহীন অবকাশ-যাপনে ? কেন এমন হবে ? দিনের বেলায় আমরা দেখতে পাই, সুন্দরকে দৃশ্যতই কাছে পাই। রাতের অন্ধকারের কি কোনও 'আলো' নেই ? মনের দৃষ্টিতে অধরার তো ধরা দেবার সময় তখনই। না হলে আমরা চোখ বন্ধ করে ভাবি কেন ? কল্পনাকে সীমাহীন প্রান্তরে সম্পদ খুঁজতে পাঠালে আমরা কেন তবে দৃষ্টিগ্রাহ্যকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের প্রসারিত করি ? কালীর আরাধনা তাহলে কেন হয় কৃষ্ণপক্ষে ? সকাল যদি আনন্দের সূর্যোদয় ঘোষণা করে তাহলে কেন ভাবতে পারব না বিকেল আনবে সূর্যাস্তের বর্ণসম্ভার ? উদয়ের যেমন ছটা আছে, অস্তেরও তো তেমনি আছে রাঙিয়ে যাওয়া ; জোয়ারের আছে তেজ, বেগ আর দম্ভ, ভাঁটার আছে শান্তি, স্থিতি আর বিনম্র ধীরতা। জোয়ারে আছে দুকুল ভাসিয়ে নেওয়া উত্তেজনা, পূর্ণ করে তোলার যৌবন-ঘোষণা আর সবপেয়েছির কলকল্লোল। কিন্তু ভাঁটার সময় পাখিরা আসে-বসে, যৌবনের পলি পড়ে পড়ে নরম মসৃণ চেহারাটিতে নদী তখন হয়ে ওঠে কোমল আর পেলব।

তাই বয়সের এপাড়ে-ওপাড়ে কোনও ঝগড়া নেই। সামনে থেকে দেখলে যাকে সম্মুখ বলে মনে হয় তাকেই যদি পিছনে গিয়ে দেখি তাহলেই তা হবে পশ্চাৎভাগ। সিংহ দরজাই যদি একমাত্র সত্য হত তাহলে অন্যকোনও প্রবেশ নির্গমনের পথ আর প্রয়োজন হত না। বন্যেরা বনে সুন্দর। ঠিকই। শিশুরা শৈশবে সুন্দর, কিশোর কৈশোরে এবং যুবক যৌবনে সুন্দর। শিশু আর বৃদ্ধরা

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করে। বিরোধ ঘটে অন্য ক্রমে। কেন? ব্যক্তিত্বের লড়াই? personality clash? বয়স্কের কাছে যে কৃতি সদ্য-অতীত, সেইই যুবকের কাছে challenge; তাকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা। আমরা আরও বড়, আরও বেশি, আরও প্রগতিপন্থী! তাই একটা অন্তঃসলিলা প্রতিযোগিতা, প্রতিস্থাপনামূলক তুলনা যেন ছায়া ফেলে ফেলে দুটি প্রান্ত মনে tension তৈরি করে চলে—সদ্য অতীত আর আশু-ভবিষ্যতের মধ্যে টানাপোড়েন। একদিকে তাজা বয়সের উত্তেজনার আঘাত অন্যদিকে ম্রিয়মান বয়সের ফিরে-করার অক্ষমতার জ্বালা। যুবকের বয়স দেয়নি অভিজ্ঞতা; সে সঞ্চয় করে চলেছে মাত্র। বয়স্ককে বয়স দিয়েছে অভিজ্ঞতা কিন্তু তার কাছ থেকে সে সময়টি কেড়ে নিয়েছে। একজনের ক্ষেত্রে না পাওয়ার যন্ত্রণা; অন্যের ক্ষেত্রে ফিরে না পাওয়ার কষ্ট। মাঝখান থেকে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর অসূয়া।

দু'জোড়া চশমা চাই। দু'প্রান্তের দু'জনের জন্যে। কিন্তু সময়ের দোকানে বয়সের চশমা সময় থাকতে পাওয়া যায় কৈ!

যত নষ্টের গোড়ায় এই না-পাওয়ার অভাব। চল্লিশে যে চালশে ধরে আর পঞ্চাশোর্ধ্বে যে ছানি পড়ে তা সকলেই জানে। পরের ধাপটাই বাহাত্তুরের নড়বড়ে নক্কারজনক অবস্থা। যারা এক পুরুষ পিছনে পিছনে আসছে এ-সবই তাদের মনগড়া অভিযোগ। যুবকদের হাতেই সমাজের শক্তির লাগাম। তাই ওরা যৌবন-অপসৃয়মানদের সুনজরে দেখে না; আর এই দেখে না বলেই অমন সব আক্রমণাত্মক অভিধায় তাদের ভূষিত করে। Give it a name and kill it, —ইংরেজীতে পরিষ্কার করেই বলে দিয়েছে। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—বাংলাও তো কম যায় না! যত সাহিত্যিক সহানুভূতি ঝরে ঝরে মহিলাদের নিষ্করুণ জীবনকে সিঞ্চিত করার চেষ্টা চলেছে, চেষ্টা হয়েছে পুরুষ-প্রধান সমাজের শোষকদের সুনিপুণ বর্ণনায়, তার সিকিভাগ অনুভবও এই সব বিগত যৌবন ব্যক্তিদের জন্য ছেটানো হয়নি। মেয়েরা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পূজিত হয়েও যেমন চিরদিনই শক্তির কণামাত্র ভোগ করতে পারেনি, ঠিক তেমনি শক্তিহীন, জ্বলে যাওয়া শক্তির নিঃশেষিত খোলস, এই সব পরপারমুখী ব্যক্তিদেরও আর কখনও শক্তি-কেন্দ্র বা শক্তি-বৃত্তের ধারে কাছে আসার মতো কোনও পথ খোলা থাকেনি। একদল পায়নি বলে হারানোর বেদনা থেকে অন্তত মুক্ত, অন্যদল পেয়ে হারানোর ব্যথায় মুহ্যমান। এইই তফাৎ! বয়সের যৌবনকাল তাই মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত বা বিব্রত বোধ করে না, কখনও করেনি;

কিন্তু শূন্যমূষ্টি ওপারের যাত্রীদের প্রতি অকারণ ক্রোধান্বিত হয়। হয় এই জন্যে যে, যে নেশায় এরা এখন বুঁদ হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলেছে সেই নেশায় ওরা দীর্ঘদিন উত্তেজিত থেকেছে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ; অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞের সংঘাত। বয়সের বোতলের পানীয়টি যে উভয়েরই চেনা ; তফাৎ এই যে একজন এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত, অন্যজন হাপুস নয়নে শূন্যদৃষ্টি। এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাত কোনওদিনই শেষ হবার নয় ; সাদি, কিন্তু অনন্তকাল ধরে চলছে, চলবে।

চশমার কথা বলেছি। ওটা ছাড়া যে অতীত-দৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই। অপ্রাপ্য সোমরসের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি এখন সামনের দিকের সুন্দরের পিয়াসী হওয়া যায় তাহলে তো বেদনার বদলে আনন্দের আবির্ভাব ঘটে। যা নেই, তা কেন নেই বলে অনুশোচনা করতে না বসে যা আছে তার মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি দিলে তো আর পা-ছড়িয়ে বসে কাঁদতে হয় না ; ত্রিমাথা তো জড়ত্বের ছবি না হয়ে মনস্কের চিহ্ন হতে পারে! তাহলে সেই চশমা একবার লাগাতে পারলে আর অতীতকে নয়, শুধু সুন্দরকে দেখা যায়।

দেশীয় বিধানে বনগমনের কথা বলা আছে। এই বন তো আর সাপ-খোপ-ব্যাঘ্র-শৃগাল অধ্যুষিত জঙ্গল নয়। জীবনের শুরুতে ছিল অপাপবিদ্ধ সবুজের সমাহার, স্নেহ-সিঞ্চিত মায়ের কোল আর মায়া-মমতা ঘেরা পরিবার-সমাজ আঁচল। জীবনের শেষ অনুচ্ছেদে যদি ঘন-সবুজের মানসিক উপস্থিতি, মনোহর স্মৃতির পুষ্পসমারোহ আর কানজুড়ানো পাখির গানকেই সম্বল করা যায় তাহলে অনেক অকারণ কষ্টের অবসানের পথ পাওয়া যায়। গ্লাসের অর্ধেকটা শূন্য—এ যেমন সত্যি, গ্লাসের অর্ধেকটা পূর্ণ—এও তেমনি মিথ্যে নয়। তাহলে চশমাটাই আসল নয়? জীবনে অর্ধেকটা ভুল করে ফেলেছি বলে আক্ষেপের ঝুলিকে পুষ্ট না করে অর্ধাংশই সফল হয়েছি বলে আনন্দের হাট বসালে রক্তচাপ আর heart attack-এর সম্ভাবনা থাকে না তো!

ঘাটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অতীতকে ধূসর দেখালে দোষ দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি সামনেটাকেও অনাবশ্যক ঊষর দেখাতে পারে। যা দেবার ছিল তা ঠিক ঠিক দেওয়া হয় নি, যা আশা করা গেছিল তার অধিকাংশই নিরাশার স্তূপ বলে মনে হতেও পারে। মনে হতে পারে সামনে আর কিছুই করার নেই। একমাত্র অপেক্ষমান যাত্রী তালিকার দৈর্ঘ্য বাড়ান ছাড়া দায়ও অবশিষ্ট নেই কিছু। এই সব নেতিবাচক ভারাক্রান্ত দৃষ্টি এই বয়সের চোখকে আর মননকে কষ্টই

শুধু দিতে পারে। জীবনের সফল সংগ্রহের স্বর্ণভাণ্ডার যদি চোখে না পড়ে, যদি অপরের আর নিজের প্রতি নিজের সমালোচনার খোঁচাগুলোই কেবল প্রত্যক্ষকে পর্যুদস্ত করে তাহলে তা যে বড় কষ্টের, বড় দুঃখের বিষয় হয়! কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক—এতো বড় ভাগ্য সর্বজনে আদৌ সম্ভব নয়, কবির দৃষ্টিতে অবতারেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তো অনেক পাওয়ার জমার অঙ্ক আছে, আছে চেয়ে না পাওয়ার বেদনাগুলোও। এবং দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ তো শুধু মাত্র অপরের চোখে দেখার বিষয় নয়। সে যে নিজের বাস্তবতা বোধের কলমের ডগায় প্রচেষ্টার কালিতে লেখা ইতিহাস। সঠিক চশমাটা লাগাতে পারলেই দেখা যাবে যে যা পেয়েছি, প্রত্যেকেই, তা আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ীই পেয়েছি। যা পাই নি তার জন্যে আমাদের না ছিল যোগ্যতা না ছিল প্রস্তুতি। হা-হুতাশের কোনও অবকাশই নেই। দেবার বেলাতেও 'সেই একই কথা সমান সত্য। দেবার বেলাতেও তো একটা যোগ্যতার প্রশ্ন থাকে, থাকে প্রস্তুতির কথা। আমরা যখন অতীত ভেবে কষ্ট পাই, অনুশোচনা করি, তখন সে একটা অবমানসিক মনোভাবই প্রকাশ করে। স্মৃতি সততই সুখের। সব ক্ষেত্রে, সকল জীবনে বাস্তব হয় না, এটা ঠিক। কিন্তু যথাযথ চশমাটি থাকলে অবশ্যই দূরকে সবুজতর দেখানোর কথা। অতীত তার কাঁটাগুলো হারিয়ে ফেলে, ফুলের উন্মুখ আকাশ-দৃষ্টিতেই অতীতের আগমনটি বর্তমানকে আনন্দের হিন্দোল দিতে পারে। চেষ্টা করে ক্ষতবিক্ষত হতে সেই সব সহগ কণ্টকদের আবাহন প্রয়োজনীয়ও নয়, উচিতও নয়।

আর সামনেটা?

যত সমস্যা তো এই সামনেটা নিয়েই। নাতিদীর্ঘ এই অবশিষ্ট জীবনকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম ভাগে কর্মক্ষম অংশ, দ্বিতীয় ভাগে কর্মহীন অংশ এবং তৃতীয় ভাগে অপেক্ষার অংশ। বৃদ্ধ হলেই যে বার্ধক্য আসে তা নয়। অনেকেই অর্থনৈতিক জীবনান্তে অবসর নিয়ে অটুট স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখেন। অন্ততঃ পাঁচ-ছ' বছর আগে থেকেই এঁদের পরিকল্পনা এঁটে এগুনো উচিত। কি করবেন, কতোখানি সময় ও শক্তি দিতে পারবেন, কতোটা উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারবেন—এই সব বিচার বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের একটা পরিষ্কার খসড়া তৈরি থাকা চাই। কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে হঠাৎ দশ-বারো ঘণ্টা সময় একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলে সেই বিরাট ফাঁকটাই তো একটা ভীষণ চাপ হয়ে ঘাড়ে চেপে বসবে। তাছাড়া শূন্য মন তখন শয়তানের কারখানা

না হলেও মনের নিগড় হয়ে নাগপাশ হয়ে উঠবে এটা নিশ্চয়। আবার কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন অনড় জীবন কেবলমাত্র নিজের কাছেই বোঝা বলে মনে হবে না, অন্যের কাছেও, আপনজনের কাছেও বোঝা বলে পরিগণিত হয়ে উঠবে।

তাই ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘ পরিশীলন আর প্রস্তুতির দ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাল লাগা মন্দ লাগা, পছন্দ অপছন্দ, যোগ্যতা ক্ষমতা প্রবণতা বিষয়ে সচেতন থেকে এই কর্মময় বার্ধক্যাংশকে ভরাট করে তুলবেন এটাই কাম্য। কেউ সৃজনশীল কাজে, কেউ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, কেউ শিল্পের আরাধনায় কেউ সামাজিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। কিন্তু দিক্‌নির্ণয় কাজটি যদি যথাসম্ভব সময় হাতে নিয়ে না করা হয় তাহলে ব্যর্থতার বোঝাটি অতিরিক্ত হয়ে শাকের আঁটিতে পরিণত হবে!

কর্মহীন ক্লান্ত সন্ধ্যার দ্বিতীয় পর্বে সংসার বা পরিবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় থাকাটাই একটা বিরাট কাজ। এর জন্যে দরকার একটা নেতিবাচক প্রস্তুতি এবং একটা ইতিবাচক প্রস্তুতি। নিজের নিজের জীবনবোধ, বিশ্বাস, ভালমন্দের হিসেব নিকেশ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রকাশ না করাটাই নেতিবাচক প্রস্তুতি। সব কিছু চোখের-কানের সামনে ঘটে, ঘটতে থাকে; মাঝে মধ্যে মনে হবে 'এতো অন্যায়, এতো যুক্তিহীনতা, এতো অবিচার সহ্য করা যায় না, প্রতিবাদ করতেই হবে।' কিন্তু এটা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাটাই প্রধান কাজ। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ ইত্যাদি সবই আপেক্ষিক তাই মনে-মনে-বনে চলে-যাওয়া এই দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচারের আসনটি গ্রহণ করাটাই স্ববিরোধ। অযাচিত হস্তক্ষেপ অনেক রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। আর রক্তের ঐশ্বর্যে দরিদ্র বার্ধক্যে রক্তের অপচয় করুণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কণ্ঠে জোর নেই, হাত-পায়ে শক্তি নেই, রক্তে উত্তেজনা নেই, চোখে দৃষ্টি নেই—এই এতো নেই নেই এর মধ্যমণিটি হয়ে জাগতিক অনেক প্রয়োজন বোধকে, উচিত-অনুচিত বিচারকেও তো সহজেই 'নেই' করে দিতে পারি? সেটাই কি শোভন নয়?

ইতিবাচক অংশটা কি? বাহবা দেওয়া, শাবাশী দেওয়া। সব জীবনই আপেক্ষিক, যুক্তি-তর্ক বিশ্বাস-অনুভব সবই। আমরা যখন ঘটিয়েছি, যখন ছিলাম স্টেজের কেন্দ্রস্থলটি দখল করে, তখন আমরাই সর্বেসর্বা ছিলাম। এখন ওরা, আমাদের সন্তানেরা কেন্দ্রস্থলে। ওরা যা যা করছে তা ঠিকই করছে, ওদের মতো করে ঠিকই করছে। [একই ঘটনায় দুই প্রতিপক্ষ উকিলের বক্তব্য-বিশ্লেষণ ভাবুন না!] তাহলে আমরা Weaker side-এ যোগ দেব কেন? [Unequal

combination is always disadvantageous to the weaker side.]
যিনি স্বপক্ষে তিনিও আইনের উদ্ধার করছেন, যিনি বিপক্ষে তিনিও। তাহলে? সবই সত্যি, সবই ঠিক! সাবাস দিন, বাহবা দিন। ওদের জীবন সুন্দর হলে, বাধা না পেলে ওরা তো আপনাকে স্বাগত করবে; আর যদি সমর্থন পায়, মানসিক তৃপ্তি পায়, অনুভবের সেতুবন্ধটি যদি ছিঁড়ে না যায় তাহলে আপনার ভাগে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঝিরঝির বাতাস বইতে থাকবে।

শেষ পর্বের অপেক্ষা? নির্মম সত্য। নির্মম এই জন্যে যে নিজের শরীরটিই মমতাহীন পীড়ন করে মনকে—অবশিষ্ট মনকে। জরা। Senile stage. শরীরে ধ্বস নামে এই সময়ে; অতীত জীবনের প্রবহমান সমস্যার ঢেউগুলো ধীরে ধীরে শরীরের দুটি পাড়ই ক্ষয়ে ক্ষয়ে নেয়। একসময় যখন বিছানাই একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায় তখন নিজের বোঝা নিজের কাছেই বড় ভীষণ, বড় বেদনার হয়। তাই যদি সময় থাকতে অপেক্ষান্ত না হতে পারেন তা হলে দু'টি মাত্র বিকল্প খোলা থাকছে—dignified death, undignified death, প্রথমটিতে আছে আইনের বারণ, যদিও সর্বদেশীয় একটি সংস্থা সেই মৃত্যুকেই আইনানুগ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে। অন্যটি কাতরান্ত প্রস্থান, প্রাকৃতিক।

॥ অবসর ॥

প্রত্যেক মানুষের জীবনে বিশ্রাম আসে রোজ রোজ। আসে তিনভাবে। কিন্তু সেই বিশ্রাম নেবার অবসর আসে ক্বচিৎ-কখনও। যিনি যে কাজই করুন না কেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে বিশ্রাম নিতে হয়। এই বিশ্রাম তাৎক্ষণিক। কেউ বিড়িটি বেশ আয়েস করে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মোচড়ে মোচড়ে নরম করে নিতে থাকেন। কল্পনায় সমূহ ধোঁয়া-টানার আমেজটি অনুভব করেন। ওষ্ঠের সাঁড়াশিতে আলতো চেপে রেখে আদরে ঘনিষ্ঠ করে ধরে রাখেন অনেকক্ষণ। দেশলাইটি পকেট, থলে বা কোমরের গোঁজ থেকে উদ্ধার করেন। এবং বারুদ-মুখ-উজ্জ্বল দেশলাই কাঠির অঞ্জলিকৃত আলোতে নিজের মুখটিকেও উদ্ভাসিত করে বিড়ির প্রান্তকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। একটা টান এবং একটি ধোঁয়া উদ্‌গীরণ! বিশ্রামের মহিমাটুকুকে যেন আকাশে-বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে উপভোগ করেন।

যাঁরা বিড়ি-বিশ্রামের ঊর্ধ্বে, যাঁরা নিজেদের সম্পন্ন বলে মনে করেন তাঁরা, স্ব স্ব পর্যায় ঘোষণাকারী সিগারেট-প্যাকেট খুলে ধবধবে একটি সুপ্ত-ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরিকে আঙুলের শৈল্পিক নিপুণতায় উদ্ধার করে, প্যাকেটের গায়ে ঠুকে ঠুকে ভরপুর আনন্দের প্রকাশ করেন। সিগারেট তো আর বিড়ির মতো বিশ্রামের অন্ত্যজ প্রকরণ নয়; সিগারেট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, লাইফ-স্টাইলের ঘোষণা। পাইপ যাঁরা কামড়ান তাঁরা এই ঘোষণা পর্বের শেষ 'সফিসটিকেটেড' প্রতিভূ। পাইপের আমি, পাইপের তুমি, পাইপ দিয়ে যায় চেনা, অনেকটাই গোঁফের মতো। চুরুট-সহযোগে যাঁরা বিশ্রামের আমেজ চারদিকেই ছড়িয়ে দিয়ে উপভোগ করেন তাঁরাও অত্যন্ত উচ্চ-পর্যায়ের বিশ্রামক। চুরুট ছাড়া 'চার্চিল' আর পাইপ ছাড়া 'হোমস্' ভাবাই যায় কি?

হুঁকো আর গড়গড়া আজকাল প্রায় অতীতের স্মৃতি। তবে আধুনিকতা যে জীবনে যথেষ্ট বেগ সংযোগ করেছে আর কেড়ে নিয়েছে আবেগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই হুঁকো-গড়গড়ার অপমৃত্যুতে পাওয়া যায়। সময় যখন সূর্যের গতি-প্রকৃতিতে মাপা হত তখন বিশ্রামের প্রক্রিয়া এবং মাত্রা ছিল স্বাভাবিকভাবেই

দীর্ঘলয় ; বর্তমানে সময় মাপা হয় মিলিসেকেন্ডে ; তাই বিশ্রামের তত অবসর কোথায়? তাই এখন তিনটান দিয়েই 'সুখটানে' বিশ্রামের অবসান ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর ; পাঁচ মিনিটেই নিটোল সাহেব-সাহেব সিগারেটের অবকাশ শেষ হয়ে যায়, আর যাঁরা কারো কাছেই উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন, তাঁরা বেশ তারিয়ে তারিয়ে চুরুটের কামড়কে আর পাইপের দন্তপেষণকে প্রয়োজন মতো দীর্ঘায়িত করে চলেন।

তাই দেখতে পাই রোদে-জলে যাঁরা সারা বছরই 'এক্লেমেটাইজড্' হতে থাকেন আর জীবন-সংগ্রামের দৈনন্দিন রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন তাঁরা বিড়ির বিশ্রামেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। যাঁরা অফিসে-দপ্তরে গদিতে দিনান্ত-মাসান্ত র‍্যাশন সংগ্রহে লিপ্ত তাঁরা বেশিরভাগই 'সফেদ'-বিশ্রামের আয়েসটুকুকে উপভোগ করেন। এঁদের মাথার উপরে সূর্যের দৃষ্টি নেই, টাকের উপরে মেঘের বৃষ্টিও নেই ; আছে ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক পাখা আর ডাইনে-বাঁয়ে সামনে স্তূপীকৃত কাগজপত্র আর ফাইলের পাহাড়। চুরুট-পাইপের বিশ্রাম-বিলাসীরা আসেন চার-চক্র-যানে, প্রবেশ করেন নির্বাচিত-নির্ধারিত আরামপ্রদ কক্ষের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। বিড়ি বিশ্রাম করে গাছের গুঁড়িতে, ইঁটের আসনে আর নৌকোর গলুই-এ ; সিগারেট অবসর কাটান নিজের চেয়ারে, অফিসের করিডোরে অথবা বন্ধুর চেয়ারের হাতলে। চুরুট-পাইপ অবসরকে অবকাশে রূপান্তরিত করেন কক্ষাভ্যন্তরের উপবেশন কেদারার পাশে সযত্নে সাজানো আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থানে।

এই বিশ্রাম পর্বের পরিণতিতে প্রথম দল শরীর পাত ক'রে অকালে বার্ধক্যের নামাবলী সর্বাঙ্গে ধারণ করেন, দ্বিতীয় গোষ্ঠী ক্ষয়ে ক্ষয়ে জীবনের পরিধিকে ছোট করে আনেন আর তৃতীয় দল 'পেস্-মেকারের' জন্যে বিদেশী মুদ্রায় আবেদন জানান। টানে টানে যে ধোঁয়া এরা ভিতরে টানেন সেই ধোঁয়ার অনিবার্য টানেই এরা সকলেই ডাক্তার বৈদ্যকে কাছে টানেন। বোধহয় মৃত্যুকেও ; অপমৃত্যুকেও?

হুঁকো গড়গড়ার অতীত দিনে বিশ্রামের অবসর ছিল দীর্ঘায়িত, ধোঁয়া মশাই সোজা প্রবেশের পথ পেত না দেহাভ্যন্তরে। তাকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে জলতলের গভীর ব্যাপ্তিতে আলোড়ন তুলে শত আঘাতের যন্ত্রণা সয়ে প্রভুত কালিমালিপ্ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করে তবে 'ট্রাকিয়া' পার হতে হত। সে ব্যবস্থায় ছিল বিভিন্ন বিধি-বিধান ; 'ভিস্তিয়াস'-কে থাকতে হত মাটির কলকের

অন্তরীণ ; আর পর্যায় নির্ভর দূরত্বে বিশ্রামের আয়েস উপভোগের ব্যবস্থাটিও ছিল পর্যায়-নির্ভর। 'কেষ্ট'-রা হুঁকোটি বাড়ায়ে কর্তার সামনে হাজির হত ; কিন্তু নিজেদের বেলায় উবু হয়ে বসে গুড়ুক-গুড়ুক টানত। আর গড়গড়ার শেষপ্রান্তে রুপো-বা-সোনা মোড়া মুখটি যাঁর হাতে শোভা পেত সেই তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নির্বাক নৈঃশব্দ্যে আকাশ-বাতাস ঝংকৃত করতেন খেয়ালের মৃদু লয়ে আর পয়ার ছন্দের মিহি টানে! সেই ছিল অবসর যাপন!

এই গেল প্রথম প্রকারের বিশ্রাম, বিশ্রামের অবসর। দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্রামের দেখা পাই সকাল বিকেল রাত্রে দাওয়ায় বসে প্রসারিত মাদুর চাটাই-এ অথবা, চেয়ারে টেবিলে গোছানো বসার ঘরে, আর কৌচে সোফায় 'ডেকরেটেড্' পার্লারে। এটাকে বিশ্রাম না বলে অবসর বিনোদন বলাই ভাল। অবশ্য দাওয়ার খোলামেলায় একেই বলব সময় কাটানো, বসার ঘরের বৈঠকখানায় এটাই হবে আড্ডা, দেখাসাক্ষাৎ বা সামাজিকতা, আর যদি হয় ইনটিরিয়র ডেকরের আভিজাত্যে সমৃদ্ধ পার্লার বা বিনোদনকক্ষ তাহলে বলতেই হবে বিনোদন বা 'গেট-টুগেদার'।

এই অবসর দাওয়াতে বয়ে আনে আশপাশের খবরাখবর, খরা-বৃষ্টির খতিয়ান, চাকরি-বাকরির হদিস, কলেকারখানায় জোট-যন্ত্রণা উৎপাদন। কখনও আসে পাড়া-প্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর, ছেলে মেয়েদের ভাব-ভালবাসার ইতিবৃত্ত, বিয়ে পৈতে মৃত্যুর তথ্য। আলোচিত হয় কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ঝাল-মশলা-চাটনি আর ভাড়াটে-বাড়িওলার ঝগড়া, এবং ইত্যাদি। বৈঠকখানায় হাজির হয় 'পি. এন. পি. সি'-র যাবতীয় উপাদান, অফিসের 'শপ'-টক, বড়বাবুর অবিচার, আর অপরের ছেলেমেয়ের অসভ্যতার বিবরণ। আসে সহকর্মীদের অজ্ঞতার পরিসংখ্যান, চরিত্রের বিপথ-চলন, আর ডুবে-ডুবে জল-পানের ভূরি ভূরি নিদর্শণ। উঠে পড়ে রাজনীতির আলোচনা, সমাজনীতির বিশ্লেষণ। এবং 'আমি,' 'আমি' আর 'আমি'র প্রোসেশন।

দাওয়ার অবসর আর বৈঠকখানার অবসরের মধ্যে প্রধান যে তফাৎ তা পাকস্থলী কেন্দ্রিক! সেখানে বিড়ি তামাকের বাইরে সেবন করার মতো থাকে একমাত্র চা, যদি তা আদৌ সম্ভব হয় ; কিন্তু এখানে শুধু চা কখনই নয়। এখানে বিস্কুট থাকবে, শিঙাড়া থাকবে সম্ভব হলে কিছু মিষ্টি সহযোগে চা বা কফির বন্দোবস্ত থাকবে। 'প্রেস্টিজ্' আছে, সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে, সংসারের সচ্ছলতা বলে একটা বিষয় আছে। নিজেদের তুলে ধরা, প্রকাশ করা আর আত্মশ্লাঘা ব্যাপার গুলোও তো আর কম জরুরী নয়! এখানে পারস্পরিকতার টান তৈরি হয়,

মেলামেশার সূত্রটি উন্মিষিত হয় আর সেই অবকাশে পরস্পর পিঠ-চাপড়ানোর একটা বন্দোবস্ত সপ্তাহান্ত অবসরগুলোকে ভরাট করে দেয়। অবশ্য ছন্দ-পতন যে না ঘটে তা নয়; একটু এদিক-ওদিক হলেই, 'ইগো'-তন্ত্রীতে সরু-মোটা আঘাত লাগলে বেসুরো বাজে। 'আমি' 'আমি' থেকে 'আমার' আমার' পর্যায়ের স্ট্রিংগুলো নাড়া-চাড়া করা অত্যন্ত কুশলী হাতের কাজ। সেখানে একেবারেই কোন অহেতুক টান চিরতরেই বিচ্ছেদ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। আর তখন অবসর যাপন বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় সব মাটি করে দেয়।

মৃদু বাহারি আলোর বর্ণময় ব্যবস্থা, স্টিরিও সিস্টেম, ফিনফিনে সাজ-সজ্জা আর ছোট ছোট টুকরো-টুকরো কথা এই হল উচ্চমার্গের অবসর বিনোদনের পরিবেশ। এখানে উপস্থিত হবেন 'চোজেন ফিউ'—বাছা বাছা ক'একজন। অবসরকে আবেশময় করে তোলার জন্যে 'সেলার' থেকে 'চিলড' পানীয় আসবে, থাকবে 'স্যালিভারী গ্ল্যান্ড'-কে উদ্দীপিত করার মতো যথাযোগ্য উপকরণ। চোখের কাজলে আর সুর্মায়, অনুজ্জ্বল আলোকে আর ফিন্ ফিনে আলাপনে অধিকতর মদির করে তুলবে, অনুচ্চ স্টিরিও কণ্ঠোচ্চারিত কথাকে ধ্বনিময় বাতাবরণ দেবে, ছেলেরা এখানে মশগুল হবে, মহিলারা হঠাৎ হঠাৎ অনুচ্চ-তীক্ষ্ম হাসিতে ঠুংরির মেজাজ তৈরি করবে। রাত্রির শৈশব তারুণ্যের ছোঁয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যৌবনে প্রবেশ করে। অবসরকে অঞ্জলি ভরে পান করে হৃষ্ট-চিত্তে, 'টিপসি'-নাকে, আলুথালু মনে অবসর বিনোদনের শেষে যে যাঁর গৃহমুখী হবেন।

এই অবসর সম্পূর্ণ অন্য স্তরের। আবছা আবছা চেতনার গভীর থেকে এ-কোণে ও-কোণে, একান্ত উপবেশনে, উঁকি দেবে অনেক একান্ত বাসনা, অবদমিত কামনা। অফিসের প্রধান উপ-প্রধান থেকে প্রতিযোগী সহকর্মী হয়ে অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা বিষয় ঘুরে ঘুরে আলোচনা আবশ্যিক কেন্দ্রীভূত হবে মিসেস অমুক থেকে মিসেস তমুক পর্যন্ত। অপরের স্ত্রীরা যে অধিক সুন্দরী এবং তাঁদের চাইতেও তাঁদের শ্যালিকারা যে তস্যাধিক সুন্দরী সে বিষয়ে সম্মত সিদ্ধান্ত করে যৌবনান্ত রাত্রিতে স্বগৃহের ঘেরাটোপে নিশান্তে সকাল ঝুলে থাকে—'হ্যাং ওভার'—সকালের চা পর্যন্ত। অবসর শেষ, শুরু হয় আর একটা দিনের।

সম্পন্নতার অধিকাংশ অবশেষ এঁদের জীবনে বয়ে আনে অনেক রঙ-রস-আর-সুন্দরকে। এঁদের মধ্যে যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের কাছে অবসর মাত্রই অবসন্নতার একঘেয়ে যন্ত্রণা। তাই যন্ত্র সভ্যতার আলো ঝলমল রাত্রে এঁরা বাহিরকে করে

ঘর আর ঘরকে ক'রে তোলেন বাহির! সন্ধ্যার পরেই এঁরা শ্যামাপোকার মতো দীপের অন্বেষণে পক্ষতাড়না ক'রে প্রান্ত-প্রান্তান্তর ছোটাছুটি করেন। অবশিষ্ট রজনীর কোনও এক অজ্ঞাত যামে এঁরা শাতন-পক্ষ হয়ে নিজ-নিজ আস্তানার একাকিত্বে অঘোরে নিমজ্জিত হয়ে অচেতন থাকেন। এঁদের জীবনে উষার আবির্ভাব ঘটে না, সন্ধ্যারাই এদের প্রেয়সী।

এই ত্রি-বর্গ শ্রেণী-বিন্যস্ত অবসর বর্ণনার বাইরেও অবসর যাপন আছে, এবং তার বর্ণনাও অপ্রয়োজনীয় নয়। রাজনৈতিক নেতারা, ব্যবসায়ীরা এবং তরল-মতি 'তরলে মতি' সান্ধ্য-জনেরা। সকলেই নেশাগ্রস্ত এঁরা। কারো ক্ষমতার নেশা, কারো অর্থের এবং কারো বা মদের নেশা। এঁদের সকলেই এক জায়গায় এক: এঁদের কারোই সময় নেই সচেতন ভাবে অবসরকে ভোগ করার; কেউ সজ্ঞানে নেশায় অচেতন থাকেন কেউবা নেশার ঘোরে অজ্ঞান-অচেতন থাকেন। অবকাশই হয় না অবসর সময়কে স্বাদু অনুভবে আত্মস্থ করার। এরা সকলেই নিজ নিজ জীবন যাত্রার দাস। ছুটি নেই, মুক্তি নেই, অবকাশ নেই। এঁদের তাই ছুটে যেতে হয় পাহাড়ের সুউচ্চ ঠাণ্ডায়, সমুদ্রের ধ্যান গম্ভীর নৈকট্যে অথবা দীপান্তরের নিঃসীম একাকিত্বে। অবসর এঁদের কাছে আসে না; এঁরা ছুটে যান অবসরকে গ্রেপ্তার করে ঘণ্টা দিন সপ্তাহের মাপে ভোগ করতে।

এবারে আসা যাক তৃতীয় প্রকারের অবসর বিষয়ে। যারা গাছের গুঁড়িতে বা ইঁটের আসনে বসে প্রথম প্রকারের অবসর যাপন বা বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং দাওয়ায় বসে দ্বিতীয় প্রকারের অবসর সময় কাটান তাঁরা এই তৃতীয় প্রকারের অবসর যাপন করেন মেয়ের বাড়ি, মাসির বাড়ি আর আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে। অথবা হরিসভা, কবিগানের আসর আর বাৎসরিক মেলায় যাত্রা-নাটক দেখে দেখে। এঁদের জীবনের আবর্ত-বৃত্তটি এতোই স্বল্প পরিধি যে এঁরা একেবারে বার্ধক্যের অকর্মণ্যতার মধ্যেই অবসর জীবনকে দীর্ঘায়িত করে ভোগে বা দুর্ভোগে আষ্টেপৃষ্ঠে খুঁজে পান। কুব্জ-পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ হাড় জির-জিরে দেহখানি নিয়ে এঁদের এই অবসর জীবন প্রকৃত পক্ষে অপেক্ষা-গৃহে—ওয়েটিংরুমে শেষ ট্রেনের অপেক্ষায় জীবন-উপান্ত বিশ্রাম বলাই ভাল। 'হরি দিন তো গেল'-র অবসর, যাত্রাশেষের সমাপ্তি-অবসর মাত্র। শরীরের প্রারব্ধ রস-রক্ত অস্থি-মজ্জা সবই জীবনের রৌদ্রে-জলে-ঝড়ে নিঃশেষে শুকিয়ে ফেলে এই যে অবশ-অস্ত বেলায় অবসন্ন অবকাশ তা অত্যন্ত ভারি হয়ে মনের মধ্যে বোঝার মতো চেপে বসে। অতীত সর্বস্ব এই অবশিষ্ট বেঁচে থাকা যে কী নিদারুণ তা একমাত্র তাঁরাই

জানেন যাঁরা তিল তিল করে এই অবসরকে পার করেন, আর জানেন তাঁরা যাঁরা অনুভবের নাও বেয়ে এই সব অবসর-যাপন-জীবনের কাছাকাছি আসতে পারেন, অনুভবে আর কল্পনায় সান্নিধ্য দিতে পারেন। দারিদ্র-লাঞ্ছিত পরিবারে সংসারের বোঝার উপর শাকের আঁটিটির মতো এই বার্ধক্য-জনিত অবসর মানসিক পীড়নের কেন্দ্র হয়ে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। দেবার কিছুই নেই, নোতুন করে অনাগতকে আবাহনের জোর নেই, বিগত দিনের মূল্যবোধ আর আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি অনড় অচল স্তূপ হয়ে বর্তমানের ঘাড়ে চাপা আর ভবিষ্যতের পথরোধ করা এই অবসর অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু উত্তেজক, অহেতুক না হলেও হতাশাব্যঞ্জক।

এবারে দেখা যাক সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা কি করেন যাঁরা দপ্তর-কাছারির চেয়ারে, করিডোরে বা বন্ধুবান্ধবের চেয়ারের হাতলে স-সিগারেট বিশ্রাম করেন অথবা বসার ঘরে বৈকালিক সামাজিকতা সমাপন করেন। এঁরা বছরে-দুবছরে একবার ভ্রমণে যান। সপরিবারে, অবশ্য যদি রেলের পাশ পান অথবা অফিস থেকে ভ্রমণ-অর্থ পেয়ে থাকেন। অন্যথায় বেশির ভাগই 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।'—নীতির সমর্থক। এবং স্ত্রী কতটা স্বামী-ভক্তি পরায়ণা অথবা পুত্র-কন্যারা কতটা শৈশবাক্রান্ত তার উপর নির্ভর করে তাঁদের এই ভ্রমণে অবসর যাপনের গতি ও প্রকৃতি। এঁদের সকলেরই মনে থাকে দিগন্তের টান, অনন্তের আশা, অসীমের আগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পকেটের পিছুটান অমোঘ নিম্ন চাপ সৃষ্টি ক'রে প্রতি পদে নিষেধের দড়ি পরিয়ে ফেরে। এঁদেরই এক প্রতিভূ তাই শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ বিষয়ে যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য; রেলের টাইম টেব্‌ল্‌ খুলে ভ্রমণই শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ। এতে যাতায়াতের ধকল থাকে না, টিকিট কাটার ঝামেলা থাকে না, মাঝপথে ট্রেনের থেমে যাবার ভয় থাকে না, এবং পকেট শূন্য হবার কোনও শঙ্কা থাকে না! মহাজনের উপদেশ যেমন উলুবনে মুক্তো ছড়ানো তেমনি, নেহাতই অহেতুক অনাবশ্যক বলে সকলেই পাশ কাটিয়ে যায়, এক্ষেত্রেও তেমনি ভ্রমণের ভিড় টাইম-টেবল্‌ ছাড়িয়ে প্লাটফরমে উপচে পড়ে।

অবসর যাপনের মাধ্যম হিসেবে ভ্রমণকে সঙ্গী করে প্রধানত মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। ভ্রমণ এখানে যথার্থ অবকাশও বটে। সংসার থেকে কিছুদিনের ছুটি, জটিল পারিবারিক আবর্ত থেকে সংক্ষিপ্ত অবকাশ, দু'জনে তিন-জনে মিলে একা-একা হয়ে নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট দিন যাপনের অবকাশ। দোকান বাজার রেশন

কেরোসিনের ঘূর্ণি থেকে ছিটকে গিয়ে পাহাড়ের বরফ অথবা সমুদ্রের ঢেউ, জঙ্গলের ঘন সবুজ অথবা মন্দিরের শান্ত গম্ভীর পবিত্রতা এঁদের জীবনে নোতুন প্রাণের স্পর্শ এনে দেবে এই আকাঙ্ক্ষা। মধ্যম বর্গীয় বিত্ত এঁদের সংসারের সব দায়-দায়িত্বের প্রতি সম্বৎসর সুবিচার করে না; বিশেষ করে এঁদের ঘরে ত্রিবিধ শত্রুর আক্রমণ অবধারিত: এক, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং তজ্জন্য ধার্য উপহারের বোঝা, দুই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাড়িত শিক্ষার খরচ এবং তিন, অসুস্থতাজনিত প্রাণান্ত অর্থব্যয়। সীমিত আর্থিক যোগানের স্বাস্থ্যহীন দেহে এই ত্রিধা আক্রমণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান মানসিক টেনশানের কারণ; মতভেদ মতদ্বৈধ। ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য। মুখ-দেখা-দেখি, কথা-চালা-চালি বন্ধ! দমবন্ধকারী আর্থ-সামাজিক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে পলায়ন-মন ভ্রমণকেই দাক্ষিণে হাওয়ার উৎসমুখ বলে মনে করেন। তাছাড়া আছে রান্নাঘরের ঘেরাটোপ-তাপে দগ্ধ 'পরিবারের' মুক্তবায়ু সেবনের ইচ্ছা; সারা জীবন উনুনের জ্বালে জ্বলে যাওয়া শরীরটাকে উজ্জ্বল জীবনের স্বাধীন নাতিশীতোষ্ণতায় অবগাহনের বাসনা। বিশ্রামে বিশ্রাম, অবসরে অবসর, আর, অবকাশই অবকাশ।

দেশ-গাঁয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারে কিন্তু চিত্র অন্যরকম। সেখানে না আছে রেলের পাশ, না আছে ভ্রমণ-অর্থ-প্রাপ্তির উৎকর্ণ সুযোগ। গ্রামের জীবনে অবসর আসে, পুরুষদের—মধ্যবিত্ত পুরুষদের, প্রায় সর্বদাই। সকাল দুপুর বিকেল অবসরই অবসর। বৈঠকখানার চেয়ারে, বাহিরবাটিকার ফরাশে অথবা নাট মন্দিরের চত্বরে হুঁকো-গড়গড়া, ছক্কা-পাঞ্জা, দাবা অথবা তাস-পাশার আসর একেবারেই নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। ব্যক্তি পাল্টায় আসরের অমরতা লোপ পায় না। সঙ্গে পান তামাকের সদাব্রত চলতেই থাকে। কখনো সখনো তদ্বির-তাগাদা, জমি-জিরেতের ডাক আছে; তা সে বছরের দশমিক ভগ্নাংশের হিসেবে ঘটে থাকে মাত্র। জমির উপস্বত্ব ভোগে, তেজারতি কারবারের অন্তঃসলিলা প্রবাহে আর তোষামোদীর অতলান্ত নির্ঝরে পুরুষদের দিন কাটে অবসরের আমেজে, রাত কাটে গভীর ঘুমের শান্ত সমাহিতিতে।

কিন্তু একবার চোখ ফেরান মহিলাদের দিকে, চিত্র একেবারেই বিপরীত! সংক্ষেপে: মেয়েদের মরার 'অফ্‌সর' নেই, অবসর নেই যমের উপস্থিতিকেও স্বীকার করে নেবার। কাক-ভোর সকাল থেকে উদয়াস্ত কর্মযন্ত্রের ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাহ্নে অন্নগ্রহণ এবং অন্তাস্ত দিবসের অবশিষ্ট প্রথম রাতটুকুও সংসারের নানা কাজে অধিকৃত। ধান-পান-শস্যের তদবির, গরু-বাছুর-

গোয়ালঘরের তদারকী আর 'প্রকৃতি-প্রদত্ত-সন্তান-প্রবাহ-সংখ্যার লালনপালন, শাসন-শোধন। এ-সব তো নিত্যকার 'রুটিন'; এর বাইরে পুজো পার্বণ সামাজিকতা, বিয়ে-পৈতে-আতুর, অসুখ-বিসুখ-রোগী, মহিলাদের কর্মতালিকায়।

এ-সবের মধ্যেও ঢলে-পড়া অপরাহ্নের নিস্তেজ আলোতে পানের ডাবা সামনে নিয়ে প্রসারিত উপবেশনে বিশ্রামের আমেজটি যিনি না দেখেছেন তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন না স্বল্প হলেও মধু মধুই, আলুলায়িত সিক্ত কুন্তলের ভার পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত সমাহিত সেই সব মহিলাদের এই সব অপরাহ্ণ অবসর যেন দূর থেকে তাঁদের মুখে ঋষিদ্যুতি ছড়িয়ে দিত। কর্ম যজ্ঞের একেবারে কেন্দ্রটিতে থাকার দরুন তাঁদের দেখে মনে হত যেন স্রষ্টার, ব্রহ্মার, আশীর্বাদে পূত-পবিত্র অবস্থান; ক্ষণ কালের অবসরকেই তাঁরা বিন্দুতে সিন্ধু করে উপভোগ করতে জানতেন। এই অবসর যাপনের সময়টুকুতে যেন প্রকৃতি ঠাকরুনও অংশ নিতেন; কোথাও কোন সাড়া নেই শব্দ নেই চঞ্চলতা নেই। বিরাট-প্রসার গৃহ-আঙিনায় কচিৎ একা একা কাক বা শালিকের নির্ভয় বিচরণে আচ্ছন্ন ভাব। পাশে-দূরে চাকর বাকর ঝি-চাকরানীরা বিশ্রামের সুখ-ক্ষণটুক নিম্নকণ্ঠে বা নিঃশব্দে উপভোগ করছে, একটা যেন অলস-অলস বাতাবরণ টানা টানা ছড়িয়ে আছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। গোয়ালঘরের সামনে খুঁটোয় বাঁধা বলদ গুলো গলা লম্বা করে মাটিতে দেহভার রেখে ধীর-আলস্যে জাবর কাটছে, কাঁধে পিঠে বসে চকিত-দৃষ্টি কোনও কাক ওদের পরিচর্যায় ব্যস্ত; বুড়ো-প্রৌঢ়রা যেমন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দিয়ে মাথার পাকাচুল তোলাতে ভালবাসেন, এই বলদগুলোও যেন অর্ধনিমিলিত চোখে আরামের অনুভবটিকে দেহের অলস-অবস্থানে সমাসন্ন করে তেমনি কাকদের ঠোঁটে শরীরের পোকা উন্মূলনে স্বাগত জানায়। একটু দূরেই গাভীটিও যেন তার সন্তানের ভালবাসার নৈকট্যটুকু প্রসারিত-কণ্ঠ উপভোগ করছে। বিকেলের রোদ্দুরও তখন যেন বিশ্রামের ঘোরে তীব্রতা হারিয়ে ছায়ার সঙ্গে দু-দণ্ড মিতালি করে নিচ্ছে, দীর্ঘ প্রস্থানের পূর্বে যেন হস্ত-প্রসারিত করমর্দন!

শহরের মধ্যবিত্ত জীবনে আঙিনা নেই, অপরাহ্ণ নেই, মানুষ-প্রাণী-প্রকৃতির এই একত্র বিশ্রাম যাপনও নেই। সেখানে আছে দশটা-পাঁচটার অমোঘ দৈনন্দিন বন্ধন। শহুরে মধ্যবিত্ত তাই বাইরে ছোটেন প্রকৃতি-প্রাণী-সবুজের সন্ধানে। গ্রামের তাঁরা প্রতিদিন এই সান্নিধ্য উপভোগ করেন। বিদুরের ক্ষুদেই তাঁরা তুষ্ট; ক্ষুদ্রের মধ্যেই তারা ভূমাকে অনুভব করেন; শঙ্খের ধ্বনিতে তারা সমুদ্রের

মন্দ্রমধুর গর্জনকে উপলব্ধি করেন।

আর যাঁরা উচ্চবিত্ত, সম্পন্নতার সুউচ্চ শিখরে যাঁদের সম্ভারের খতিয়ান, তাঁরা কি করেন? অবসর যাপনের প্রক্রিয়াটুকু তাঁরা কোন্ মধুরতায় উজ্জীবিত করেন? অর্থ অনর্থের মূল; আবার অর্থই অর্থের মূলে। তাই অর্থবান যাঁরা তাঁদের জীবনে অর্থও যেমন বাড়ে, বাড়তেই থাকে, তেমনি অনর্থও পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। অর্থ দহন করে, অর্থ বিচ্ছিন্ন করে। তাই অর্থবানেরা ছটফট করেন একদিকে অর্থের সন্ধানে অন্য দিকে অবসরের অন্বেষণে। অনেকটাই অর্থের মরুতে চোরাবালির অতলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অর্থবানেরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেলের কামরায়, প্লেনের আরামে অথবা স্বাধিকার জলযানের গহ্বরে অবসর যাপনের জন্যে ছুটে দেন। সময় তাঁদের পায়ের বেড়ি, মন তাঁদের হৃদয়ের হন্তারক। তাঁরা একা একা, তাঁরা বিচ্ছিন্ন, তাঁরা অবসরের অবকাশেও অংক, পরিসংখ্যান আর ডেবিট-ক্রেডিটের জালে আটকা পড়ে যান। বিশ্রাম তাঁদের শরীরকে আরাম দেয়, মনকে অবসন্ন করে তোলে। নিজের তৈরি অর্থ-কেল্লায় এঁরা জীবনের সব অবসরকে বন্দি করে রাখেন। শেষ জীবনেই একমাত্র এঁরা অবকাশ পান অবসর জীবন যাপনের। বাগানের পরিচর্যায়, হোম-ডেকরের নিত্যনোতুন পরিকল্পনায় আর সমগোত্রীয়দের সান্নিধ্যে অতীতের স্মৃতিচারণে, ভবিষ্যতের প্রসন্ন পরিকল্পনায় আর সবল ভোগের একনিষ্ঠতায়। দূরথেকে সকাল বিকেল গাউন পরিহিত/তা ব্যালকনি দণ্ডায়মান/না অথবা ভ্রাম্যমান/না এই সব অবসর-যাপন উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব দেখা যায় বাগান ঘেরা লনের পিছনে সুদৃশ্য বাসগৃহের পটভূমিতে। এঁরা অর্থের সঙ্গে অবসরকেও ব্যাংক ব্যালান্স হিসেবে নিজ নিজ বার্ধক্য এ্যাকাউন্টে জমা করতে থাকেন। তাই প্রচুর অর্থের পাশাপাশি এঁরা প্রচুর অবকাশ-অবসরও সঞ্চয় করে রাখেন। পড়ন্ত বেলায় অস্তমিত সূর্যের নরম আলোতে এরা সেই সঞ্চিত অবসরকে নিজের নিজের ইচ্ছা রুচি এবং প্রকৃতি অনুযায়ী উপভোগ করতে থাকেন। এঁদের অনেকেই জীবন-বোধের বৈপরীত্যে, মূল্যবোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর যৌবনের ছোটখাটো ভুলের মাশুল গুণতে বৃদ্ধাবাসে চলে যান। সেখানে অনাবিল প্রলম্বিত অবসর জীবন কাটানোর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে শরীরকে পাইয়ে দেন অসীম যত্ন, অনন্ত লালনপালন এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি; কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের বাসনা কামনা আর চিত্তের প্রশান্তি কতটা অবশিষ্ট হিসেবে এ্যাকাউন্টে জমা হয় তা এঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ হিসেবের ব্যাপার!

একটি শ্রেণীকে, বলা ভাল দুটি শ্রেণীকে, আমরা এতক্ষণের অনুবিশ্লেষণে সামিল করি নি। এঁরা অংশত বেকার, সারা জীবনই বেকার শ্রেণীর—কবি-সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকেরা। পাড়া প্রতিবেশীর না হলেও কাজের লোকেদের সন্দেহ যে এঁদের বাড়িতে কাজ নিলে মাইনে পাওয়া যাবে না ; কারণ এঁরা অলস, এঁরা নিষ্কর্মা, এঁরা চাকরি করেন না ; করলেও আংশিক সময়ের জন্যে করেন। অথবা এঁদের সর্ব সময়ের কাজ করার, চাকরি করার যোগ্যতা নেই। এঁরা দিনের পর দিন ঘরে বসে কাটান, বাজার-ঘাট করতে বের হতে চান না। উল্টে অকাজের বেসাতি নিয়ে নিজেদের অত্যন্ত নিবিষ্ট রাখেন, রাখতে ভালবাসেন ; অফুরন্ত এঁদের অবকাশ ; অপর্যাপ্ত এঁদের অবসর। এই দেখ বই মুখে নিয়ে বসে আছেন তো ঐ দেখ কলম দিয়ে কাগজের বুকে আঁকিবুকি করে চলেছেন। এঁদের কাজে একদানা শস্য জন্মায় না যে ক্ষুধায় কাজে দেবে, এঁদের বই-মুখ অবস্থানে কোনও ভোগ্য পণ্যের সৃজন হয় না যে ব্যবহার করা যাবে। অবসর যাপনকেই এঁরা জীবনের মোক্ষ বলে মেনে নিয়েছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যারা মিলে সংসার চালান ; আর এই সব লেখক কবি অধ্যাপকেরা অবসর জীবন যাপন করেন। একেবারে 'প্যারাসাইটস্' ! সম্পূর্ণ পরনির্ভর।

সত্যিই তো, এই সব অবসর-নির্ভর প্রজাতি নিয়ে কিছু লেখার আছে ? প্রত্যেক গাছেই ফুল ফোটে না, সকল ঋতুতে কোকিল ডাকে না, সব ঝিনুকে মুক্তো জন্মায় না। অবসরও তাই ; সব অবসরে কাব্য সাহিত্য সনাতন হয় না ; সকল বই-মুখ অবসরে সক্রেটিসের প্রজ্ঞা উন্মিষিত হয় না। যে অবসর নির্ঝরের অনন্ত স্বপ্নকে সর্বজনের কল্পনার ছোঁয়ায় পৌঁছে দিতে পারে, যে অনুভব কোনও এক প্রভাতের রবির করকে মনের ভাবের পর্দায় সঞ্চারিত করে দিতে পারে, যে উপলব্ধি বেড়ার ওধারের মৌনমূক সনাতন অস্তিত্বকে সকলের জন্যে প্রবেশ মুখী করে তুলতে পারে, সেই অবসর অমরতা পায়। বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় যে শীতলতা ধরিত্রীর বক্ষে নবজীবনের সাড়া জাগায়, যে সবুজ মনকে আচ্ছন্ন করে, যে সুর প্রাণের গভীরে সঙ্গীতের ঝংকার তোলে আর যে ছবি তুলিকলমের টানে টানে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে শাশ্বত হয়ে দীপ্ত হয়, সেই সৃষ্টি যে অবসরের দান তা চিরকালীন।

অবসরের দীর্ঘ-অয়নে ক্লান্ত এই সব অবসরীরাও ছোটেন দেশ দেশান্তরে। পাহাড়ে, সমুদ্রধারে, বনের নিভৃত একান্ততায় ; এঁরা ছুটে যান লোকালয়ের মধ্যে জীবনে জীবন যোগে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে, অনুসন্ধানী মন আর মনন

মুখী দৃষ্টি নিয়ে এঁরা জীবন ও প্রকৃতির অভ্যন্তরের জাল-জট খুঁজে খুঁজে দেখেন, দেখেন কুটিল-বঙ্কিম ঘাত প্রতিঘাতের রূপরেখাটি, আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্থান পতনগুলি, প্রেম-ভালবাসার গতিপ্রকৃতিটুকু। এঁরা ঘরের বাইরে দু'পা ফেলেও যেমন ঘাসের শীর্ষে শিশির বিন্দুটিকে দেখার অবকাশ খুঁজে পান, তেমনি দূরে-বহুদূরে প্রান্তে-উপান্তে, আকাশের দিকচক্রবালে আর পর্বতের সানুদেশের বহমান-চলমান জীবনকে সকলের জন্যে তুলে ধরেন, অমর করে তোলেন।

জীবনের অফুরন্ত অবসরকে এঁরা জীবনান্ত অবসরে সীমাহীন অতলান্ততায় হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত অঞ্জলি ভরে পান করেন। অবসরের সংগ্রহের জন্যে কেউ বা এ-জীবনেই মূল্য পান, কেউবা মৃত্যুর পরে, অনেক পরে, অমর হয়ে আলো দিতে থাকেন।

॥ শূন্যতা ॥

প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না, শূন্যতা সহ্য করে না, শূন্যতাকে ঘৃণা করে। একটু বড় হতে না হতেই এই ধরণের ইংরেজী প্রবাদটি বারে বারে ছাত্রজীবনে নাড়া দিয়েছে। তখন ব্যাপারটা ছিল একেবারেই বুদ্ধিগত, পরীক্ষাকেন্দ্রিক। হৃদয়ের দ্বারে সে কখনই করাঘাত—ভাবাঘাত করে নি। মাঝখানের দীর্ঘ জীবনে কাজের নেশায় আর সময়ের স্রোতে তীব্রগতি ভাসতে ভাসতে দিক্‌বিদিক্‌ ছুটে চলেছি ; বলা ভাল, তাড়িত হয়েছি। প্রকৃতি, বিশ্বব্যবস্থা, কার্যকারণ ইত্যাদি বিষয় সেই ধাবমান নেশা-নেশা জীবনের বাস্তব ঘূর্ণির অশান্ত বক্ষে কোনও ছায়াপাতই করে নি। সুযোগই ছিল না। তারা শূন্যতা পছন্দ করে কি করে না তা আর একবারের জন্যেও মনে স্থান দাবি করে নি। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক।

জীবনের অবেলায় অস্তসূর্যের ম্রিয়মাণ আলোয় যখন সেই বিশ্ব-প্রকৃতিকেই অন্যরকম দেখতে লাগে তখন অলস চেতনার দ্বারে বারে বারেই যেন সেই কথাটা ঘা দিতে থাকে। অনেক শূন্যতাই ততদিনে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একে একে ঘটে গিয়ে থাকে। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বজন-পরিজন বন্ধু-বান্ধব—কতো জনকেই তো আমরা হারাতে হারাতে নিজেরা সময়ের গতিপথ পার হয়ে হয়ে সামনে এগিয়ে যাই। সেই সব হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলো, সেই সব সদাসর্বদার জড়িয়ে থাকা, ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিত্বরা যখন হঠাৎ-হঠাৎ সঞ্চরমান বর্তমান থেকে ছিন্ন হয়ে অতীতে ম্লান হয়ে যায়, তখন দেহ-মন-হৃদয়ের শত শত বন্ধনসূত্রগুলোও অকরুণ বেদনায় ক্রন্দসী হয়ে ওঠে।

এই সব শূন্যতাগুলো জীবনের পটভূমিতে আর স্কুলপাঠ্য বিবরণ মাত্র থাকে না, পরীক্ষা পাশের প্রস্তুতির ঊর্ধ্বে উঠে মর্মের গভীরে বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত করে করে শূন্যতার অনুভবকে অমর করে তুলতে চায়। সূত্র-ছিন্ন এই সব হারিয়ে যাওয়া গুলো কখনও মনকে অবশ করে রাখে, কখনও চোখকে করে অশ্রুসিক্ত, হৃদয়কে করে রক্তঝরা। এখানেই বোধহয় প্রকৃতির আপন গৃহের বাস্তব নিয়মের সঙ্গে মানব হৃদয়ের আপন অন্তরের একটা বিরাট প্রভেদ।

আপনজনদের হারানোর শূন্যতা সকলের জন্যেও এক নয়, সকল সময়ের

জন্যেও এক নয়। শিশু তার মায়ের শূন্যতাকে সহজেই ভুলে যায় যদি এবং যখন 'প্রকৃতি শূন্যতাকে পছন্দ করে না'—নীতিতে শিশুর প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্যে মাতৃস্নেহের পূরণীয় আবির্ভাবটুকু ঘটে যায়। কিন্তু এই পূরণ করা প্রকৃতি পথ কতোদিন শিশুকে ভুলিয়ে রাখতে পারে? যতদিন সেই শিশু আবার তার শূন্যতার অনুভবকে অতীতের গর্ভ থেকে আমূল তুলে না আনতে পারছে। সেই দিন, সেই সময় যখন তার জীবনে ফিরে আসে তখনই প্রকৃতির নিয়ম মার খেয়ে গেল অন্তরের অকিঞ্চন আর দুঃখী অনুভবের কাছে।

সংসার জীবনের তড়িৎ-স্পৃষ্ট সদাধাবমান অন্ধদৃষ্টি-সময়ে আমাদের প্রত্যেকের থাকে শত কাজ, সহস্র কর্তব্য, লক্ষকোটি ছোট-বড় দুঃখ-যন্ত্রণা, সংগ্রাম-সংঘর্ষ। তাই আমরা সকলেই আমাদের বিচ্ছেদ বেদনাগুলোকে কষ্ট-ক্লিষ্ট জীবনের আঁচলে বেঁধে আরব্ধ জীবনযুদ্ধের প্রাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য। তখন তো আর সময় অপেক্ষা করে থাকবে না, সমস্যা কারো মুখ চেয়ে সময়ের অনুদান ঘোষণা করবে না। পড়ি-মরি সেই ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনে তাই অন্তরের অনুভবকে, শূন্যতার পীড়াটুকুকে লালন করা হয়ে ওঠে না; তাদের ঐকান্তিক আবেগবহুল দাবি গুলো তাই নিষ্ঠুর সংগ্রামমুখর কর্তব্যকঠোর সময়ের রথচক্র পেষণে দলিত হতে থাকে। প্রকৃতি এখানে অকরুণ, বাস্তব, কঠিন। তাই মনে হয় শূন্যতাকে সে পছন্দ করে না, পূরণ করে ভরাট করে দেয়। তাই বোধহয় আমরা বলি যে লোকে পুত্র-শোক ভুলে যায়, মাতৃ-বিয়োগের জ্বালা মানব মনে এক সময়ে অবসিত হয়, সব দুঃখ-কষ্ট-বিচ্ছেদের একটা সময়ে ছেদ ঘটে যায়। জীবন মানুষের মনে কী যে মন্ত্র দেয় সে সেই জীবনই জানে; সেই বিরহক্লিষ্ট বিচ্ছেদ বিদীর্ণ মানুষই আবার জীবন সংগ্রামে আশার আলোটি জেবলে সামনে এগিয়ে চলে। অতীতের বেদনাটুকু কি সত্যিই ভরাট করে দেয় প্রকৃতি? না কি সেই শূন্যতার-ব্যথাটুকু সে জীবনের এক কোণে সন্তর্পণে বয়ে বেড়ায়?

সে যে বয়েই বেড়ায়, হারিয়ে ফেলে না, তা পরিষ্কার হতে সময় লাগে। পড়ন্তবেলায় সেই সব অতীতগুলো স্মৃতির বেদনা-বিন্দু হয়ে জীবনের আঁচল থেকে সে তার অলস বিধুর সময়ে নিজের অন্তরের সামনে মেলে ধরে, মেলে ধরতে বাধ্য হয়। মানব জীবনে তাই শূন্যতা ভরাট হয় না, সাময়িক সরে থাকে মাত্র। যে সংসার থেকে হারিয়ে যায় সেও মন থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। অতীত হয়েও এই যে বর্তমান থাকা এটাতেই অমরত্ব। আমাদের স্মৃতি সেই অমরত্বের বাণীটি বয়ে চলে। স্মৃতি তাই সততই বেদনার এবং আনন্দের; হারানোর বেদনায়

আর প্রাপ্তির আনন্দে আমাদের স্মরণের জগৎ তাই সদাই আমাদের অন্তরের সম্পদ।

কিন্তু সম্পদ হয়েও সে আমাদের সদাসর্বদা সম্পন্ন করে কৈ? যে চলে যায় সেতো চলেই যায়, ফিরে এসে আমাদের ছিন্নসূত্রে জীবনের একটি সূত্রেও আবার সংযোজনের আনন্দধ্বনিটি তুলতে পারে না। এই অক্ষমতাই কি হারিয়ে-যাওয়া আপনজনদের ভুলে-যাওয়া বিস্মৃত-জন করে তোলে? মধ্যজীবনের দীপ্ততেজে এ-কথা সত্য হলেও অলস-অপরাহ্নে সত্য নয়। সত্য নয় কারণ তখন প্রত্যেকেই স্মরণের আদিগন্ত প্রসারে নিজের নিজের অস্তিত্বের যাথার্থ্য-সূত্রগুলির অনুসন্ধান করতে থাকে, নিজেকে নোতুন করে পর্যালোচনা করে, প্রতিষ্ঠাপিত করে, জানতে চায়। ফেলে আসা জীবনের খোলসের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই তখন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজের আশৈশব নিজ-টিকে দেখার চেষ্টা করে। তখনই তো ছিন্নসূত্রে প্রান্তগুলি বেদনার প্রবাহ বয়ে আনে; অনিবার্য, অপ্রত্যাবর্তনীয়, অপরিমেয়।

প্রতিটি শূন্যতা গুণে এবং পরিমাণে, প্রসারে এবং গভীরতায়, তীব্রতায় এবং তীক্ষ্ণতায় স্বতন্ত্র। এই সকলই নির্ভর করে ছিন্নসূত্রের সংখ্যায় বা পরিমাণে। প্রত্যেকটি জীবন স্বল্প থেকে শত-শত সম্পর্কের, যোগ্যতার আর যাথার্থ্যের সূত্রে অন্য সকল জীবনের সঙ্গে যোগাযোগে সমৃদ্ধ হয় বা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা দ্বারা স্বজন সমাজে নিজ নিজ স্থানটি সুনিশ্চয় করে নিতে থাকে, করে নেয়। এই পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রের ব্যাপ্তি প্রকৃতি ও সংখ্যা দ্বারাই একে অপরের বন্ধনে আটকা পড়ে যায়। যখন কেউ চলে যায়, শূন্যতা রেখে চিরবিদায় নেয়, তখন সূত্র সমূহও ছিন্ন হয়ে যায়; সেই সব সূত্র-ছিন্ন-প্রান্তগুলি বেদনার বিন্দু হয়ে অন্যসকলকে আজীবন নাড়া দিতে থাকে। প্রত্যেক শূন্যতাই তাই এক একটা অভাবের ক্ষেত্র-বৃত্ত-বিন্দু সমন্বয় তৈরি করে—সে শূন্যতা মৃত্যু জনিত কারণেই হোক, নিরুদ্দেশের জন্যেই হোক আর সংসার ত্যাগের হেতুতেই হোক। যেখানে যেখানে ছিন্ন-প্রান্ত-বিন্দুর সংখ্যা কম, বেদনার অনুভব গভীর নয়, সেখানে সেখানে স্মৃতি আমাদের বেদনার পাত্রটিকে পূর্ণ করে না, স্মরণের মতো যথেষ্ট সম্পর্কসূত্র সেখানে তৈরিই হয়নি বলে। এসব ক্ষেত্রে কল্পনা স্মৃতির স্থান গ্রহণ করতে পারে, করেই থাকে। শৈশবে মৃত শিশুর স্মৃতির ভাণ্ডারে আশানুরূপ জমা ঘটানোর আগেই যে শূন্যতা সেই শূন্যতাকে নিয়ে মধ্যজীবনে মায়ের মন, স্মৃতিতে নয়, কল্পনায় অশেষ করে নিতেই পারেন তাঁর বেদনাকে; শিশু বড় হলে তাঁর সকল

জ্বালাযন্ত্রণার লাঘব হত, সেই সম্ভাবনা সেই মাতৃহৃদয় অনায়াস কল্পনার চোখে দেখতেই পারেন। বৃদ্ধ বয়সে যথাসময়ে সংসার থেকে প্রস্থান-গত শূন্যতাও তেমনি ছিন্নসূত্র-প্রান্ত, সংখ্যায় অনেক লঘু-বিন্দু বেদনার কারণ। ফুরিয়ে যাওয়া বয়স গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে না সেই কারণেই।

কিন্তু যে শূন্যতা অসময়ে ধেয়ে আসে জীবনে, যে শূন্যতা অসীম সম্ভাবনাময় জীবনকে উৎপাটিত করে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, যে ছিন্নতা জীবনের তরতাজা কেন্দ্রবিন্দু থেকে শতসহস্র সূত্রে গ্রথিত-সম্পর্কিত জনকে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই শূন্যতা অবশ্যই রক্তঝরা, বেদনাবিধুর, ক্রন্দসী। অপূরণীয় সেই শূন্যতা। বেদনার বিন্দুগুলো স্মরণের প্রবাহ বেয়ে জাগ্রত বর্তমানকে বারে বারেই মথিত করে, অন্যমনস্ক করে তোলে। শতকর্মে ব্যস্ত বর্তমানের প্রবল সময়েও বেদনার স্মৃতি-ধারা-বেয়ে এই সব শূন্যতা আমাদের প্রত্যেককেই অবশ করে দেয়, আনমনা করে তোলে। দিন মাস বছরের চলমান সমস্যাজর্জর মুহূর্তে এই সব শূন্যস্থানের অভাব সত্যটুকু আমাদের অন্তরের গভীরে নাড়া দিয়ে যায়, বিচ্ছিন্নজনের তাৎক্ষণিক উপস্থিতির বাসনাকে তীব্র করে তোলে—যেন সে থাকলে সমস্যার সমাধান সহজ হত, স্বাভাবিক হত, এমন কি, হয়তো এই সমস্যা আদৌ সামনে আসতেই পারত না। এই বিশ্বাসেই শূন্যতা অমরত্ব পায় তখন।

নিরবধি সময়ের অধিশ্বরী প্রকৃতির আপন সংসারের ব্যবস্থাপনাই অন্যরকম; সমাজ বা সংসারের রীতি-প্রকৃতির সঙ্গে তার স্বভাবতই কোন মিল থাকার কথা নয়। সেখানে, প্রকৃতির গৃহিনীপনায়, শূন্যতা অনাকাঙ্ক্ষিত; তাই সেখানে পূরণের ব্যবস্থাটিও পাকা হাতে সতর্ক দৃষ্টিতে ঘটে থাকে। এখানে, মানব সমাজে-সংসারে, শূন্যতাকে আমরা বলি অপরিমেয়, অপূরণযোগ্য। রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে, সমাজসংস্কারকের তিরোধানে, ধর্মগুরুর দেহরক্ষায়, জ্ঞানীগুণী জনের অনন্তে বিলীন হওয়ায়। সব ক্ষেত্রেই আমরা দরিদ্রতর হয়ে যাই; কারণ শূন্যতা অপূরণীয়। সংসার বা পরিবার ক্ষেত্রেও কোনও পিতা, কোনও মাতা, কোনও পুত্র কোনও কন্যা যখন কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যতার গহ্বরটি তৈরি করে ফেলে, তখন সেই শূন্যতাও অপরিমেয়, অপূরণীয় হয়ে দীর্ঘ বেদনার উৎস হয়, আর পরিবারের ভবিষ্যৎ জীবনে একটা চিরস্থায়ী বাস্তব অভাবকে সত্য করে রাখে। সামঞ্জস্য মার খেতে থাকে, যেমন হয় গাড়ির চাকা বসে গেলে, ভেঙে গেলে, নষ্ট হয়ে গেলে। একজন ব্যক্তির পক্ষে অপর একজন ব্যক্তির অভাব পূরণ করা কখনই যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সংসার জীবনের কর্ম-কর্তব্য-উপলব্ধি

বিভাজনের ক্ষেত্রেও একজনের অভাব অন্য কোন জনের দ্বারা পূরণ যোগ্য নয়। তাই সংহতি নষ্ট হয়, সুস্থিতি হারায়, ছন্দ-পতন ঘটে। এই সব ঘটে বলেই বার বার সেই শূন্য স্থানটি অতীত থেকে বর্তমানের বেদনা হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। অভাবের বাস্তবতায় স্মরণের আসনে শূন্যতা অমর হয়ে স্থায়ী হয়। অথবা, বর্তমানের সংকটে অতীত শাশ্বত হয়ে ওঠে। স্মরণ আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই সেই অতীত-বর্তমান সেতুটি তৈরি করে দেয়।

আমাদের মধ্যে যারা চলে গেলে শূন্যতা অমরত্ব পায় না, যারা হারিয়ে গেলে মিলিয়েই যায়, ফিরে ফিরে আসে না, তারা সূত্রহীন সম্পর্কহীন ত্রিশঙ্কু জীবন যাপন করে থাকে সংসার জীবনে ; তারা অনুকম্পার যোগ্য, তারা সমাজ সংসারে দ্বীপবাসী হয়ে আজীবন একাই ছিল। আর যাঁরা চলে গিয়েও থেকে যান, যাঁরা অতীত হয়েও বহু বর্তমানকে স্মরণের সূত্র ধরে ভরাট করতে ফিরে ফিরে আসেন, যাঁদের অভাব দীর্ঘশ্বাসে মথিত হয়ে সত্য মনে হয়, অশ্রুজল মোচনে যাঁদের স্মরণ সেচন পায় তাঁরা অন্তরের গভীরে চির সত্য হয়ে বনস্পতির আয়ু পেয়ে যান। তর্পণে আর আবাহনে তাঁরা স্মৃতির বেদনা, স্মরণের আনন্দ হয়ে বিরাজ করেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের জগতে এঁরা চিরস্মরনীয় অমরতা পান ; সেই জগৎ বিচারের, বিশ্লেষণের, চেতনার। কাব্য-সাহিত্য উপন্যাসের জগতের দিকপালেরা অমরতা পান মননে, অনুভবে আর আবেগ-কল্পনার জগতে। তেমনি করে গৃহবাতাবরণে যাঁরা নিজেদের স্বজন-পরিজন-আত্মজনের জগতে চিরশূন্যতা রেখে যান তাঁরা অমর হয়ে থাকেন সেই সেই ক্ষেত্রে, উপলব্ধি-অনুভব-অভাবের জগতে। তাঁরা যে বার বার স্মরিত হন আনন্দে-সংকটে-সংগ্রামে সেখানেই তাঁদের অপূরণীয়ত্ব, ক্ষুদ্রের ঊর্ধ্বে তাঁদের বিরাটত্ব, তাঁদের অমরত্ব। আমরা বহুজনই চলে যাই সংসার ছেড়ে ; দু'এক জনেই তো দাগ কেটে যাই। সেই দাগ, সেই শূন্যতা চিরদিনের করে রাখতেই তো যাওয়াটা অপূরণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু পারি কৈ ?

॥ শত আর শাশ্বত ॥

দিবা নিদ্রা হয়তো প্রায়ই সম্ভব হয় না, তবে দিবা শয়নের একটু অভ্যাস বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই জড়িয়ে গেছে। দুপুরের খাদ্যগ্রহণ করেই তৃপ্ত দেহখানি বিছানায় আরাম খোঁজে। খবরের কাগজ, কখনও কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা, তখন অনিবার্য সাথী। ওদেব মাধ্যমেই তখন চলে বিশ্বের সংগে যোগাযোগ। বিচিত্র জগৎ, বিভিন্ন স্বাদ, নানাবিধ সমস্যা এবং বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গির সংগে পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয় পর্বে আমি থাকি অলস গ্রাহক ; ক্রমশ তন্দ্রাক্রান্ত নিস্তেজ শরীর ঝিমিয়ে আসে, সুপ্তির অতলে সরে সরে যাওয়া অবসন্ন মন। প্রায়ই চোখ থেকে চশমাটা খুলে পাশে গুটিয়ে রাখা পত্র-পত্রিকার বুকে রাখতে গিয়ে নেশা-নেশা ঘুমটা নাড়া খেয়ে চমকে যায়। জাগ্রত সচেতনতায় ফিরে আসতে মন চায় না, সুসুপ্তির অবচেতনে প্রবেশেরও সুযোগ পায় না—ঐ একরকম করে না-ঘুম-না-জাগা অবস্থায় নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট শুয়ে থাকা।

তখনই অনুভবের জগতের দরজাগুলো কেমন যেন পাহারাহীন খোলা পড়ে থাকে। টুকরো টুকরো চিন্তাভাবনাগুলো এই অলস অবসরে হেলতে দুলতে একে একে এসে হাজিরা দিতে থাকে। কেউ লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে, কেউ যেন নাতনীর হাত ধরে সন্তর্পণে কোমরের বা হাঁটুর ব্যথাটাকে সামলিয়ে এগিয়ে আসা বৃদ্ধদের মতো ; পড়ন্ত বেলায় এঁরা যেমন একে একে গঙ্গার ধারে এ-ধাপে ও-ধাপে জড়ো হতে থাকেন, ভাবনাগুলো যেন অমনি আড়ষ্ট চলনে আমার না-ঘুম-না-জাগা মনের এখানে ওখানে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও হাজিরা দিতে থাকে। তাদের সকলকে মনে রাখতে পারি না, মনে রাখার মতো করে সেই সব ভাবনাগুলো আমার কাছে কোন দাবি করে না। আমার অলস মনের অনুভবের জগতে তারা ছোট ছোট কম্পন তোলে আবার হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় আবার কখনও ফিরে ফিরে আসে। যেন একটু নাছোড়বান্দা গোছের। এরকম একটা ভাবনাকে তাই পরিচয়ের নৈকট্যে কাছের করে নিতে মন চাইল।

এই যে আমরা সকলেই একদিন আসি, এই জগতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র বেছে নিয়ে জন্ম নেই, বড়ো হই, হইচই করে কাটাই এবং একদিন লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করে প্রস্থানের পথে সময় গুণতে গুণতে হঠাৎই চলে যাই—আমাদের এই

আসাটাই বা কেন এই যাওয়াটাই বা কি রেখে যায়? আমরা বেশিরভাগ লোকই তো উর্ধ্ব তৃতীয় পুরুষ মনে রাখি, তার আগের আমরা তো একেবারেই হারিয়ে যাই। কি থাকে আমাদের? কোথায় থাকে? কে মনে রাখে? যারা ছিল তারা ক্রমশই তো অতীত স্মৃতি থেকে স্মৃতির অতীত হয়ে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। তারা নেই শুধু নয়, কোনও দিন এই ধরাধামে আমাদের পরিবারে, আদৌ ছিল বলে মনেই হয় না তো। একটু বেশি অতীত হতে হতে তারা কি মিথ্যা হয়ে যায়? আমরা? আমরাও তো সকলেই একদিন সেই মহাযাত্রায় এই এতোদিনের প্রেম-ভালবাসা, সংগ্রাম-সংঘর্ষ, সফলতা-বিফলতায় ঘেরা জীবন থেকে সরে যাবো, হারিয়ে স্মৃতি হয়ে যাবো, এবং আবার স্মৃতি থেকেই হারিয়ে যাবো! কি থাকবে আমাদের? এই অবসর জীবন, গঙ্গার ধার, নির্জন বাগান আর পার্কের বেঞ্চ তো আমাদের লাফ-তক্তা—স্প্রিং-বোর্ড, বিস্মৃতির মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার, 'ডাইভ' দেবার আগের 'ওয়ার্মিং-আপ—গা ঘামিয়ে নেওয়া মাত্র। মহাশূন্যের ওপারে যখন প্রশ্ন উঠবে—কি নিয়ে এসেছিলে? আর কিই বা রেখে গেলে? তখন আমাদের প্রায় সকলেরই তো একই উত্তর হবে; শূন্যের মধ্যে শূন্য যোগ করে শূন্যেই মিলিয়ে গেলাম, হাতেও রইল শূন্য। অন্য কোনও উত্তর ক'জনের জীবনে সংগ্রহ হয়ে স্মরণের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে?

এই দু'চারজন যাঁরা বাঁচেন, দেহেও বাঁচেন, মরণেও বাঁচেন, তাঁরা সকলের পূর্বপুরুষ হয়ে মানুষকে স্মৃতির ভাণ্ডারটি পূর্ণ করে দান করে যান। পূর্ণতা ক্রমশই যুগে যুগে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। এদের বাইরে যে বিরাট 'আমরা'র সংখ্যা, যারা জন্ম থেকে মৃত্যুতে মিছিল করে এগিয়ে চলি, সেই আমাদের ছিলও না কিছু, থাকেও না কিছু। বেঁচে থেকেও না, মরণেও থাকে না। তাই আমরা ধীর গতি স্মৃতির পথ বেয়ে অতীতে ঢলে পড়ি।

আমরা সারাজীবনই তো, একবারের জন্যেও, প্রবৃত্তির নিয়ম-নিগড় বৃত্তের বাইরে পা বাড়াতে পারি না। সেই স্বাধীনতা আমাদের মধ্যে কিশলয় হয়ে কখনই হাতছানি দেয় না। পশু প্রকৃতির যাবতীয় উত্তরাধিকারে আমরা সকলেই এতো বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে জীবন কাটাই যে প্রবৃত্তির বন্ধন রজ্জুগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারি না। কখনও ভয় পাই, কখনও প্রয়োজন বোধই করি না; কখনও ক্ষমতায় টান পড়ে কখনও অসহায়তা নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। নিত্যদিনের প্রয়োজনের বাইরে যে বিরাট, যে ভূমা, যে বিশ্ববোধ আমাদের জীবনে মাঝে মধ্যে হাতছানি দেয়, আমাদের ডাকে, তার দিকে সাড়া দেবার মতো সময়, দীক্ষা এবং প্রস্তুতি

আমাদের নৈমিত্তিক এবং কায়ক্লেশ ক্ষুধ-ক্ষীণ জীবনে একেবারেই থাকে না। তাই আমরা জন্ম আর মৃত্যুর দ্বিপ্রান্ত সীমানার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে জীবনান্ত ঘটাই, ব্যক্তিস্বার্থের বিন্দুতে চিরস্থির থাকি। এবং একদিন হঠাৎ, ধীরে সুস্থে, যন্ত্রণাকাতর দেহমনে হারিয়ে যাই সীমানা থেকে, ঝরে যাই বিন্দুটি থেকে।

অথচ প্রকৃতিতে প্রাণের প্রকাশ সব ক্ষেত্রেই তো এমনি সীমানা-বন্ধনে পীড়িত নয়, বিন্দু-বৃত্তে আবদ্ধ নয়। ফুল তো নিজের জন্যে ফোটে না, সে তো তার জন্ম-মৃত্যুর সময়-রেখার মধ্যেও সুন্দরের প্রকাশে অসীমের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়; নীল আকাশ তার নিঃসীম গভীরতাকে মনোহর করে সকলের জন্যেই সমানে চন্দ্রাতপের শান্ত পবিত্রতায় উন্মুক্ত করে ধরে রাখে; বন-অরণ্যের সবুজ, পাহাড়-পর্বতের শীতলতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ-ছন্দময়তা—সবই তো এই বিশ্বপ্রকৃতির চারদিকে ছড়ান নিস্বার্থ অমরতা। সুন্দরের বাধাবন্ধহীন প্রকাশ।

সুন্দর কি বস্তুতে না দৃষ্টিতে? আমাদের প্রকৃতি যখন আমাদের জৈব দৃষ্টিকে প্রধান বলে ঘোষণা করে তখন আমরা হারিয়ে যাই জীবনের চক্রপিণ্ট আবর্তে, ফুরিয়ে যাই প্রয়োজনের সীমায় চলতে চলতে এবং সব শেষে স্মৃতি থেকেও বিস্মৃতির অতলে সরে যাই নিঃশেষে নিজেদের মুছে দিয়ে। আবার, আমাদের প্রকৃতি যখন অন্তরের উপলব্ধির দৃষ্টিকে প্রধান বলে ঘোষণা করে তখনই আমরা আলোর দেখা পাই, সুন্দরের স্পর্শ অনুভব করি, এবং আমাদের অন্তরের সম্পদকে আমরা প্রকাশে সর্বজনের করে তুলতে চাই। পাথরের গুহা দেওয়ালে আমরা সেই অনুভবকে চিরায়ত প্রকাশ ঘটাতে চাই, চাই মর্মরগাত্রে, শিলাখণ্ডে, গৃহের অঙ্গনে দেয়ালে, শ্লেটপাথরের বুকে, কাগজে-কলমে, বাঁশিতে-সেতারে, কণ্ঠের কম্পনে আর দেহের ছন্দে। নিজেদের অনুভবকে এই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস এও তো প্রকৃতিরই দান। এই প্রকৃতিই বার বার হাতছানি দেয়, ডাক দিয়ে যায়। সময় করে একবার এর ডাকে সাড়া দিতে পারলে আকাশের তারাটি হয়ে, সমুদ্রের ঢেউ হয়ে, অরণ্যের সবুজ হয়ে, নদীর বহমানতা হয়ে থেকে যাওয়া যায়।

বিজ্ঞান আমাদের এই দ্বিতীয় প্রকৃতির কথা কিছু বলে কি? সে ঘোষণা করে অস্তিত্বের সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন। ফুলের ভৌত-রাসায়নিক বিশ্লেষণ যেমন ফুলের সুন্দরকে খুঁজে পায় না, তেমনি জীবন বা প্রাণের জৈবিক ব্যাখ্যায় অমরত্বের হদিস মেলে না। আমরা সকলেই তো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি; দু'একজন দেখার দৃষ্টিটি পান মাত্র। আমরা নিজেদের

জন্যে দেখি ; সেই ক'একজন অপরের জন্যে দেখেন। ইন্দ্রিয় আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্রমাত্র ; দৃষ্টি ওঁদের পক্ষে প্রকাশের মন্ত্র হয়ে ওঠে। তাই আমরা রেখা ধরে ধরে হাঁটি আর সীমানায় পৌঁছে শেষ হয়ে যাই ; ওঁরা উপলব্ধির শিরায় শিরায় ঝংকার তোলেন আর সীমাহীন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদের সামিল করে অশেষ হয়ে ওঠেন। ওঁরা সকলেই অনাদি অনন্তের দরবারে কেউ জ্ঞানের জ্যোতিষ্ক হয়ে, কেউ ফুলের সৌরভ হয়ে, কেউ সৃষ্টির শিল্পী হয়ে, কেউ তুলি-কলম-কণ্ঠের যাদুকর হয়ে সময়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যান। সময় একটা বড় বন্ধন ; মৃত্যুও বন্ধন। জন্ম এঁদের করায়ত্ত নয় কিন্তু বন্ধন বটে। আপন মনের চিন্তায়, অনুভবে আর মাধুরীতে এঁরা ব্যক্তিত্বের সনাতনত্বকে শাশ্বত করে তোলেন।

কুম্ভকার যখন চাকার ঘূর্ণনে দলিত-মৃত্তিকাকে ব্যবসায়িক রূপ দেয় তখন তা প্রয়োজনের যান্ত্রিক সীমায় আটকা থাকে ; সেই কুম্ভকার যখন শিল্পীর দৃষ্টিতে মৃৎপাত্রের গায়ে সুন্দরকে আবাহন করে তখন তা প্রয়োজনের সীমাকে ছাড়িয়ে সুন্দরের এলাকায় প্রবেশ করে। নিটোল হাঁড়ি বা কলসীটি বানানো কুম্ভকারের ব্যবসায়িক দায় ; সেই পাত্রের গাত্রে শিল্পসুলভ দৃষ্টিতে সুন্দর যখন উৎকীর্ণ হয়ে সত্য হয়ে ওঠে তখন তো তার কাজ মৃত্যুর রেখায় আর বদ্ধ রইলো না ; নদীবক্ষে শত শত ছেলেরা নৌকোয় মাছ ধরার প্রয়োজনে ভেসে বেড়ায়, কথা বলে, ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে প্রয়োজনের তাড়নায়। কিন্তু তাদের মধ্যে যে একজন অন্তরের আবেগটুকু প্রকাশ করতে ভাটিয়ালি সুরের মূর্ছনায় আকাশে বাতাসে প্রাণের স্পর্শটুকু ছড়িয়ে দিল সে অমনি প্রয়োজনের সীমা পার হয়ে শাশ্বতের দরবারে আবাহন পেল। আবার কলম যখন হিসেব লেখে, অঙ্কের জটিল সমস্যার সমাধানে মুখ দিয়ে কাগজের পিঠে কালির আঁচড়ে ব্যস্ত থাকে, তখন তা প্রয়োজনের রুজ্জুবন্ধনে সসীম ; সেই কলম যখন কবিতার অন্তরটিকে আখরে আখরে শরীর দান করে তখন তা চিরায়তের ধ্বনি পেয়ে যায়। তুলিতে দেয়াল রং হয় ; সেই তুলি শিল্পী মনের রামধনুর প্রকাশে, প্রাণের মাধুর্যে, সজীব সুন্দরকে দৃষ্টির সামনে মেলে ধরে। এ সবই শাশ্বতকে গন্তব্য করে সময় এবং মনের যাত্রা। এখানে আমরা শেষ হয়েও শেষ হয়ে যাই না।

আমাদের সকলের মধ্যেই এই চিন্তার সম্পদ, অনুভবের মাধুর্য এবং উপলব্ধির সত্য কিছু না কিছু জমা থাকে, জমা হয়। আমরা সেই বিন্দুকে সিন্ধুতে রূপান্তরিত করার মন্ত্রটি জানি না। জীবনের শঙ্খটি আমাদের সকলেরই

অধিগত ; যা আমাদের অধিগত নয় তা হল সেই শঙ্খটিতে সমুদ্রের গম্ভীর নাদটিকে ধ্বনিত করে তোলার ক্ষমতা। নিত্য দিনের প্রয়োজন আর স্বার্থচিন্তা দিয়ে আমরা সেই জীবনটিকে প্রতিনিয়তই আহত করে ক্ষুদ্র করে ফেলছি ; যাঁর স্বরূপে বিরাট আছেন, যাঁর প্রকৃতির মধ্যে মহাজীবন ধ্বনিত হবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, আমরা সেই জীবনকে, সেই শঙ্খটিকে ঊর্ধ্বমুখী করে শাশ্বতের বাণীতে ধ্বনিত করে তুলছি না, সনাতন সত্যের ঋত দ্বারা শুদ্ধ করে নিচ্ছিনা।

এই তুলছি না বা নিচ্ছিনা বলেই আমরা শত শত ব্যক্তি জন্ম মৃত্যুর রেখার বাইরে বা ঊর্ধ্বে উঠতে পারছি না। দু'একজন পারছেন মাত্র। এবং তাঁরাই অমরত্বের পথিক হয়ে শাশ্বতের গন্তব্যে চলে যাচ্ছেন। স্মৃতি হয়েও তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন না ; আমাদের শত-শতর মাঝে বেঁচে থাকছেন। শত বছর পরেও, সহস্র বছর বাদেও।

॥ পরগাছা জীবন ॥

জীবনটা এখন মোহনার কাছাকাছি এসে গেছে। ধীর গতি চলন, মন্থর চিন্তাভাবনা আর ছাড়া ছাড়া টুকরো টুকরো অনুভব ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে যায় আর থেমে থেমে এগুতে চায়। পিছনের জীবনটা অনেক দূর নজরে পড়ে না, বাঁকের আড়ালগুলো ছন্দ ভেঙে দেয়; সামনের প্রসারিত সীমানাও বোঝা যায় না কারণ সামনেটা দেখার চোখটাতো তৈরিই হয় নি। ভাসমান কচুরি পানার মতো মনের শ্লথগতি চলনের মধ্যে এটা ওটা সেটা করে করে ভাবনার টুকরো টুকরো অংশ যেন মাঝে মাঝেই নজরে পড়ে। এই সব ভাবনা গুলোর দিকে সব সময় মন যায় না। ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকলেও যেন দেখে না, মনে রাখে না। আবার কখনও কখনও এক-আধটা ভাবনা মনকে যেন টেনে ধরে, আটকে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে চলতে বাধ্য করে। বিছানায় শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সিলিং-দৃষ্টি হয়ে যুক্ত-কর বুকের মাঝখানে 'লহ নমস্কারের' ভঙ্গিতে জড়ো করে আঙুলে আঙুলে আলাপন চলছিল, আর মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবনার খেলা চলছিল, এমন সময়ে কানে এলো ভাইঝির সুকণ্ঠ পড়ার শব্দ। 'কন্যার প্রতি পিতার পত্র' পড়ছে। প্রকৃতির নিজস্ব বর্ণমালা আছে, সেই বর্ণমালা পড়তে পারলে আমরা অতীতকে অনায়াসেই পড়ে নিতে পারি। একটি নুড়ির সর্বদেহে প্রকৃতি তার নিজের ভাষায় কতো কথাই না লিখে রেখেছেন। শুধু পড়ে নিতে পারলেই জানাটা সোজা হয়ে যায়।

শায়িত অবস্থানেই আমার পদ-আন্দোলন স্থির হয়ে গেল, আঙুলের কথোপকথন স্তব্ধ হয়ে গেল, মনের মধ্যে একটা ভাবনা দানা বেঁধে উঠলো; জীবনেরও তো নিজস্ব ভাষা আছে; সেই ভাষাটা রপ্ত করতে পারলেও তো অতীতকে অনেক বেশি করে জানা যায়! একটি এবড়ো-খেবড়ো পাথর, যে সম্ভবত কোনও পাহাড়ের গায়ে আটকেছিল, বৃষ্টির আঘাতে আঘাতে স্থানচ্যুত হয়ে ঝরনার দ্রুতগতি আকর্ষণে ছুটতে ছুটতে অন্যান্য পাথরে ঘা খেয়ে খেয়ে, সমতলে, নদীবক্ষে স্থান পেয়ে গেল। নদী তাকেই নিয়ে চলল সামনের দিকে, আর এক সময়ে সেই পাথরের খণ্ডটি তার সকল তীক্ষ্ণধার এবং অসম চেহারার সবটুকুই হারিয়ে, মসৃণ আর উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে, তটভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এলো। কখনো

পাশে সরে গেল না তারা ক্রমশই টুকরো টুকরো হতে হতে আর মসৃণ হতে হতে সহস্র সহস্র বালুকণার জন্ম নিল আর বেলাভূমিতে ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী হয়ে নানান রূপ পেয়ে সকলের মন ভোলাতে লাগল। বড় বড় ঢেউ এসে আবার তাদের টেনে নিয়ে গেল জলের গভীরে, অট্ট-হাসিতে অথবা বিনম্র-ঢেউ-ভঙ্গ-প্রলেপের আদরে।

একটি নুড়ি-পাথরের জন্ম কাহিনী, তার ইতিহাস তার মাতা-প্রকৃতি নিজের হাতেই সেই নুড়ি-সন্তানের মর্তদেহে লিখে পাঠান। অনুভবের দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতার চোখ থাকলে সেই অলিখিত ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। তাহলে প্রত্যেকটি জীবন যে জন্ম থেকে প্রবাহিত হয়ে হয়ে মোহনার কাছে এসে প্রাণের মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায় তার ইতিহাস কি লেখা থাকে না? লেখা থাকে না সেই জীবনের পরতে পরতে, পর্বে পর্বে?

এখন এই জীবনের শেষ পর্বে এসে যেন দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পরগাছা! প্রথম জীবনে মাতৃদেহ-বৃক্ষে এবং শেষ জীবনে সংসার-বৃক্ষে! শুরুতেও আমরা মায়ের অস্থি-মজ্জা, রস-রক্ত, শক্তি-স্বাস্থ্য শুষে বেঁচে থাকি, শেষ কালেও আমরা সংসার-বৃত্তের মধ্যেই বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করি। শুরুর স্বাভাবিক আগমনে আমরা সকলেই আদরে-যত্নে, স্বাগতে-প্রতীক্ষায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, বরণে-আবাহনে সমৃদ্ধ হয়ে আগমন লগ্নটিকে পরগাছা-প্রকৃতি বলে বুঝতে পারিনা; অপসৃয়মাণ সময়ে ধীরে ধীরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনাদরে-উপেক্ষায়, ধিক্কারে-অপমানে, জড়ত্বে-অকর্মণ্যতায় পরিষ্কার বুঝে যাই যে মন টনটন পরগাছা জীবনের ভাষাটি বেশ মধুর নয়।

এই পরগাছা প্রকৃতিটি অনেকের জীবনে গভীর করেই এঁটে বসে যায়। এককড়ি, দু'কড়ি, তিনকড়ি হয়ে নামের রবারস্ট্যাম্প সর্ব অস্তিত্বে সারাজীবনই ঘোষণাপত্রের মতো লেগে থাকে। গর্ভধারিণী জননী সন্তানের মৃত্যুভয়ে সদ্য-জাত সন্তানকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন; এবং পরে যে মূল্যে ক্রয় করেন সেই মূল্যতালিকাটি সেই সন্তানের নামাবলি হয়ে জড়িয়েই থাকে। 'হয়ে-হয়ে-মরে যায়' এমন ক্ষেত্রে এই লেনদেনের গ্রাম্য ব্যবস্থা সরল মনের সহজ প্রকাশ সূচিত করে মাত্র। সকল সন্তানই পরগাছা; কোনও কোনও সন্তান একটু বেশি মাত্রায় দ্বিপর্ব-পরগাছা এই যা তফাৎ!

আমাদের বাল্যকালটি, জীবনের সকালবেলাটি, মাতৃ-বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে সংসার-বৃত্ত-বৃক্ষটিকে আঁকড়ে ধরে বেড়ে ওঠে। আমাদের সকল কিশলয়ের

হিল্লোল, বৃক্ষের ডাঁটো হয়ে ওঠা, দেহের শক্তি সঞ্চয়, মনের ভরণ পোষণ—সবই পরজীবী, পরনির্ভর, পরান্নভোজী। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলে মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং জীবনবিজ্ঞানীকে শুধিয়ে নিতে পারেন। তার পর যৌবন কালে আমরা আবার সম্পূর্ণ পরগাছা বা পরজীবী হয়ে যাই—মেয়েরা ; অথবা মনে মনে পরগাছা বা পরজীবী হয়ে পড়ি—ছেলেরা। সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা ; তাঁরা তো মানুষই নন, সন্ন্যাসী মাত্র! জীর্ণবস্ত্রের মতো তাঁরা সব বন্ধনকে ত্যাগ করতে পারেন, একমাত্র বস্ত্রখণ্ড ছাড়া! যদি বলি তাঁরাও পরজীবী, ঈশ্বর জীবী, তাহলে আপনারা রাগ করতে পারবেন না ; আর যে সকল সন্ন্যাসী যে কোনও বস্ত্রখণ্ডকে আচ্ছাদন মাত্র না রেখে টেরিকটনে সমৃদ্ধতর বোধ করেন তাঁরা যে পরগাছা, পরজীবী, তা নিয়ে কোনও প্রতিবাদের ঝড় উঠবে না বলেই মনে করি, সন্ন্যাসীদের অপর নাম ভিক্ষু নয় ?

আমাদের মধ্যে যারা মেয়ে তারা পিতৃগৃহে লালিত-পালিত, মায়েদের স্নেহ-বারিসেচনে পুষ্পিত-পরিণত। পরগৃহে 'গ্রাফটেড' হবার জন্যে সদাসর্বদা আবেষ্টিত সুরক্ষিত! মাতৃগৃহ-পিতৃগৃহ তাদের কাছে প্রথম থেকেই পরগৃহ ; তারা স্বাভাবিক পরগাছা। কনকাঞ্জলি দিয়ে ঋণ শোধ করে তবে তারা যাত্রা করে 'স্ব'-গৃহের উদ্দেশে। সেই গৃহ যে তাদের পর-গৃহ-বাস—অন্তত প্রথম প্রথমের ক'একটি বছর—তা তাদের চাইতে আর কে বেশি করে জানে ? তাদের এই পর-বাস-পরগৃহ-পরজীবী জীবন মর্মের তন্ত্রীতে বেদনার ঝংকার হয়ে অনুক্ষণ বাজতে থাকে। এক গাছের ডাল অন্য গাছে 'কলম' করে তাদের এই জীবন নিয়ে অনেকেই কলম ধরেছেন। তথ্যের, সুতরাং, অভাব কোথায় ? পিতৃ গৃহের প্রাণরসের যোগানের সূত্রটি অবসিত, স্বামীগৃহের গভীরে মূলটি প্রসারিত নয়, পত্র-পল্লবে 'ফটোসিনথেসিসের' মাধ্যমে খাদ্যাহরণ প্রক্রিয়াটি উন্মুক্ত হয়ে উঠলো না, তাই মনের রসদের অভাবে আত্মা পীড়িত হতে থাকে। এটা কি সব থেকে বেদনাদায়ক পরগাছা জীবন নয় ? ভবিষ্যতের হাতছানিটি যারা দেখতে পায়, সম্ভাবনার বীজটির অংকুরোদ্গমের চেতনাটি যাদের মনে ভাবের সামঞ্জস্য বিধান করে আর অপেক্ষাকে যারা প্রাপ্তির পাথেয় করে নিতে পারে তারা এই পরজীবী সত্তার উর্ধ্বে উঠে পরাশ্রয়ী জীবনটুকুকে সহনীয় করে নিতেও পারে। তাতে অবস্থানের কোনও হেরফের হয় না ; মনের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয় মাত্র।

যারা ছেলে তারাও স্বগৃহেই অচিরাৎ পরবাসী, পরজীবী হয়ে ওঠে! কেমন করে হবে ? যে মা স্নেহের ধারাতে অসীম, খাদ্যের যোগানে অশ্রান্ত, সুরক্ষার

সর্বতোব্যবস্থায় বিনিদ্র সেই মা এখন ক্রমশই দূরের হয়ে ওঠেন; স্ত্রী-আপন মাতা-পর, যে না বোঝে সে বর্বর! জৈব-মানসিক একাত্মতা, স্বতন্ত্র ভাবিষ্যতের একান্ততা আর আর্থ সামাজিক নিশ্চয়তা বিবাহোত্তর পুরুষকে, কিছুদিনের টালমাটাল অভিযানের শেষে, পরনির্ভর নিশ্চয়তার স্থির গতিতে পেঁৗছে দেয়! মাতৃপিতৃ নির্ভর জীবন এখন ক্রমশই স্ত্রী নির্ভর হয়ে 'পর-জীবী' হয়ে উঠতে থাকে। মাতা বৃক্ষটি ত্যাগ করে স্ত্রী বৃক্ষে পুরুষ তার মূলকে প্রবেশ করিয়ে প্রাণরসের যোগানের উৎস খুঁজে পায়। পরগাছা নয়? এটা পরজীবীত্ব নয়?

আর যারা বিয়েই করে না? তারা তো নিঃসন্দেহেই পরগাছা। নিজের সংসার নেই, স্ববৃক্ষ বলে ব্যাপারটাই অসত্য করে দিলে, পর-বৃক্ষ-সন্ধান অনিবার্য হয় না? হয় এরা মাতৃ বৃক্ষে চিরদিন পরগাছা, নয়তো পিতা বা ভ্রাতা বা ভগিনীর সংসার বৃক্ষে। আর যদি সব ছেড়ে ছুড়ে হোটেল-হোস্টেল-পেইংগেস্ট হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে তাহলেও সেই সেই ক্ষেত্রে এরা পরগাছা জীবন যাপন করে। এরা সকলেই স্বান্ন অবশ্যই, পরান্নজীবী নয়; কিন্তু পরগাছা তথাপিও। পরান্নজীবী না হয়েও এরা পরজীবী।

আমাদের মধ্যে সকলেই নিজের কেন্দ্রটি বাদ দিয়ে অন্য কোথায়ও, অন্য কোনওখানে শিকড় প্রবিষ্ট করে বাঁচতে থাকি এবং ক্রমশ, অভ্যাসের নিজস্ব নিয়মেই বেমালুম কেন্দ্রবিস্মৃত, কেন্দ্র-বিচ্যুত পরগাছা জীবন যাপন করতে থাকি। একবারের জন্যেও মনে হয় না যে আমরা যা নিজেদের মনে করি কেউই আমরা তা নই! নিজেকে হারিয়ে সারাজীবন নিজের নামধারী দেহ-অস্তিত্বটি বয়ে বেড়াই এমন অনায়াস সাবলীলতায় যে আঙ্গুল তুলে বলার প্রায় কেউ থাকে না আশে পাশে। সবাই আমরা পরগাছা বলে কেউ আর নিজেকে পরগাছা বলে চিনতে পারিনা, চেনাতেও সুযোগ পাই না। 'বেড়ে' জীবন আমাদের!

অনেকেই আমরা অফিস-অন্ত প্রাণ; অনেকে স্ত্রী-অন্ত জীবন। কেউ আমরা তাস-বৃক্ষের রসে সিক্ত জীবন যাপন করি—ট্রেনে, প্লাটফরমে অফিসের 'এ্যান্টি-রুমে', ক্লাবে; কেউ রেসের মাঠে অস্তিত্ব-কেন্দ্রের সন্ধান পাই, কেউ বা স্বল্পালোকিত পান-গৃহের নৃত্যো-ছন্দে-গানে। কেউবা আমরা শ্বশুর বাড়ির নৈকট্যে জীবন সমৃদ্ধ বলে মনে করি (স্ত্রী-তোষণ নয়?) কেউবা সর্ব-সূত্র-ছিন্ন আধুনিক ফ্ল্যাটের ঘন একাকিত্বে। অনেকেই নিজেকে খুঁজে পাই পরস্ত্রীর নৈকট্যে, অনেকেই পরনারীর সুরক্ষিত আবাসে। এক কথায় আমরা নিজ নিজ জীবন-সত্যের কেন্দ্রটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে বৃত্তের শত-সহস্র বিন্দুতে নিজেদের

খুঁজে মরি, সারা জীবন, সেখানে, সেই সব বিন্দুতে আমরা কেউই সাঁতা নই। সারাজীবন পর-বৃত্ত জীবন কাটাতে কাটাতে বৃহৎ জীবনের বৃত্ত-মধ্যস্থ বিন্দুতে বিন্দুতে ঘুরপাক খেতে খেতে কখন যেন সকলেই আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সারাজীবন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে স্বকেন্দ্রটিকেই হয়তো খুঁজি; কিন্তু মানুষের বিধিলিপি কাটিয়ে উঠে স্বগৃহে, স্ববিন্দুতে, স্ববৃক্ষে স্থিত হতে পারিনা। স্বান্বেষণ শেষ হলে যখন সংগ্রহের ভাণ্ডারটির পরিমাপ করতে বসি তখন ঝোলায় দেখি শূন্য, দৃষ্টিতে থাকে শূন্যতা এবং অবশিষ্ট ভবিষ্যও বয়ে আনে এক বিরাট শূন্যতার অনুভব। বেদনাবিধুর মনে তখন যতবার ঝোলা হাতড়াই ততবারই শূন্য-মুষ্টি হাতে অসহায়তার দানা-দানা অনুভব যেন মর্মকে নাড়া দিতে থাকে।

যত ক্রোধ তখন প্রকৃতির দিকে ছুঁড়ে দিতে চাই। যদি এমন একটা সম্ভাবনাময় জীবন দিলেই তাহলে সঙ্গে করে কেন্দ্র-অন্বেষণ যোগ্যতাও কেন দিলে না? প্রাণের অভিব্যক্তিতে তুমি তো সর্বত্রই এই নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে খুঁজে নেবার ঈপ্সাটি অন্তঃস্যূত করে রেখেছো, নিজের কেন্দ্র বিন্দুটিকে জীবন সত্যের উদ্ঘাটনে সমৃদ্ধ করার অত্যুগ্র বাসনাটিকে প্রোথিত রেখেছো, তাহলে যোগ্যতা দিলে না কেন? সেকি প্রচেষ্টাকে একাগ্র করার জন্যে? সেকি সিদ্ধি লাভের জন্যে, সাধনাকে নিষ্কম্প্র করার জন্যে?

শেষ বেলায় এসে, বেলা শেষের দ্বারে দাঁড়িয়ে, শুরুর অন্বেষণ ব্যর্থ-প্রচেষ্টা নয় কি? সামনে যখন গোনাগুনতি ক'টি দিন পড়ে থাকে, পিছনে চলে যায় অগুনতি সম্ভাবনাগুলো তখন, অলস সেই অকর্মণ্য অবসরে, হিসেবের খাতায় কেবলই লাল কালির দাগ পড়তে থাকে! বারে বারেই মনে হয় সারা জীবন যাকে বয়ে বেড়ালাম সে আমি নই, আমি নই; সারা জীবন যা কিছু করলাম সে আমার সবই অকাজের বোঝা হয়ে আঁটি-আঁটি জমা রয়ে গেল, কারো কোনও কাজেই আসবে বলে মনে হয় না। নেশার ঘোরে সারাটা জীবন ছুটোছুটি করলাম; মনে করলাম অনেক করা হল, অনেক জমা হল, অনেক সার্থকতায় জমার ঘর পূর্ণ হয়ে এলো। এমন সময় যখন পিছন-তাকানোর সময় এলো তখনই বুঝলাম সময়ও নেই সংগ্রহও নেই।

পরজীবী, পরগাছা হয়ে জীবন যাপন করার এই এক মহা অন্তরায়। সময় চলে গেলেই ভেবে দেখার সময় আসে; আশ্রয়টি হারিয়ে গেলেই স্ব-আশ্রয়ের অভাবটি ধরা পড়ে; বৃক্ষ যখন ঠেলে ফেলে দেয় তখনই সত্যটি উদ্ঘাটিত হয় যে

যে-বৃক্ষে জীবন যাপন করা হল সেই বৃক্ষটি আসলে আমিই নই।

অথচ আমরা সকলেই নিজেদের অমর করে রেখে যেতে চাই উত্তর পুরুষের মধ্যে। আমরা সকলেই আমাদের চিন্তাভাবনা অনুভবগুলোকে প্রকাশ করে যেতে চাই আমাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে। সারাজীবন আমরা যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি, অনুশীলনে বিশ্লেষণে আপন করে পাই তাকে আমরা চিরায়ত সত্য মনে করে তৃপ্তি বোধ করি, সার্থকতা খুঁজে পাই। সেই সত্যকে, সেই উপলব্ধিকে সর্বজনের করে রেখে যেতে চাই। এখানেই এক বিরাট স্ববিরোধ।

এই স্ববিরোধ থেকে উত্তরণের পথ কোথায়?

॥ যদি ॥

কাজকর্ম এখন যা করি তা তো নামমাত্র। সময় অফুরন্ত। ট্রেনে যেতে যেতেও অফুরন্ত শূন্য সময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কতো রকমের ভাবনা, অনুভব, সমস্যা সেই শূন্য সময়কে ভরাট করে রাখে। ভিড়ের মধ্যেও একা একা চলতে থাকি ; গতি সেখানে আমার নয়, যন্ত্রের। মাথার মধ্যে যে ভাবনা চিন্তার প্রবাহ সেখানে গতি কে দিচ্ছে ? অলস মস্তিষ্ক হলে শয়তান গতির কেন্দ্রে থাকে শুনেছি ; কিন্তু মাথাটা যখন অলস অনুভবে ভরা থাকে তখন ? অনুভবগুলো বোধহয় নিজেরাই গতিশীল, পথ করে করে নিজেরাই এগিয়ে যায়, এগিয়ে চলে। বিষয়ের বাদ-বিচার নেই, সময়ের ধার ধারে না। একটু কিছু সুযোগ পেলেই জাল বুনতে বসে যায়।

সেদিন সেইরকম এক অলস মুহূর্তে অনুভবের গতি পথটি আবিষ্কার করলাম। যদি এটা না হয়ে ওটা হতাম, যদি ওটা না করে সেটা করতাম, যদি এমন না হয়ে অমনটি হত—এই করে করে যদি'র পাহাড় যেন ঝুর ঝুর করে ভাবনার জগতে অতীতকে ধরে ধরে সামনে আনতে লাগল। প্রথমটায় একটা ঘোর ঘোর ভাব ছিল ; সেই ঘোর কেটে গেল একটা মজার অনুভবে। তাইতো, 'যদি' গুলোকে নিয়ে যদি গুছিয়ে ভাবা যায় তাহলেও তা অনেকটা সময় শূন্যতা থেকে মুক্তি পায় ! সময়কে যদির পিছনে লাগানোটাই স্থির করে ফেললাম।

আমাদের সকলেরই জীবনে যখন সময়টা এই রকম অফুরন্ত হয়ে দেখা দেয় তখন আমরা হাতের তালুতে গালের ভার রেখে ভাবতে বসি ! কিন্তু ভাবিনা কিছুই, ভাবনা এগোয়না, এলোমেলো হয়ে কেমন যেন খেই হারিয়ে যায়। 'কি ভাবছ ?' প্রশ্ন শুনলে হকচকিয়ে হাতের তালু থেকে গণ্ডভার মুক্ত করে প্রশ্নকর্তার চোখে তাকাই ; 'কৈ কিছুই না তো।' আসলে ভাবছিলাম অনেক অনেক কিছুই, খিচুড়ি-বিষয়, অসংলগ্ন ভাবনারা ভেসে ভেসে আসছিল আর কোনও স্মৃতি না রেখে চলে যাচ্ছিল। তাই আমাদের উত্তরটি কিন্তু সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। সঠিক উত্তর বোধহয়—কি জানি ? মনে নেই তো !

খোকার প্রথম শৈশবে যে প্রশ্ন সে মাকে অকাতরে শুধাতে পারে, সেই একই প্রশ্ন দ্বিতীয় শৈশবে আমরা করলে—কাকে করব ? মা কোথায় ?—লোকে মুখ

টিপে হাসতে পারে; ভাবতে পারে দীর্ঘজীবন পার করে এসে অনুশোচনার তাপে সিদ্ধ হচ্ছি, ভুলের জাবেদাখাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটতে বসেছি, যা পেয়েছি তাতে সন্তোষ পাইনি বলে ফেলে আসা পথ ধরে হেঁটে অন্য গন্তব্যের সন্ধানে আত্মতুষ্টি খুঁজছি। আসলে যদিগুলো আছে বলে যেমন অতীত অনেক তাজা হয়ে দেখা দেয়, ঠিক তেমনি বর্তমানগুলো দারুণ 'চুনোতি'—চ্যালেঞ্জ—নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষের সামনে এবং পিছনে 'যদি' আছে, অন্যদের নেই। তাই জীব জগতে সহজ-সরল রেখা-নিশ্চিত প্রবৃত্তি-নির্দেশিত শুরু ও শেষ আছে। আমাদের জীবনে প্রবৃত্তির বাইরেও অনেক কিছু আছে যা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, একাধিক পথ বা সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাশক্তির ও গন্তব্যের নির্ণয়ে বাছবিচার করতে হয়। প্রাণিজগতে এ-ধরণের সম্ভাবনা থাকলেও, যেহেতু ওদের স্মৃতি নেই তাই ওরা সেই 'যদি'গুলোকে আর খুঁজে পায় না। ওদের ভাষা নেই, লেখা বা ছাপানো স্মৃতি-কল্পনা-অনুভবের ভাণ্ডার নেই তাই ওদের জীবন থেকে 'যদি' হারিয়ে যায়, মুছে যায়। আমাদের তো তা যায় না। অলস মুহূর্তে তাই এই সব ফেলে আসা শত শত 'যদি'-রা আমাদের মনের সামনে এসে প্রশ্ন তুলে চিন্তাভাবনা গুলোকে থমকিয়ে দেয়, নোতুন করে ভাবতে বলে।

'যদি ছেলে না হয়ে হতেম তোমার মেয়ে…?' এ-প্রশ্ন নয়; কিন্তু 'যদি আর্টের ছাত্র না হয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হতাম' অথবা বিপরীতক্রমে বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়ে আর্টের বা কোনও হস্তশিল্পের ছাত্র হতাম? যদি যে স্কুলে পড়েছি, যে কলেজে, সেই স্কুলে বা কলেজে না পড়ে অন্য স্কুলে বা কলেজে পড়তাম? যে খেলায় মন ছিল, অথবা শরীর চর্চায়, সেই পথেই যদি ভবিষ্যতকে খুঁজতে চাইতাম, এখন যা করছি সেই কাজে বা সেই জীবনে নয়? যদি সারাজীবনই যে চাকরি বা ব্যবসায় করলাম, সেই চাকরি বা ব্যবসায় না করে অন্য যেটা সম্ভব ছিল তাই করতাম? যে সব ছেলেরা, বা মেয়েরা আমার বিবাহের জন্যে সম্ভাব্য পাত্র বা পাত্রী ছিল তাদের মধ্যে যদি, যাকে নিয়ে ঘর করলাম তাকে নয়, অন্য কাউকে নিয়ে ঘর করতাম? এরকম কতো শতো 'যদি'-সম্ভাবনা, 'যদি'-পথ পার হয়ে হয়ে তবেই আমারা সকলে এই জীবনের বয়সটাকে বাড়াতে পেরেছি এখন যদি স্মৃতির খুন্তিখানা দিয়ে সময়ের কড়াইতে জীবনের সব 'যদি' গুলোকে উল্টে পাল্টে ভাজা ভাজা করি আর কল্পনার স্রোতে এ-ঘাট ও-ঘাট করতে থাকি তাহলে সে কি খুব দোষের হবে? এ-তো আমরা সকলেই করি, অলস অবসরে

করি, আবার অন্তর্জ্বালার যন্ত্রণাতেও করি। 'তোমার সংসার করে করে আমার হাড় কালি হয়ে গেল!' [যেন অন্য কারো সংসার করলে হাড়ে সূর্যের সাতরঙ বর্ণ-ছটা ছড়াতো!] 'এই চাকরি করে আমি শেষ হয়ে গেলাম!' [যেন অন্য কোনও চাকরি করলে আকাশের নীলে বিচরণের অসীম আনন্দ পাওয়া যেতো!] 'আর্টস্ বিষয় নিয়ে এম. এ. করে মাটি খাওয়া কাজ হয়েছে, চাকরির দেখা নেই, সামাজিক মূল্য নেই, বিয়ের বাজারে দাম নেই!' [যেন বিজ্ঞান নিয়ে যারা এম. এসসি. করেছে তারা স্বর্গোদ্যানে বেকারত্বহীন কর্মজীবন যাপন করে চলেছে!] এ-মতো শত শত ফেলে আসা যদি-বিন্দু-নির্ভর অনুতাপ, অনুশোচনা, আত্মপীড়ন আমাদের ধেয়ে চলা জীবনের সামনে, হু হু করা স্টেশনের মতো হঠাৎ হঠাৎই এসে দাঁড়ায়। দল বেঁধে হাজির হয় যখন গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। কারণ তখন অফুরন্ত অবসরে জীবনের দীর্ঘ-পৃষ্ঠ খাতাখানা, অথবা মোটাসোটা বইখানা বার বার পড়তে হয়, পড়ে দেখার সময় থাকে, দৃষ্টিটা অতীতময় হয়।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই যদিগুলো এক একটা মোড় বা সন্ধিস্থল। মোড়ে মোড়ে থাকে জীবন পথের দিক-পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিকল্প পথ। দুই পথেই একই সঙ্গে যাওয়া যায় না। তাই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়, এক বা একাধিক বিকল্প সম্ভাবনা ছেড়ে দিতেই হয়। একটাকেই বেছে নিতে হয়। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা জীবন নিজেই পছন্দ করে না, সায় দেয় না। ছোটবেলায় এই সিদ্ধান্তগুলো—মোড়ে মোড়ে পথ ঠিক করার দায়গুলো—অভিভাবকরাই নিয়ে থাকেন। তাই এই সময়ের সিদ্ধান্তগুলোকে—যদি-গুলোকে নিয়ে আমরা আত্মনির্যাতন ছাড়াই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারি, চাপিয়েই থাকি। একটু বয়স বাড়তেই, ভিতরে ভিতরে যখন বেশ ডাঁট হয়ে উঠি তখনও চেষ্টা করি, বেশির ভাগ আমরাই তাই, সিদ্ধান্ত নিতে নয়, সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে। দায়টা অন্য স্কন্ধে রাখাটাই কম মানসিক চাপের কারণ হয়। বর্তমানেও, ভবিষ্যতেও!

বড়দের মানসিকতার মধ্যেও একাধিক জটিলতা কাজ করে। ঈগো বা আত্মতুষ্টি। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং 'সন্তানরা আমার বাধ্য' এই বোধের প্রকাশ ঘটাতে বড়রা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চান। দ্বিতীয়ত, এঁরা নিজেদের ছোটবেলার খেদ, ঘাটতি এবং অসাফল্যগুলোকে সন্তানদের মাধ্যমে পূরণ করে নিতে চান; অবদমিত বাসনার জগৎ দ্বারা এঁরা প্রভাবিত করেন সন্তানদের। তৃতীয়ত,

ঘোষণা করেন 'তোমরা বা তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর' কিন্তু সন্তানের জীবনের হালে নিজেরা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে সর্বদাই সতর্ক থাকেন। এটা একটা সুবিধাবাদী হাতিয়ার হিসেবে ভবিষ্যতেও ব্যবহার করার জন্যে করে থাকেন। চতুর্থত, নিজেদের সামাজিক-পারিবারিক সম্মান বোধ দ্বারা ছোটদের প্রভাবিত করে রাখেন। 'লোকে কি বলবে, ভাববে?' এটাও একটা বিবেচনার বিষয় হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

বড় ও ছোটর এই মানসিক দ্বন্দ্বে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে, যদি-মোড়গুলো সিদ্ধান্তমুখী হয়। দু'পক্ষই অপরের স্কন্ধ খোঁজে দায়ভাগ বহনের জন্যে! এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক চেতনা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। তার ফলে জটিলতা যতটা বেড়েছে সমাধানের সূত্র ততটা সহজ হয় নি। ছোটরা আর ততটা বড়দের বাধ্য নয়, নির্ভরশীল নয়; নিজেদের চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ও অধিকার বিষয়ে তারা অনেক বেশি জাগ্রত, সচেতন। বড়রা উপরের চতুর্বিধ কারণের আঘাতে অনেক বেশি ধৈর্যহীন, অসহায়বোধ দ্বারা আক্রান্ত এবং সুতরাং উত্তেজিত বোধ করেন। সিদ্ধান্ত যৌক্তিক পথ, উচিত-অনুচিতের বিচার ছাড়িয়ে প্রায়ই আবেগের স্রোতে ভেসে যায়।

তাই অনেকটা পথ কোনও একটি পথে পার হয়ে এসে ব্যক্তির মনে হয় বিকল্প সমৃদ্ধ অন্য পথটি পরিক্রমণ করলে অনেক ভাল হত, 'শুভ' হাতের মুঠোয় ধরা দিত, যন্ত্রণা কষ্ট অনেক কম হয়ে দেখা দিত। যে পথ ধরে আমরা প্রত্যেকে হাঁটি সেই পথের সব কাঁকড়-বালি-পাথর, খাড়াই-উতরাই আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তবতায় কঠিন সত্য হয়েই আঁকা হয়ে থাকে। সমূহ এবং তাজা। যে পথটি হাঁটা হয় নি, সম্ভাবনা ছিল, দূরে ফেলে আসা সেই পথটিকে তখন প্রাকৃতিক কারণেই অধিকতর সবুজ বলে, মসৃণ বলে, সমতল বলে মনে হতেই পারে! 'ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস!' —এই কাল্পনিক উচ্ছ্বাস থেকে আমরা মুক্তি পাই না।

বাংলা নিয়ে এম. এ. করার পর যখন চাকরির, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বাজারে নিজের 'বাজার-দর' বিষয়ে সন্দেহ, সন্দেহ থেকে অনুশোচনা, অনুশোচনা থেকে আত্মধিক্কার স্বতঃ উত্থিত বাষ্পের মতোই আমাদের মনকে ঘিরে ফেলে তখন আমরা এই 'হাঁটা-পথ' আর ফেলে আসা পথের তুলনা করতে বসি। ইতিহাস নিলে ভাল হত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন নিলেও তো এতোদিনে একটা পথ হয়ে যেতো! এ-যেন জুয়া খেলতে বসে যে ঘরে ঘুঁটি ধরেছি সেই ঘরটাই

'কপাল পোড়া' বলে ধিক্কার দেবার মতো ; অন্য ঘরেই সাফল্যের হাতছানি ! অথবা ডাক্তাররাই স্বাধীন. অর্থের বিছানায় তাদের দিনের বিশ্রাম আর রাতের শয়ন চলছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে জীবন সংগ্রামে এখন অকারণেই রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, আর বিদ্যুতের বিপদ ঘাড়ে করে অপরের গোলামি করতে হচ্ছে ! আর ডাক্তাররা রুগীর অবস্থা বিষয়ে 'টেন্শন্' বয়ে বেড়ান, মৃত-রোগীর আত্মীয়স্বজনদের 'ঘেরাও' আর দুর্বিনীত বাক্যধারায় পর্যুদস্ত এবং রাতের গভীরে ঘুমের আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপন করে 'ব্যাগ' নিয়ে বাইরে যান—আর ভাবেন মাটি খাওয়া কাজ হয়েছে ডাক্তারি পড়ে ; পার্টি নেই, ক্লাব নেই, ছুটি নেই শান্তি নেই, এতটুকু স্বস্তি নেই—কেবল রুগী, রুগী আর রুগী করেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। অর্জিত অর্থ প্রয়োজনের আকণ্ঠ পূরণ করতে পারে, মনের শান্তি-তৃপ্তি-মুক্তি দিতে পারে কি ?

সব ক্ষেত্রেই এমনি। 'যদি' আমাদের পথের বাঁকে বাঁকে সোজা সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় আর প্রশ্ন করে : যদি এটা না করে সেই সময়ে ওটা করতে, যদি এই সিদ্ধান্তটি না নিয়ে ওই সিদ্ধান্তটি নিতে তাহলে…। জীবনের প্রথম চাকরি বেছে নেবার সময় (যাদের সামনে বেছে নেবার সুযোগ ছিল।) যদি রেলে চাকরিটিই স্বীকার করতাম, সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে করণিক হবার সিদ্ধান্তটি না নিতাম, তাহলে…। যদি স্কুল-কলেজে আর একটু বেশি সময় আর মনোযোগ দিতাম, মার্কসীটের সংখ্যা-স্বাস্থ্য যদি আশানুরূপ দর্শনধারী করে তুলতে পারতাম তাহলে, এই এখন, সারাজীবন মুদিখানার বা মাড়োয়ারীর গদিতে খাতা লেখার বদলে একটু প্রশস্ত ঘরে স্বীকৃত দপ্তরে জীবন কাটাতে পারতাম। এবং এমতো শত শত পিছু ফিরে দেখা, বর্তমানের বাস্তবকে অতীতমুখী 'যদি' দিয়ে নোতুন করে কল্পনার ঘুড়িটিকে আমরা কতো সহজেই আকাশে উড্ডীন রেখে মনের খেদ পূরণ করে নিতে চাই, সবুজের ছোঁয়া দিয়ে দৃষ্টির ছানিটুকুকে সরিয়ে ফেলতে চাই।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই 'যদি'-র মার বড় মার। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বা মনোনয়নে, প্রেমের খোলামেলা দরিয়ার বুকে সাঁতার কাটার শেষে ঘর বাঁধার মুহূর্তে, চাকরি ব্যবসা বা স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে ; গৃহ নির্বাচনে, জমি কেনার সময়ে, গৃহ-নির্মাণে। এই সব বড় বড় এবং দীর্ঘ মেয়াদী সব কাণ্ড কারখানা নিয়ে যখন সিদ্ধান্ত করি তখন তো অনেক ভেবে চিন্তেই করি। তা সত্বেও বিকল্পগুলোর অবশিষ্টরা ঘাপটি মেরে স্মৃতির

গভীরে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে। সময় পেলেই ঘাড় মটকে দিতে চায় ; একটু দুর্বল পেলেই 'হালুম' করে ওঠে। বয়স যত বাড়ে শক্তি তত কমে। কে না জানে ? তাই বেশি বয়সে এই সব মনের গভীরে অপেক্ষমাণ বাঘগুলো —যদির নামাবলি গায়ে দিয়ে—আমাদের কাত্ করে দেয়।

ছোটোখাটো ব্যাপারে, দৈনন্দিন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের বেলায়ও 'যদি' যথেষ্ট বেগ দেয়। পরপর ট্রেন ছাড়ছে ; তা সত্ত্বেও যেটাতে আপনি উঠলেন সেটাই কিছুদূর গিয়ে লাইন উপচিয়ে পড়ে গেল, মালগাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি হল, কামরায় আগুন ধরে গেল ! তখন বার বারই যদির খোঁচা খেতে হবে, যদি ঐটিতেই না চড়ে পরেরটা বা আগেরটায় চড়তাম। এমনি করে ট্রাম, বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি, মিনি ; এ-পথ, সে-পথ, এঘর-ওঘর। সবই নৈমিত্তিক। কিন্তু ভাল হলেও যদি মন্দ হলেও যদি ঃ যদি ঐ ট্রেনে উঠতাম তাহলে ? যদি না উঠতাম তাহলে ? বেঁচে যেতাম ! ?

বয়স যত বাড়ে এই 'যদি'র বোঝাও তত বাড়ে। যত বেশি পথ পার হতে হয় ততো বেশি বিকল্প সামলাতে হয়। তাই। এবং শেষ বেলায় এই 'যদি' নিজেদের ভারেই বহমান ঘাড়কে নুইয়ে দেয়, স্পন্ডিলাইসিসের আক্রমণে গতি পরিবর্তন-শক্তি হারিয়ে স্থির হয়ে এক দৃষ্টিতে যদি-দৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন তো আর জন্ম তারিখ নিয়ে এতো কড়াকড়ি ছিল না ; তাই বয়সটা দুবছর কমিয়ে দিয়ে যদি বয়সটাকে ছোট করে দিত (মা বাবা) তাহলে তো আরও দুটো বছর কাজ করা যেতো, পান চিবিয়ে দশটা পাঁচটা করা যেতো, দুবছরের মাইনে, পি. এফ এবং ইত্যাদির বৃদ্ধির ফলে ছোট মেয়েটাকেও পার করার সুযোগ পাওয়া যেতো, অথবা গৃহের অবশিষ্ট কাজ সমাপনে সুবিধা হত।

অবসর নিয়েও তো শান্তি নেই ; আবার পাওয়া যায় না ? রি-এমপ্লয়মেন্ট ? অন্য কোথায়ও মাস মাহিনাতে না হলেও যদি দিনান্ত কাজ পাওয়া যায় তাহলেও তো সংসার তরণীটির হাল ভাঙ্গা পাল-ছেঁড়া অবস্থাটাকে সামাল দেওয়া যায়। যদি অবসরের বয়স আটান্ন থেকে বাষট্টি অথবা পঁয়ষট্টি করা হত ? যদি মহার্ঘভাতার অংশটুকু কেন্দ্রিয় সরকারের মতো বা ব্যাঙ্কের মতো হতো ? যদি পথচলা আর বাজার-ঘাটে শ্বাসপ্রশ্বাস আর একটু সহজে নেওয়া যেতো ? যদি বর্ষাকালে পেটের গোলমালটা এতো বেশি প্রবল না হতো ? যদি ওষুধ আর পথ্যের পিছনে আয়ের সিংহভাগ ধ্বসে না যেতো ? হাজারো যদির এই প্রসেশন—কোথায় এর শুরু কোথায়ই বা শেষ তার হদিস দেবে কে ?

শুরু আর শেষের হদিস না পেলেও 'যদি' নিয়ে একটু অন্যভাবে তো ভাবা যায়! গ্লাসের অর্ধেকটা জল দেখে কি বলব? অর্ধেক শূন্য, না, অর্ধেক পূর্ণ? দেখার গুণে এই শূন্য-না-পূর্ণ তা ধরা পড়ে। তাই নয় কি? জীবনের যে-কোনও সময়েই অতীতের গভীর থেকে 'যদি' তুলে এনে এনে যদি কাঁদুনি গাইতে বসা যায় তাহলে গ্লাসের অর্ধেকটাকে বার বারই শূন্য দেখা হবে। 'যদি' গুলো যখন সামনে ছিল বিচার-বিবেচনা করে যাদের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে সেই সময়, সুযোগ, অবস্থা এবং উচিতানুচিত ভাবনায় দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, তখন বিকল্পের মধ্যে যেটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল সেইটিই যথার্থ ছিল, অন্যটি অযথার্থ। ফেলে দিয়ে, সরিয়ে রেখে এগিয়ে যাবার পরে তাকে নোতুন করে জীবন্ত করে শূন্যতার, গ্লানির আর অনুশোচনার কোনও কারণ অন্তত স্বাভাবিক নয়, দুর্বল মনের পলায়ন বলা যায় তাকে। আমরা সকলেই সারাজীবনে বহুবার পালাতে চেষ্টা করেছি, এখনও মাঝে মাঝে করে থাকি। কেন এই পলায়ন চেষ্টা? এক একটা সিদ্ধান্ত এক এক পর্বে আমাদের ঘাড়ে অনেক দায়-দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়। আর সেই বোঝা যখন যখন বিষম এবং ভীষণ ভারি বলে মনে হয় তখনই আমরা 'যদির' বিকল্পের গলিতে মুক্তি খুঁজি। বিপদে পড়লে লোকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কষ্টে আর যন্ত্রণায় ভগবানের নাম নেয়। এটা যেমন সত্যি ঠিক তেমনিই, সকলেই, বর্তমান নিয়ে জড়িয়ে পড়লে 'যদির' আড়াল খোঁজে। 'যদিরা' তাই মানসিক 'সিডেটিভ'। দুর্বল মনের ওষুধ।

সাদা চোখে সদর্থক দৃষ্টিতে সমস্যার দিকে তাকালে যদির ধার কমে যায়। পালাতে গেলেই সে তাড়া করে। অর্ধেক শূন্য দেখার দৃষ্টিকে অর্ধেক পূর্ণ দেখায় সরিয়ে নিলেই আর যদির মার খেতে হয় না। চোখটাকে আলোর দিকে স্থির রাখলেই অনেক দূরে দেখা যায়; অন্ধকার সবসময়েই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ভয়ের জনক। যদির নদীতে ডুবে গিয়ে হাবুডুবু না খেয়ে ঋজু শক্ত পায়ে বর্তমানের জমি দিয়ে সোজা সামনে হাঁটলেই গন্তব্য কাছে আসতে বাধ্য; 'সন্দেহ' 'যদি'র বেত্রাঘাতে আমাদের পদক্ষেপকে এলোমেলো করে দিতে সদাই সচেষ্ট। তাই সাধু সাবধান! তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ—সকলেই সাধু; বিশেষ করে বৃদ্ধরা, পড়ন্তবেলার অতীত-দৃষ্টি ভবিষ্যৎ-হীনরা সাবধান। তাদের মন এবং শরীর দুইই বেদনার আঘাতে আর বয়সের পীড়নে এমনিতেই শীর্ণ এবং কৃশ; সেখানে 'যদির' মার বিশেষ সইবে কি?

॥ পরিবার বৃত্তান্তঃ ॥

বিবরণ অর্থে নয়, বৃত্তের অন্তঃ অর্থে; অন্তর্বর্তী-অন্তঃপাতী তাৎপর্যে। প্রত্যেক পরিবার এক একটা বৃত্তের সীমার মধ্যে স্বাধীন। বৃহত্তর সমাজের সম্পর্কের আর কৃষ্টিয় মানসিক পরিবেশ-প্রেক্ষিতের মধ্যে এক একটি পরিবার এক একটি একক। একভাবে দেখলে প্রত্যেক পরিবারই কিছু সাধারণ গুণের অধিকারী; বিশিষ্টতা যা আছে তার বেশির ভাগটাই বিষয়গত (objective) নয়, বিষয়ীগত (subjective), নিজ নিজ পরিবার-অনুভবের ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট; এবং সেখানেই এদের অহং। গর্ব অথবা হীনমন্যতা, উচ্ছ্বাস অনুভব অথবা ক্লিষ্ট অস্তিত্ব।

পরিবারগুলো সংখ্যায়, বয়সের সংগঠনে, আর্থিক সংগতিতে, মাথা পিছু আয়ের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগে / পরাধীনতা-বোধে বিভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন হয় পূর্বপুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-সমৃদ্ধির (বা এগুলির অভাবের) কারণে। শিক্ষা চিন্তাভাবনা আর জীবন-দর্শনের প্রত্যক্ষ, অনুভব আর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার চেতনার প্রভেদে বৈচিত্র্যেও তারা বিভিন্ন।

এই সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও একেবারে জান্তব, ব্যবহারিক আর দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রকাশে সব পরিবারই এক। বাজার-ঘাট, পাকস্থলীর দাবি, প্রবৃত্তির টানাপোড়েন, স্বার্থের সংঘাত, কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-দ্বেষ, পয়সাকড়ির ন্যূনাধিক্য ভালবাসার পরিমাণগত (?) অনটন-প্রাচুর্য পক্ষপাত-অপক্ষপাত, এ মতো কতো শতো বিষয়-ব্যাপার নিয়ে যে দিনান্ত জীবন সেই জীবনে সব পরিবারই একইভাবে পীড়িত, ক্লিষ্ট, পর্যুদস্ত।

যে সব পরিবার এই সব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দৈনন্দিনতার মধ্যেও সবল দৃষ্টি, সতেজ ভাবনা আর সমৃদ্ধ চেতনাকে প্রবেশ করিয়ে দূরকে দেখতে পায়, অকারণ বেদনাকে পুড়িয়ে দিয়ে, ঈর্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আর সমগ্রতাকে আবিষ্কার করে নিতে পারে, সেই সব পরিবার স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে। অপরের ভাবনাকে, প্রত্যক্ষকে আর চেতনাকে যখন মূল্য দেওয়া হয় তখনই স্বাতন্ত্র্য আপনা আপনি স্থান পায়।

পরিবার বৃত্তের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি কেন্দ্র এবং সুতরাং ব্যক্তি বৃত্ত থাকতে

বাধ্য। পরিবারের কেন্দ্রে কখনও থাকেন কোনও ব্যক্তি কখনও কোনও দৃষ্টি, ইতিহাস বা বিশ্বাস। একে চেতনাও বলতে পারি। এই চেতনাটি সাধারণত পরিবারের প্রধানা মহিলাকে মাধ্যম করেই প্রকাশ পায়। যে সব পরিবারে এই কেন্দ্র-চেতনাটি পরিষ্কার নয়, ব্যক্তি মাধ্যমে প্রকাশ নয়, অথবা বিবশ-বিচ্ছিন্ন-সামঞ্জস্যহীন, সেই সব পরিবারের জন্যে সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত!

যে পরিবারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী সেখানে পরিবার বৃত্তের মধ্যে দুইটি মাত্র স্বতন্ত্র বৃত্ত। চেতনার কেন্দ্র বিন্দুটি মাধ্যমহীন হলে স্বামী এবং অথবা স্ত্রীর যৌথ ইতিহাস চারণায় ক্রমশ মূর্তি পেতে থাকে; অন্যথা নোতুন করে কেন্দ্র চেতনাটির বীজ বপন করা হয়; কিন্তু এই নব-উপ্ত চেতনাটির প্রকাশ কখনই অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে বেড়ে ওঠে না। পরিবার চেতনার মূল ধারাটি কখনই হারিয়ে যেতে পারে না; গোচরে-অগোচরে সে উত্তর জীবনকে প্রভাবিত করবেই। পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত হতে পারে, হয়েও থাকে। আবার এর বিপরীতও সম্ভব। নির্ভর করবে উত্তর পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা ভবিষ্যৎ-চেতনার উপর।

যে কোনও দুজন ব্যক্তির মধ্যে সর্ববিষয়েই একরূপতা অসম্ভব। এখানে মানসিক একরূপতার কথাই সবিশেষ বক্তব্য। কাছাকাছি হতে পারে, একাত্ম কখনই হবে না। চিন্তা, ভাবনা, অনুভব, প্রত্যক্ষ, উদ্দেশ্য, আদর্শ চাওয়া-পাওয়া ইচ্ছা-আবেগ অবশ্যই আলাদা আলাদা হবে। পরিবারস্থ বৃত্ত সমূহের, ব্যক্তিগণের, এই বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। স্বামী এবং স্ত্রী, পিতা এবং সন্তান, ভাই এবং বোন—যে ভাবেই এই বৃত্তস্থ ব্যক্তিগণের সম্পর্ককে আপেক্ষিক সংযোজন করা যাক তারা মূলত স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র বৃত্ত এবং স্বতন্ত্র কেন্দ্র-চেতনার প্রতীক। এই সব ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনরা যে পরিবার ক্ষেত্রটিতে নিজ নিজ orbit-এ অবস্থান-চলন-জীবন পরিচালনা করে তা অবশ্যই কেন্দ্রাতিগ নয়, কেন্দ্রমুখী। অন্যথা বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

বন্ধন শক্তিটি কি? আগেই বলেছি প্রধানত পরিবার-কেন্দ্রের চেতনাটি। বলেছি এই চেতনাটি কোনও ব্যক্তিকে মাধ্যম করে প্রকাশ পায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়। পূর্ব প্রজন্ম যখন দেওয়ালে স্থান নেয় তখন পরবর্তী প্রজন্ম বর্তিকাবাহী হয়ে মাধ্যমটি হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে; তাই কেন্দ্র চেতনার মাধ্যমটি শূন্য হয়ে গেলে বয়সের ওজর চলে না, প্রস্তুতিহীনতার যুক্তি খাটে না, হচ্ছে-হবের টালবাহানা পরিত্যক্ত হয়। দায়িত্ব নিতেই হয়;

না-নিলে সে ঘাড়ে এসে চেপে বসে। যোগ্যতা-অযোগ্যতা? প্রকৃতি বড় নিষ্করুণ প্রশাসক-শিক্ষক। যোগ্যকে সে অবশ্যই সম্মান দেবে, সাহায্য করবে, প্রশংসার্হ করে তুলবে; যে অযোগ্য বলে প্রতিভাত হবে সে বহু মূল্য দিয়ে অযোগ্যতার দায় বহন করবে। যোগ্যের জন্যে জমা থাকবে আনন্দের হাট আর মহৎ স্বীকৃতি; অযোগ্যের জন্যে জমা হয় চোখের জল আর অন্তরের অনুশোচনা। কোনওটাই তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘমেয়াদী; তাই যা কিছুই চকচক করে তা কিছুই সোনা নয়। যা কিছুই আপাত মধুর স্বার্থ দ্যোতক তা কিছুই ভবিষ্যের আরাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা প্রতি পদক্ষেপেই অপ্রস্তুত।

কেন্দ্র চেতনার গুরুত্ব সর্বাধিক বলেই এতো কথা বলা। সেখানেই তো বিস্ফোরণ এড়ানোর ফিউজটি। অন্যান্য বৃত্ত-কেন্দ্র-ব্যক্তিরাও সমান ভাবেই মূল্যবান; স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ এড়ানোর জন্যে যেমন, বৃহত্তর বৃত্তে 'টেনশন' কমানোর জন্যেও তেমনি। সকলেই যদি কেন্দ্রাতিগ গতিতে বিস্ফোরণমুখী প্রবণতা দেখায় তাহলে পরিবার বৃত্তটির অটুট থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকৃতিতেও যেমন মানুষের ক্ষেত্রেও তেমন স্ব স্ব শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে সঠিক পথে পরিচালনাই সৃষ্টিশীলতার দায়; বিপরীত হলে ধ্বংস। কিছুটা পরাধীনতা না মেনে নিলে কখনই স্বাধীনতা ভোগের বস্তু হয়ে ওঠে না। পেয় জলকে পাত্রের বা করপুটের সীমায় বেঁধে না নিলে যেমন তা পান করা যায় না। এ কথাটাই মানবিক প্রেক্ষিতে বলা হয়; ত্যাগ না করলে ভোগ করা যায় না। জীববিজ্ঞানী আর অভিব্যক্তিবাদীদের ভাষায় adjustment/adaptation. প্রতিযোজন।

'আমার প্রয়োজন নেই!'—এই ঘোষণা আমাদের ব্যক্তিজীবনে আর সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে আর দাম্পত্য জীবনে কতো শত বারই না ঘোষিত হয়েছে। বিবাহ ভাঙছে, গৃহ তছনছ হচ্ছে, সমাজ তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে আর ব্যক্তি শূন্যতায় ভুগছে। তবুও তো এই ঘোষণা সমানে উচ্চারিত হয়ে চলেছে: আমার প্রয়োজন নেই!

আচ্ছা, জীবনটা কি ইতিবাচক না নেতিবাচক? বাঁচার জন্যেই জীবন না মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে? ঘোষণাটি নেতিবাচক নয়? নেই নেই করে সবই তো নেই হয়ে যাবে? প্রত্যেক আমার মধ্যের আমিটা কি শুধুমাত্র অহংকে নিয়ে বাঁচতে পারবে? আমার জৈবিক সূত্রটি ধরে ধীরে ধীরে টানলে কি

অনেককে, বহুজনকে খুঁজে পাই না ? তাহলে ? এই প্রয়োজনীয়তার অহংকারটি কোথা থেকে শক্তির যোগান পায় ? ব্যক্তিগত অন্ধত্ব থেকে, egocentricity থেকে, অতীতের বিস্মৃতি থেকে আর ভবিষ্যতের দৃষ্টিহীনতা থেকে। এই প্রয়োজনহীনতার মানসিকতা থেকে আমরা গৃহ ছেড়ে flat-এ যাচ্ছি, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে tension-এ flat হয়ে পড়ছি, এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে pace-maker-এর দিকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছি। প্রয়োজনহীনতার ছুরি চালাতে চালাতে এক সময় কসাই-এর দোকানের মাংসের মতো নিঃশেষে মুছে যেতে বসি ! ঘোষণাটি হওয়া উচিত ঃ প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে।

এই প্রয়োজন বোধকে কাটছাঁট করে সীমার মধ্যে, সুপেয় করে অঞ্জলি ভরে পান করার মধ্যেই প্রাণের পুষ্টি, মনের আনন্দ আর পরিবারের শ্রী। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সত্যটি দেখা দরকার, নিজের কেন্দ্রটি থেকে বৃত্তান্তঃ পর্যন্ত অস্তিত্বে যেন শুধু অহংই সাম্রাজ্য না করে তা প্রত্যেকেরই দেখা দরকার। যদি পরিবার বৃত্তে অন্ধের সংখ্যা বেড়ে যায় তা হলে কেন্দ্র-চেতনা-প্রতিভূ পরিবার মহিলাটির দায় অনেক বেড়ে যায়। সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে আলোদানেই তখন আর লক্ষ্মী তৃপ্ত হবেন না ; অন্ধজনেও আলো দান তার আশু কর্তব্য হয়ে উঠবে !

প্রত্যেক পরিবারেই স্ব স্ব সময়ে হেমলতারা এই কেন্দ্র-চেতনার দায় বহন ক'রে পরবর্তী প্রজন্মে নারায়ণীদের হাতে চেতনার প্রদীপখানি হস্তান্তরিত করে যান। আর যখন হস্তান্তর সম্ভব হয় না, ব্যক্তি আলোই চিরবিদায় নিয়ে ফেলেন, তখন পরবর্তী প্রজন্মের গৃহলক্ষ্মীদের নিজ হাতে তুলে নিতে হয় সেই কেন্দ্র চেতনার প্রদীপখানি। যদি এবং যখন এই প্রদীপ-বাহকদের অভাব ঘটে, তাহলে এবং তখন, দুর্দিনের কাসরঘণ্টা শ্মশানের ধ্বনি হয়ে বেজে ওঠে, মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি হয়ে চারিধার, বৃত্তের পরিধিকে, অনুরণিত করে না।

ভিড়ের মধ্যে মানুষ হারিয়ে যায় ; এক দল লোক অকারণেই জড়ো হয়ে রাস্তার মোড়ে, রেলের প্লাটফর্মে ভিড় তৈরি করে। গোষ্ঠী হতে গেলে তাদের মধ্যে, মানুষ জনের মধ্যে, একটি মানসিক সূত্রের বা বন্ধনের প্রয়োজন হয়। এইটিই বন্ধন, বন্ধনসূত্র, কেন্দ্র-চেতনা। একই সূত্রে যখন বাঁধা পড়ে সহস্র বা ক'একজন ব্যক্তি, তখনই তা সমাজ, সমিতি, দেশ বা পরিবার। আর তখনই ব্যক্তি তার নিজের স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজে পায়। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে তখন সে পায় মুক্তি ; এই মুক্তি তার নিজের অস্তিত্বের জন্যেই দরকার। প্রত্যেকেরই। বিশ্বপ্রকৃতিতে মহাকর্ষসূত্র, সৌরজগতে মাধ্যাকর্ষণ।

জীবজগতে উত্তরপুরুষের মধ্যে অস্তিত্বের অন্বেষণ, মানুষের ক্ষেত্রে অপরাপরের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপভোগ। সজলতার সম্পর্কহীন বালুকণারা শুষ্ক মরুভূমি তৈরি করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য হারিয়ে যায়। নদী বক্ষে সজল সম্পর্কের চরাভূমিতে তারা প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে সার্থক হয়। ক'এক জনের 'সজল' সম্পর্কে আমরা পরিবার; অনেকে মিলেই সমাজ। সম্পর্কের স্বীকৃতিতে তার জীবনের স্বীকৃতি; অস্বীকারে অস্বীকার। স্ববিরোধ ঘটে। সকলকেই যদি বাদ দিতে হয়, অপ্রয়োজনীয় বলে, তাহলে একদিন, আগেই বলেছি, নিজেকেই বাদ দেবার সময় এসে যায়। তাই স্ববিরোধ।

প্রাণিজগতে এই স্ববিরোধ নেই। সেখানে বেঁচে থাকাটার অর্থ পাকস্থলীকে পুষ্ট রাখা। মানুষের ক্ষেত্রে পাকস্থলীই তো একমাত্র সত্য নয়!

পরিবার বৃত্তের মধ্যস্থ ব্যক্তি বৃত্তরা একই সঙ্গে প্রাণী এবং মানুষ। তারা তাই একই সঙ্গে একাধিক সত্যের অনুসন্ধানী। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সত্য-মিথ্যা, সঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিতের টানা পোড়েনে রক্ত মাংসের মানুষ। ভুল করার অধিকার প্রত্যেকের আছে; আছে ভুলকে শুধরিয়ে নেবার ক্ষমতা এবং অধিকারও। পরিবার কোনও কাঁচা-পাকা ফল নয় যে পচন ধরলে আর রক্ষা করা যাবে না; পরিবার একটা becoming, একটা evolution-এর নাম। একটা concept যা মানুষের জীবনেই সত্যি, কারণ মানুষ এই concept, এই becoming-এর মধ্যেই নিজের মুক্তি, নিজের স্বাধীনতাকে খুঁজে নিতে চায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর হয়ে এই চলনই অভিব্যক্তি।

পরিবারের অপর নাম সংহতি। ব্যক্তির বৃত্তাভিগ দৃষ্টি না থাকলে এই সংহতি সম্ভব নয়। একের সঙ্গে অপরের সঙ্গতিই হল সংহতির ভিত্তি। বৃত্তের সঙ্গে অন্য বৃত্তের। স্বামী-বৃত্ত, স্ত্রী-বৃত্ত, সন্তান-বৃত্ত; পরিবার বহু বৃত্তের সমাহার। সম্পর্কদ্বারা যেমন বৃত্তগুলোকে সূচিত করা যায়, তেমনি নামেও তারা বিবরণযোগ্য। নাম একটি বিচ্ছিন্নতার, একটা ব্যষ্টির চিহ্নমাত্র। নামে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ নয়, অহংমাত্র। সম্পর্কেই সে সত্য। সত্য এই জন্যে যে তখন সে Universal, সে অহং-উর্ধ্ব। এই সম্পর্কগুলো চিরায়ত, চলমান। আজকের সন্তান কালকের পিতা-মাতা; আজকের স্ত্রী কালকের কন্যা-মাতা। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী তাই পরিবার বৃত্তমধ্যস্থ সম্পর্ক-দ্যোতক স্বতন্ত্র বৃত্ত-সম্পর্ক। বন্ধন-সূত্রটিও এখানেই অন্তঃস্যূত।

যৌথ পরিবারের কথা হচ্ছে না, 'যূথবদ্ধ' পরিবারের কথা হচ্ছে। একই

পরিবারের মধ্যে যখন একাধিক পরিবার নিবদ্ধ অথবা সন্ধিবদ্ধ থাকে তাকেই বলি যৌথ পরিবার। এই অর্থে জীবিত মা-বাবার পরিবারে তাঁদেরই পুত্রের পরিবার যৌক্তিক বিচারে যূথবদ্ধ পরিবার। এই অবস্থা আমরা ইউরোপীয় সমাজে দেখতে পাই না। পুত্র-কন্যারা বড় হয়ে বিবাহোত্তর জীবনে স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করে নিজেদের মা-বাবার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে 'একক পরিবার' হয়ে স্থিতি পায়। বাস্তব-বিচারে এটাই একক পরিবারের গঠন। এই পরিবারের বৃত্তাভিগ দৃষ্টি থাকে না বলে, shock absorber বা fuse থাকে না বলে, বিচ্ছেদ এতো বেশি। আমাদের দেশে আপনজনদের নিয়ে 'একক পরিবার'। তাই পুত্রের বিবাহোত্তর পারিবারিক জীবনেও মা-বাবার পরিবার ত্যাজ্য নয়। অতীত পরিবারের মাতৃদুগ্ধ সেবনে বর্তমান পরিবার প্রাণ পেতে থাকে। মা-বাবার পরিবার বৃত্তটি ব্যাপক বৃহৎ পরিসর পেয়ে এবং দিয়ে নবোদ্ভিন্ন পুত্র-পুত্রবধূর পরিবারটিকে লালন করে, পালন করে, গড়ে তোলে। অনেক ত্যাগ, সহ্য আর কোমলতা দিয়ে কেন্দ্র-চেতনার প্রদীপখানি উপযুক্ত সময়ে যোগ্য হাতে সমর্পণ করে, নিঃস্ব নয়, পূর্ণ হতে চায়। ধারাবাহিক হতে চায়।

পরিবার থেকে পরিবারের এই যে জন্ম, এটিও স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক হতে পারে। সন্তানের জন্ম দিতে যেমন প্রকৃতি নির্ধারিত সময় এবং অবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়, pre mature হলেও যেমন ক্ষতির কারণ post-mature হলেও তেমনি ভয়ের কারণ হয়। প্রস্তুতি, অপেক্ষা আর ধৈর্য তাই অনিবার্যভাবেই প্রধান কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী।

কিন্তু প্রত্যেক পরিবার বৃত্তের মধ্যেই যে ব্যক্তিবৃত্তগুলি আছে তাদের গুণ-পরিমাণ এক নয়। পুরুষ-নারী ভেদ আছে এবং সেই জন্যে ব্যক্তিত্ব আর মানসিকতার বিভেদ আছে। আছে অর্থনৈতিক বিভেদ, বয়সের তারতম্য জনিত প্রভৃত বিভিন্নতা। পুরুষ-প্রধান সমাজে দাপটের সিংহভাগ অধিকার করে থাকে পুরুষরা আর গৃহরক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করে চলে মেয়েরা, স্ত্রীরা। কাঠিন্য ছেলেদের প্রধান হাতিয়ার, কোমলতা মেয়েদের। রুদ্র-শক্তি প্রাণের শক্তিকে মুক্ত করে, কিন্তু কোমল স্নেহ-শক্তি পরিবারকে সংহত করে। সুযোগ পেলেই পুরুষ আঘাত করে, তাই তার ঝোঁক ভাঙার দিকেই; সময় পেলেই নারী প্রলেপ দেয়, সংহত করে, তাই তার প্রকৃতি গড়ার দিকে। প্রকৃতি নির্ধারিত এই দ্বিবিধ শক্তির positive-negative টানাপোড়েনের মাঝখানে পরিবারের কেন্দ্র-চেতনার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখার পূর্ণদায় গৃহকর্ত্রীর। এটা তার in-addition

দায়ভার।

যে পরিবারে এই in-addition দায়ভার বহনকারী মহিলাটি নেই সেই পরিবার-বাগানে ফুল ফোটে না, পাখি গায় না, বাতাস হিন্দোল আনে না। সেই মরুভূমিতে ব্যক্তিগণ শুষ্ক বালুকণা মাত্র, সবুজ চরা নয়। আজ যদি তা দেখতে না পাওয়াও যায় তা হলেও সেই ভবিষ্যৎ অসত্য হয়ে যায় না। পাথরের কুচিসমূহের মধ্যে যে ব্যক্তি cement-এর সংগঠক শক্তিকে দেখতে পায়, সে-ই architect; ফুল সম্ভারের মধ্যে যে সুতোর বন্ধনকে সত্য করে তোলে সে-ই মালিনী, পরিবারের ব্যষ্টির মধ্যে যে কেন্দ্র-চেতনার সূত্রটিকে দেখতে-দেখাতে পারে সেই তো গৃহিনী।

দ্বৈত জীবনই দ্যুতিময় জীবন নয়। দ্বিত্ব ভেঙ্গে গিয়ে একাকিত্বের বিবর্ণ দ্বীপত্বে পর্যবসিত হতে পারে। পারে যে তার বহু প্রমাণ আধুনিক সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্যুতিময় জীবনের আলোকোজ্জ্বল বিচ্ছুরণটি নিঃশেষিত হবার নয়। সে তো পাথরকণার মতো ছড়িয়ে যাবার বিষয় নয়, কেন্দ্রচেতনার প্রাণদায়িনী শক্তির বহমানতা থেকে সে তার দ্যুতির প্রকাশকে সত্য করে পায়। অপরকে আলোকিত, প্রভাবিত, প্রকাশিত করার শক্তি তার নিজের প্রকৃতির মধ্য থেকেই সে খুঁজে পায়। নিজে যেমন আলোকিত হয়, প্রকৃত গৃহিনী তেমনি অপরকেও আলো দান করে। এই in-addition কাজটুকু যদি না-ই করা হল তাহলে আজ-বা-কাল অন্ধকার অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

নিজের ছায়াটুকুর মধ্যেই যাদের জগৎ সীমাবদ্ধ তাদের দৃষ্টিকে প্রশংসা করা যায় না। নিজের বৃত্তটিই একমাত্র সত্য এই প্রত্যয় যাদের জীবনকে চালিত করে তাদের তেমনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলা যায় না।

কিছু কিছু লেখা কপালে পড়ে, কিছু দেওয়ালে। সে সব শ্লেট-পেন্সিলের, কাগজে-কলমের লেখা নয়। তাই সহজ নয় সে সবকে যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে দেখতে পাওয়া। যারা দেখতে পায় তাদের দৃষ্টিকে বাহবা দিতে পারি; যারা পায় না তাদের জন্যে দুঃখ করা চলে মাত্র।

বার্ধক্য কোনও ব্যাধি নয়; বার্ধক্য একটা বয়সের নাম। একটা অবস্থানের সূচক। এই অবস্থানটি প্রস্থানের জন্য প্রস্তুতির সময়। এই সময়ে অতীতের যাবতীয় অর্জিত সম্ভার চিহ্নিতকরণ আর নাড়াচাড়া করে দেখার সময়। আর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অনাগত সম্ভারের জন্যে অপেক্ষা করার সময়। বার্ধক্য কর্মমুখর নয়, নোতুন করে উদ্যোগ গ্রহণের সময় নয়। এই সময়ে একদিকে জীবনের

খাতায় debit-credit-এর final posting-এর সময়। অন্যদিকে যারা জীবনের দীর্ঘপথে পদচারণার জন্য সর্বপ্রযত্নে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের জন্যে আশীর্বাদের প্রস্রবন মুখটি খুলে ধরার সময়।

জীবনবৃত্তের পরিধির কাছাকাছি এসে যাঁরা পরিবার বৃত্তের পরিবৃত্তে অবস্থান করেন তাঁরা উন্মুখ হয়ে বৃত্ত কেন্দ্রটির দীপশিখাটিকে প্রোজ্জ্বল দেখতে চান। সুখের আর শান্তির প্রবাহটি যদি কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পরিবার-সমগ্রের দিকে চলাচল করে তাহলে বৃত্তাতিগ উৎক্ষেপণের মুখেও আনন্দের অবসরটি এঁরা উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাগ অপরাহ্ন জীবন ভাঙ্গা-কুলোর চরিত্রে অভিনয় করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। অথবা family punching bag হয়ে ঝুলতে থাকে। অধিকতর শক্তিশালী জীবনের মদিরা সেবনে উত্তেজিত কেন্দ্রিক ব্যক্তি-বৃত্তেরা পরস্পরের প্রতি তাদের অসূয়া, ঈর্ষা, কাতরতা সীমাহীন ঢেলে দেয় সেই ঝুলন্ত punching ব্যাগের সর্বংসহা অসহায় দেহে। এই সব বৃদ্ধেরা যেহেতু নির্জীব জড় পদার্থ নয়, জীবন্ত, সচেতন, কিন্তু বিগত-দিন, ইতিহাসের প্রান্তদেশ মাত্র, তাই এঁদের করার কিছুই থাকে না, একমাত্র সব দোষের দায়ভাগ গ্রহণ করে বেঁচে থাকা ছাড়া। এরা ভাঙ্গা কুলোই নয়, ধাপার মাঠ হয়েও পরিবারের আবর্জনাস্তূপের সংগ্রহ-রক্ষণ-ভাণ্ডার বলে পরিগণিত হয়ে ওঠেন। ঢেউ-এর পর ঢেউ হয়ে এরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে একইভাবে বৃত্ত-অন্তে পেঁছোন; বার্ধক্য নিয়ে কেউ জন্মায় না; পিতার বৃত্তাতিগ উৎক্ষেপণের এক পুরুষ পরে আছে এখন-পুত্র-তখন-পিতার পালা। চলে, চলছে, চলবে!

কিন্তু যে সব পরিবারে পরিবারবৃত্ত-কেন্দ্রটি সক্ষম হস্তে প্রদীপ-আলোকিত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে যেসব গৃহলক্ষ্মীরা আলো জেলে রাখে, নিভে যেতে দেয় না, যেখানে ব্যক্তি-বৃত্ত উত্তরণ করে এক বা একাধিক ব্যক্তি-বৃত্ত তাদের জীবনের যাথার্থ্য খোঁজে, সেখানে ঘটনা অন্যরকম হতে বাধ্য। পরিবার থেকে হারিয়ে যাবার আগে দ্বিতীয় শৈশবে পেঁছে বৃদ্ধেরা নোতুন করে মাতৃলাভ করেন, পরিজনেরা নিকটজনেরা সান্নিধ্য পেয়ে সহজ হয়, আপন জনেরা স্নেহের কোমল মাধুর্যে শুদ্ধস্নাত হয়।

এই পাওয়াটা অবশ্যই সকলে মিলে পাওয়া; সকলের অবদানে পুষ্ট, সমৃদ্ধ এবং সহজ হবার কথা। গ্রথিত মালায় ফুলের চাইতে সুতোর অবদান বেশি নয়কি? মালার সৌন্দর্য অবশ্যই স্বতন্ত্র, ফুলের সৌন্দর্যে এবং সমন্বয়ের

মাধুর্যে।

প্রত্যেক ফুলই ফুল হিসেবে কিছুটা সুন্দরের প্রতীক। প্রত্যেক ব্যক্তিই তেমনি কিছু না কিছু redeeming feature-এর প্রকাশ। সুন্দরের আধার। পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যক্তির মধ্যে saint বা satan-কে বাইরে টেনে আনে। কেউ শুধুমাত্র অন্ধকার, কালো, খারাপ এটা কোনও মতেই মানুষ বিষয়ে সত্য নয়। ভাল-মন্দ মিলিয়েই আমরা সকলে।

বহু ভাল মন্দ, বুদ্ধিজ-প্রবৃত্তিজ, আবেগ-আকাঙ্ক্ষার গুণাবলী নিয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তি-বৃত্ত। এদের সমন্বয়ে যে সমগ্র পরিবার-বৃত্ত সেখানেও তাই বহু-গুণের সমাহার। Store room, Library. শিক্ষকের কাজ যেমন ছাত্রের মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধি অনুভব অভিজ্ঞতার অনুশীলন, পরিশীলন আর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোতে, তেমনিই গৃহকর্ত্রীর কাজ পরিবার-জনেদের মধ্যেকার ভালগুলোকে বাইরে আনা, manifest করা, বাস্তব করা।

সরকারের যেমন administration পরিবারেরও তেমনি administration আছে। তাই সব বিষয়েই খোলামেলা হওয়া good administration-এর সম্ভব নয়। সকলকে সব জানতেই হবে, জানাতেই হবে এমন কথা নেই। Oath taking-এর প্রয়োজনও আছে ; আছে secrecy রক্ষা এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে tact-এর প্রয়োজন। Intelligent tackling, tactful dealing, diplomacy ; এসব ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র থেকে বৃহত্তম ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি এককই এক একটি জটিল অস্তিত্ব ; ব্যক্তি যেমন জটিল, (নিজের কাছে এবং অপরের কাছেও) তেমনি ব্যক্তি-সমন্বয়ে গঠিত যে কোনও দলই, এককই ক্রমশ বেশি জটিল হতে বাধ্য। পরিবার একটি দল বা একক। সমিতি, সঙ্ঘ, সংস্থা, সমাজ—সবই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত দল বিশেষ। বহুজনের অত্যন্ত জটিল মানসিক সংগ্রহ নিয়ে যেখানেই কাজ হোক না কেন সেখানেই দায়-দায়িত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা থাকবে ; থাকবে কেন্দ্র-ব্যক্তিত্ব এবং পরিচালনা। এবং সুতরাং উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যের জন্য পথ ও পন্থা নির্ণয়।

তাছাড়া সব কি আর আমরা নিজেরাই জানি ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো অনুমান করি। অনুমান দিয়ে অপরকে প্রভাবিত করা কখনও উদ্দেশ্যের জন্যে প্রয়োজন, কখনও প্রভাবিত না করাটাই প্রয়োজন। এবং গোপনীয়তা। জীবনকে যে বই-এর সঙ্গে তুলনা করা হয় সে নেতিবাচক দিকটাকে তুলে ধরার জন্যেই ; জীবন কি খোলা বই ? ইচ্ছে করলেই কি পড়ে ফেলা যায় ?

উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে কোনও পথই প্রশস্ত নয়। ঠিকই। কিন্তু গোপনীয়তা—পূর্ণ বা আংশিক—কোনও অন্যায় কাজ বা পথ নয়। সব কথা সকলের জন্যে নয়; সব কাজও নয় সকলের জন্যে করণীয়। তাই সকলকে সব জানতে বা শুনতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। এই নীতির উল্লঙ্ঘন করা হলে হিতের বদলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। তাহলে?

তাহলে কি আপনজনকে Confidence-এ নেবো না? তা কেন? অবশ্যই নিতে হবে। যেখানে জ্ঞাত-তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে সাহায্য নিতেও হবে এবং পেতেও হবে সেখানে অবশ্যই Confidence-এ নিতে হবে। কিন্তু যদি স্থির করা হয় যে কোনও সৎ উদ্দেশ্যে কোনও ক্রমশ প্রকাশ্য কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার এবং যদি জানা থাকে যে সেই সৎ প্রচেষ্টায়, উত্তেজিত মানসিকতার জন্যে বা অন্য কোনও কারণে, প্রথম থেকেই বাধা আসবে তাহলে সেই উদ্দেশ্যটি অপ্রকাশ রেখে ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করাটাই কি করণীয় নয়? এটাকেই গোপনীয়তা বলেছি; লুকোনোকে নয়, অপ্রকাশ রাখাটাকেই secrecy বলেছি। কিন্তু উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ হতে হবে। অন্যথা অ-ন্যায়ের দায় বহন করতে হবে। নৈতিক দৃষ্টিতে একেই বলে fittingness. যেমন মৃতপ্রায় পুত্রের বিষয়ে ডাক্তার মা'এর কাছে মিথ্যা বলবেন; এই মিথ্যাটা অ-ন্যায় নয়, অ-নৈতিক নয়, fitting মাত্র। নৈতিক কাজের বিচারের সময় value, objectivity, obligatoriness এবং fittigness বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচিত হয়। আমরা এখানে যে secrecy বা গোপনীয়তার কথা বলেছি তার অবশ্যই এই চতুর্বিধ উপাদান থাকতে হবে, বিশেষ করে fittigness.

এটা না করলেই বরং tactless হবে। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ সৃষ্টি হবে, কথা কাটাকাটি হবে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে মাত্র।

ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। আমিও না, তুমিও না, সেও না। তাই আমাদের সব বর্তমান পদক্ষেপগুলোই ভবিষ্যতকে তৈরি করে। টেনে আনে। আনন্দের হলে অবগাহন করি; দুঃখের হলে ডুবে মরি। কে মরতে চায়? কাব্যে শ্যাম-সমান হলেও পরিবার বৃত্তে অবশ্যই নয়।

॥ বন্ধু ॥

যতোই ভাবি যে আর ভাবব না ততই যেন ভাবনা পিছু ছাড়তে চায় না। যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণই শরৎ কালের ভাসা ভাসা মেঘের মতো চিন্তা-ভাবনাগুলো মনের আকাশ দখল করে বসে থাকে। ওদেরও যেন অলস অবসর, নীলের পটে থমকে থাকে। ওদের কোন কাজই নেই, অকাজেও ওদের মতি নেই; যেন কোথাও যাবারও নেই, তাই কোন তাড়াও নেই।

নিজের মনের ভাবনাগুলোকে নিয়ে আমারও হয়েছে জ্বালা। ঠায় ভেসে থাকে, মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওরা যেন কথা বলতে চায়, যেন ওদের অনেক কথা জমা হয়ে আছে কিন্তু প্রকাশের জন্যে, সঞ্চার করে দেবার মতো কোনও মনের দেখা পায় না। ওরা অনেক; কিন্তু প্রত্যেকেই যেন একা, একেবারেই একা। ওদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অতীত আছে, অনুভবের বিশিষ্ট জগৎ আছে, অভিজ্ঞতার সুপরিসর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আছে, আর আছে অনুপুঙ্খ ভাবনার রাশি রাশি সম্পদ। ওরা একে অপরের বন্ধু হতে পারেনা, বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে ওরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্তিত্বের জলভার ধরণীর বুকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দিয়ে রিক্ত-শূন্য আলস্যে সময় কাটাচ্ছে।

আমরাও তো ওদের মতোই নিজ নিজ জীবনের প্রাণ সম্পদ, শক্তিসম্ভার আর কর্মময় অতীতকে সংসারের সব কাজে নিঃশেষ করে দিয়ে শেষ বয়সের আকাশ প্রান্তে ভেসে বেড়াচ্ছি। মাধ্যাকর্ষণের টান নেই, সংসারের আকর্ষণ নেই এবং বন্ধুত্বও নেই। বন্ধুদের আমরা আকাঙ্ক্ষা করি কিন্তু সংগ্রহ করার মতো যোগ্যতাটুকু কখন যেন হারিয়ে ফেলি। বাল্যে-শৈশবে অহেতুক বন্ধুত্বের টানে আমরা অসংখ্য বন্ধু সংগ্রহ করি, করতে পারি। তখন মন থাকে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরাট, খেলার আনন্দে মন থাকে সদাই উন্মুখ। কৈশোরেও আমাদের বন্ধু সংগ্রহে ভাটা পড়ে না। সংসারের প্রিয়জন, প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনজন, বিদ্যালয়ের খেলার সাথী, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে থাকে মনের মানুষ, বন্ধু! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-কর্মজীবনে নোতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে নোতুন নোতুন বন্ধুর সমাগম ঘটে, পর্বে পর্বে জীবনের বিস্ময়-মুহূর্তগুলো নব-নব মনের সংযোগ ঘটিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে থাকে। বন্ধুর সঙ্গে

সময় কাটাই, মনের ভাবের বিনিময় করি, হৃদয়ের তাপকে ভাগ করে উপলব্ধি করি। গতি-শক্তি আর তাপ, জীবনে জীবন যোগ করার জন্যে যা অনিবার্য, তা প্রভূত পরিমাণেই জমা হয়, জমা থাকে বলেই বন্ধুভাগ্য সহজ এবং সাবলীল হয়ে দেখা দেয়।

ছোট বেলা থেকেই জীবনের দরজা জানালাগুলো একে একে খুলে যেতে থাকে। সেই খোলা পথে প্রাণের আলো বাতাস যেমন সহজেই বাইরে যেতে পারে তেমনি সহজেই বাইরের আলো বাতাস ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পায়। যোগাযোগ ঘটে, যোগাযোগ বাড়ে। মিত্রতা ঘটে, বন্ধুত্ব সহজ হয়। চিন্তার মিল, অনুভবের মিল, জীবনের ক্ষেত্র-কর্ম সংগ্রাম সংঘর্ষ সমস্যা-জটিলতা, দুঃখ-কষ্ট আনন্দ-উল্লাস সব যেন অজান্তেই একে-অপরের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধটিকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলে। প্রয়োজনবোধ, স্বার্থ-চিন্তা হৃদয়াবেগ, নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা—এসবও মানুষকে মানুষের কাছে এনে দেয়। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি – এই চেতনা সজীব থাকলে বন্ধুভাগ্যে টান পড়ে না। টান পড়ে না, কিন্তু হারানোর বেদনা বাড়ে। প্রত্যেক জীবনই তো দীর্ঘ পথপরিক্রমা। মোড়ে মোড়ে সরে সরে যাওয়া, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে চলে যাওয়া। অতীতের জীবন যখন আমরা পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাই তখন সেই ফেলে আসা অতীতের মধ্যে আমাদের অনেক বন্ধুকেও ফেলে ফেলে যাই। এটাই হারানো। হারানো কিন্তু নোতুন বন্ধু সংগ্রহও তো হতে থাকে। এই যোগ বিয়োগের প্রক্রিয়ায় বন্ধুসংখ্যার অবনতি ঘটে। সংসারের পীড়ন যে পরিমাণ বাড়তে থাকে সেই পরিমাণেই আমাদের বন্ধুর আকাশ সংক্ষেপিত হতে থাকে। তরুণ বয়সে আর যৌবন কালে আমাদের হারানো আর প্রাপ্তির হিসেবে বড় একটা গড়মিল হয় না। কারণ মন সেখানে পীড়নে ক্লিষ্ট নয়, প্রাণের শক্তিতে উজ্জ্বল থাকে। প্রৌঢ়ত্বের এবং উত্তর-পৌঢ়ত্বে আমরা সংসার-চক্র পিষ্ট খণ্ডিত-ক্লিষ্ট মন নিয়ে বাইরের জগতটিকে ক্রমশই যেন হারিয়ে ফেলতে থাকি। আনন্দের সুপরিসর আকাশটাকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে নিজেদের ক্ষুদ্র ছিন্ন গণ্ডিবদ্ধ অস্তিত্বের সীমায় বেঁধে ফেলি। বিরক্তি আর ঈর্ষার অসচ্ছতা—চোখের ছানির মতো—মনের দৃষ্টিকেও যেন অস্পষ্ট-অবসন্ন করে তুলতে থাকে। আশায় আশায় দিন গোনার আনন্দের বাতাবরণটি তলিয়ে যায়, যা-পেলাম আর যা-পেলাম-না-র হিসেবের স্তূপের নিচে। সহপাঠী, সহখেলোয়াড়, সহকর্মীদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব সহ-পর্বে ছিল স্বাভাবিক, জীবনের গতিপথে বিভিন্ন সামাজিক মানসিক উত্তরণের

পর্ব-বিচ্ছেদের বাস্তবতায় সেই বন্ধুত্বই বেদনার, কখনও যন্ত্রণার কখনও ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দেয়। 'সহ' এবং 'সম' বোধ ক্রমশই মার খেতে খেতে ব্যক্তি জীবনে বেদনা, বিতৃষ্ণা আর উত্তেজনার জন্ম দেয়। বন্ধুত্বকে ধরে রাখা যায় না ; মানসিক চাপ, সামাজিক বিভেদ, রুক্ষমনের তীব্র জ্বালা, সংসারের পীড়ন—সব মিলিয়ে শুধুই হারাই, হারাতেই থাকি।

এই হারাতে হারাতেই একটা এমন ব্যক্তি মানস গড়ে ওঠে যা আর নোতুন করে বন্ধু সংগ্রহে অক্ষম হয়ে পড়ে। একটু অনড়ত্ব, জাড্য কিছুটা সন্দেহদৃষ্টি, যেন বয়স্ক মনকে ক্ষুদ্র-শীর্ণ-ক্লান্ত করে রাখে। অতীতে বর্তমানকে নিয়েই আমরা আমাদের তরুণ-যুবক বন্ধুকে কাছে টেনে নিতে পেরেছি। বন্ধুর কাছে বন্ধুত্বই কাম্য ছিল ; তার অতীত বিষয়ে অকারণ অনুসন্ধিৎসা আমাদের তাড়া করে ফেরে নি। আর এই এখন ? ব্যক্তির বর্তমান নয়, তার অতীতের অনুসন্ধানে আমরা প্রথমেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তার শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান-ধারণা জীবন যাপন পদ্ধতি এবং আরও কতো কীই না আমাদের মনে স্বতঃই জাগরিত হয়ে হুঁশিয়ার করে তোলে। এখন তাই আমরা জীবনের হাতে মার খেয়ে খেয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত, হুঁশিয়ার। আর তখন ছিল একটা বেহিসেবী প্রাণচাঞ্চল্য যা সব কিছুকেই নির্দ্বিধায় আত্মসাৎ করে নিতে পারতো। এখন দ্বিধা, দুশ্চিন্তা, স্বার্থান্বেষণ আমাদের পথের বাধা। আমরা সকলেই 'হার্ড-নাট' !

বৃদ্ধদের বন্ধু জোটে না ! জুটবে কেমন করে ? তাঁরা যে সব ব্যাপারেই অভিজ্ঞতার লাল খেরোর খাতা খানা মনে মনে সামনে তুলে ধরেন, হিসেব-নিকেশ করে বুঝে নিতে চেষ্টা করেন ; আর এই করতে গিয়ে আর যাই হোক বন্ধুত্ব হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সকল বৃদ্ধই প্রায় নিজ নিজ জ্ঞানের সার্বিক সত্যে, অভিজ্ঞতার অনপনেয় নিশ্চয়তায় এবং বিশ্বাসের পাথর-কঠিন দৃঢ়তায় এক একটি দরজা-জানালাহীন অচলায়তনের একাকী বাসিন্দা ! গ্রহণের জন্যে—অপরের মতামত বা বিশ্বাস গ্রহণের বা বিবেচনার জন্যে—তাঁদের কোনও মনের তন্ত্রীই ঝংকৃত হয় না। তাই বৃদ্ধরা পাথরের টুকরোর মতো কাছাকাছি বসে থাকতে পারেন, পাশাপাশি সময় কাটাতে পারেন ; কিন্তু কখনও একে অপরের জন্যে মনের দ্বার খুলে দিতে পারেন না। গঙ্গার ধারে বা বটতলার ছায়ায় তাঁরা দলবদ্ধ সময় কাটাতে পারেন, বন্ধুত্ব কখনই হতে পারে না। যেটুকু নৈকট্য তাও সেই হিসেবের অঙ্কের নিয়মে ; কে এলো এবং কে গেল !

তিননম্বরে বলা যায় যে বৃদ্ধরা যখন কথা বলেন তখন তাঁরা বলতেই থাকেন।

শোনার মতো মন বা ধৈর্য তাঁদের হয় না। আর তাঁরা নিজের কথা যদি শতখানা করে বলেন তাহলে সংসারের পুত্র-কন্যা-বধূ-স্ত্রীদের কথা সহস্রখানা করে বলতে ভালবাসেন। সকলেই যদি বক্তা, বলার জন্যে গলা বাড়িয়েই থাকেন, তাহলে শ্রোতা কোথায়? বিরক্তি, সমালোচনা আর পরনিন্দা পরচর্চাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অথচ দেখুন বৃদ্ধরা যুবক বা তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন! সমবয়সীর সঙ্গে নয়, বিষমবয়সীর সঙ্গে এই বন্ধুত্ব প্রবণতার কারণ? একদিকে থাকে সমীহ, সহানুভূতি এবং সম্মানদানের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দায়, অন্যদিকে, বৃদ্ধদের তরফে, থাকে অতীত-অবগাহন স্পৃহা, অতীতের দীপ্ত স্মৃতির তাপে বর্তমানকে একটু সজীব বলে অনুভব করার প্রবণতা। এ-ছাড়াও থাকে 'আমাদের সময়ে,' 'আমরা যখন যুবক ছিলাম'—ইত্যাদি অহং কেন্দ্রিক আত্মরমণের তৃপ্তি, জ্ঞান দেবার বাসনা। তাই এই অসম বন্ধুত্বের ক্ষীণ-সূত্রটির ছেঁড়া বা না-ছেঁড়ার দায় সম্পূর্ণতই বৃদ্ধদের ঘাড়ে থাকার কথা; পরিমিতি বোধই একমাত্র এই সরু সুতোর বন্ধনকে বাঁচাতে পারে। দুঃখের বিষয় আমরা, বৃদ্ধরা, বেশির ভাগ সময়েই এই পরিমিতি বোধ ধরে রাখতে পারিনা! তাই প্রায়ই কান তীক্ষ্ন রাখলে শোনা যাবে: ঐ রে, সেই বুড়ো! ধরে ধরে জ্ঞান দেবেন আর পুরোনা দিনের কাহিনী শোনাবেন!'

এই সব সচেতন মনের তাজা ছেলেদের সঙ্গে তাই দ্বিপদী-ত্রিপদীর বেশি অগ্রসর না হওয়াই উভয়ত সমীচীন। অন্যদিকে অবাধ বন্ধুত্বের অগাধ সুযোগ আছে শিশুদের সঙ্গে। পরিমিতি বোধের বালাই নেই, সচেতন হবার কোনও দায় নেই, যথেচ্ছ সময় কাটানোর অপূর্ব-সুযোগ আছে। সব কথা ওরা বোঝে না, বোঝানোর মতো বেশি কথা আমাদেরও থাকে না। জীবনের অবুঝ দুই পাড়ের মিলন পটভূমিতে একপক্ষ আনন্দ পেতে চায় অপরপক্ষ আনন্দ দিতে ও নিতে চায়। বাস্তবের কোনও অনুশাসন দড়াদড়ি নিয়ে হাজির থাকে না; ভাষার গোলমাল নেই, ভাবের হালকা গভীর যে কোনও ব্যঞ্জনাই সমান মূল্যের। একপক্ষ জীবনের উৎসমুখের কাছাকাছি থেকে হাত বাড়িয়ে দেয় জীবনেরই মোহনা-মুখী প্রান্তিক অবস্থানের কাছাকাছি জনের জন্যে। শিশুর নেই অভিজ্ঞতার আর জ্ঞানের পীড়ন, বৃদ্ধের নেই পর্বত-প্রমাণ অভিজ্ঞতার বোঝা আর সংগৃহীত জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রকাশের সুযোগ বা প্রয়োজন, হাল্কাচালের দায়হীন শাসনহীন এই মিলন তাই দুপক্ষেরই দন্তহীন হাসিতে আর অপরিষ্কার শব্দোচ্চারণে

ছন্দময় হয়ে উঠতে সুযোগ পায়। নোতুন-ই পবিত্র, পুরোনো-ই সোনা—'নিউ ইজ পিওর, ওল্ড ইজ গোল্ড!' 'ক্যারেটের' মাপ-মিশ্রণ সংসার-জীবনের অবদান!

শিশুর মা-বাবার অনেক দায়; সন্তানকে সামাজিক করে গড়ে তোলা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সরু-মোটা আচার আচরণগুলো একে একে উপ্ত-রপ্ত-করে দেওয়া, করণীয় অকরণীয় বিষয়ের প্রতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা এবং আরো কতো কি। তাই তাঁরা স্বাধীনতা ভোগ করেন না, যেমন বৃদ্ধরাও তাদের যৌবনে ভোগ করেন নি। কিন্তু এখন এই দ্বিতীয় শৈশবে তাঁরাও মুক্ত; একই সঙ্গে দাদু-ও-নাতি যৌবনের কাছে বকুনি খেয়ে হাসতে থাকে, একই সঙ্গে মনের মিলে অন্তরের ক্রন্দনকে ভাগ করে নিতে পারে। যৌবন পুত্র-কন্যার রূপ ধরে ঘুমিয়ে পড়লে বা অমনোযোগী হলেই 'দাদুন' গুটি গুটি দুদুর কাছে চলে যায়, চলে আসে, একই মনের তরঙ্গে তরঙ্গে জলতরঙ্গের ছন্দ-মিল-মিতালি খুঁজে পায়। বন্ধু মেলে, বন্ধু থাকে, বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। সদর্থক মিলের ঝংকার সঞ্চারে যেমন বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়, গাঢ় হয়, অচ্ছেদ্য হয় তেমনি মাঝবয়সীদের—পুত্রকন্যাদের—তাড়নায় নঞর্থক নৈকট্যও যেন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শৈশব বাবা-মায়ের কাছে কানমলা খেয়ে আশ্রয় খোঁজে দাদুর কোলে; বৃদ্ধরা মনের আঘাত লুকোতে মুখ লুকোন নাতি-নাতনীর আধো-আধো কণ্ঠের অনুভব আর আবোল-তাবোল আদরের অবিন্যস্ত আড়ালে।

এই বন্ধুত্বই শুভ্র-নিষ্কলঙ্ক-শরৎ-আকাশের নীলে ভাসমান একাকী মেঘের অলস অবস্থানের মতো। পবিত্র, সুন্দর এবং অনুভবে টানটান।

॥ আমি ও আমার কলম ॥

লেখার টেবিলে বসে নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলোকে কলমের ডগা দিয়ে নাড়াচাড়া করে কাগজের বুকে সাজানোর চেষ্টা করছিলাম। সব যে মনের মতো করে হচ্ছিল তা বলতে পারিনা। তবুও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মুশকিল হয় যখন চিন্তা ভাবনাগুলো হুড়মুড় করে একসঙ্গে দলবেঁধে হাজির হয়। এমনি একটা সময়ে দরজায় টোকা পড়ল, কে যেন কড়া নাড়তে লাগল। স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসাটুকু প্রশ্ন হয়ে দরজায় ছুটে গেল ; 'কে ?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটিও যেন স্বাভাবিক ভেসে এলো 'আমি'।

আমার কলমের ডগায় এই 'আমি'-টুকু যেন অশেষ হয়ে জড়িয়ে গেল। সেই দুয়ার-আগত 'আমির' সঙ্গে তার প্রয়োজন সিদ্ধির সময়টুকু দেওয়া হয়ে গেলেই দেখলাম আমার কলমের মুখে অসীম কৌতূহল সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে আছে! এক লহমায় বুঝে গেলাম ওর মুখের যাবতীয় প্রশ্নের, কৌতূহলের, যথাযথ বিলিব্যবস্থা না করে দিলে কলম আর এতটুকুও এগুতে রাজি নয়। সুতরাং পুরোনো ভাবনা-চিন্তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কলমের ভাবনায় কলম চালাতে বাধ্য হয়ে গেলাম।

কলমের ভাবনা এই 'আমি' নিয়ে। আমরা সকলেই তো এক একজন 'আমি'। আমাদের প্রত্যেকের নাম আছে, ধাম আছে ; ক্ষেত্র আছে, কর্ম আছে ; স্বভাব আছে, ধর্ম আছে ; চরিত্র আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। বর্ণনা দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের এতো কিছুই আছে, একটু বিস্তার করে খুঁজে দেখলে আরও অনেক কিছুই আছে। তা সব ছেঁড়ে-ছুঁড়ে আমরা কেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্তিত্বের ঘোষণায় 'আমি'-কে ব্যবহার করি, অনিবার্য ভাবেই করি? কেন এমন হবে? আসলে, আমরা কি আমাদের আসল স্বরূপটা জানি না বলেই সর্বজন-স্বীকৃত এই 'আমি' ঘোষণাটির আড়াল খুঁজি? না-কি, জীবনের পথ চলতে চলতে পরিষ্কার বুঝে গেছি যে একমাত্র এই ঘোষণাটির বাইরে আমার আর অবশিষ্ট যা তা সবই হাবিজাবি, হিজিবিজি মাত্র? ভরসা করে নাম বলতে পারিনা কারণ নামে আমার 'আমিটা' যদি ধরা না পড়ে, চেনা না যায় ; সম্পর্কটা ঘোষণা করতে বাধ-বাধ লাগে যদি তা অপর কাউকে আমার

চাইতে বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই কি আমরা সকলেই আমাদের 'অহং'-টির সাহায্যেই আমাদের পরিচয়পত্র রচনা করে চলি?

কলমের প্রশ্নের খোঁচায় খোঁচায় আমার জেরবার হবার অবস্থা। যে সব ভাবনার কুঁড়িগুলো আমার চিন্তার জগতে আনাগোনা করছিল, যাদের নিয়ে আমি কলমের সাহায্যে শব্দমালা-বাক্যমালা গাঁথার চেষ্টায় ব্রতী ছিলাম, সে সব এক মুহূর্তেই, সেই কলমের খোঁচাতেই, কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমার আসল ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে এখন তাই কলমের আসল ভাবনায়, 'আমি'-র ভাবনায়, মন দিতেই হল। প্রশ্ন উঠবে কলমকে এতো মূল্য দেওয়া কেন? সে দুঃখের কথা যদি বলতেই হয় তাহলে শুনুনঃ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আসে একটা অলস অবসরের নিশ্চেষ্ট সময়। তখন 'কে তোমার স্ত্রী, কেবা পুত্র, কা তে কন্যা!' সবাই 'কেউ করো নয় ভুবনে' গোছের অধ্যাত্মবাদে ঝুঁকে পড়ে। জীবনের নিজস্ব নিয়মেই যে এমনটি ঘটে এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই; ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সকলেই হাত পরিষ্কার রাখতে চায়। কথা বলার লোক কমে যায়, কথা শোনার লোক দূরে চলে যায়, এমন-কি স্ত্রী যে স্ত্রী তিনিও শত কাজের ঝামেলায় আর সহস্র অকাজের অছিলায় আপনাকে এড়িয়ে যেতে চান। তখন? তখন দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, তামাক-সেবনান্ত খক্ খক্ কাশি ছাড়া আর যে সদাসর্বদা আপনার কাছে কাছে, পাশে পাশে আজ্ঞাবহ 'কেষ্ট'-টি হয়ে মুখের ঢাকনা খুলে হস্তধৃত অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবে সেই তো আপনার কলম! সে আপনার মনের কথা বুঝতে পারবে, প্রকাশ করবে, আপনার চিন্তা-ভাবনার অশেষ জটিল-জঞ্জাল থেকে আসল কথাটি এঁকে এঁকে ছবি করে তুলবে, সেই কলম। একে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায়? তাই কলমের নির্দেশ মেনে তারই সন্তোষ বিধানের জন্যে 'আসল' বিষয়ে আসল কথাটিতে ফেরা যাক।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে কলম জানাল: তোমাদের, মানুষের, সমাজে আসল বলে কিছু নেই, আছে শুধুমাত্র নিজ নিজ অহংটুকু। একেবারে জন্মমুহূর্ত থেকেই তোমরা এই 'আমি'-ঘোষণায় চিৎকৃত সোচ্চার! শিশু যখন প্রথম শ্বাস নিতেই 'ওঁয়া ওঁয়া' করে বিশ্বচরাচর চিরে দিতে থাকে তখনই আসলে তোমরা ভুল করে সেই ঘোষণাকে 'ওমা' 'ওমা' বা 'মা-মা' বলে মনে কর। ভাষাবিদদের আতস কাচ, খন্তা, শাবল নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি, বিচার বিশ্লেষণ করলে অনায়াস জানতে পারবে যে সেই শিশু-ঘোষণায় অহং-এর প্রথম-পাঠই নেওয়া হয়ে থাকে।

'আমি আমি' করে সেই যে যাত্রা শুরু, তার আর শেষই হয় না, সমাপ্তি-সংগীত ধ্বনিত হবার আগে পর্যন্ত। বিশ্বময় শত শত 'আমি'-রা প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে, বড় হচ্ছে এবং তোমাদের সমাজে, পরিবারে, শয়নগৃহে সর্বত্রই প্রতিমুহূর্তে সহস্র আমি-সংবাদে মুখরিত করে রাখছে।

তোমাদের সমাজ-সংসারে বাইরে থেকে কান পাতা দায়! কেন? কারণ সেখানে ছেলের আমি, মেয়ের আমি, মায়ের আমি, বাবার আমি, সকলের আমি একঠাঁই হয়ে ঘুর পাক খাচ্ছে। আমি করেছি, আমি দিয়েছি, আমি নিয়েছি, আমি ছিলাম বলে, আমি না থাকলে—মিছিল, আমির মিছিল। তোমাদের ট্রেনে আমি, বাসে আমি, রাস্তায় আমি, দপ্তরে আমি, তদবির-তদারকে আমি, দেওয়া-নেওয়ায় আমি—আমি গুলো যেন সারাদিন মুণ্ডু-ঝোলা বাদুড়ের মতো দোল খেয়ে খেয়ে জানান দিচ্ছে। তোমাদের গৃহে আমি, বাগানে আমি, রান্নাঘরে আমি, বাজারে আমি, বৈঠকখানায় আমি, সভাসমিতিতে আমি—যেন ঘুঘুর বাসা যত্র-তত্র-সর্বত্র ছড়ানো। নিজ নিজ আমি-র নেশায় তোমরা চূড়ান্ত মাতাল বলে সেই নেশার সূত্রটি খুঁজে পাও না। আমিটা তোমাদের সূত্র, স্তোত্র, মূলমন্ত্র; তোমাদের মানবজীবনের ব্রহ্মসূত্র!

এক নাগাড়ে এই যে আক্রমণ এ-তো স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য করা দায়। তাই মনে মনে কলমকে বাধা দেব-কি-দেব-না ভাবছি; বোধহয় টের পেয়ে গেল। অনেক দিন একসঙ্গে থাকার দরুণ আমার চোখেমুখের ভাব-ভাবান্তর ওর বোধহয় মুখস্থ। তাই সহসা আড়-চোখে আমার দিকে তাকিয়েই আবার বলতে শুরু করল:

তোমরা যে অহংসর্বস্ব, স্বার্থপর, প্রত্যেকেই এক একটা আমি-র বান্ডিল সে তো আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না; তোমরাই যথেষ্ট। তোমাদের মনো-বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের একাধারে কোপার্নিকাস-নিউটন তোমাদের ফ্রয়েড সাহেবকে স্মরণ কর না কেন? নীতিবিজ্ঞানী বেন্থাম-মিল কি বলেন? আমি বলেছি বলেই তোমার চোখেমুখে কুঞ্চন দেখা দিচ্ছে; কিন্তু এবারে? এখন যে একেবারে চুপসে গেলে? বড় বড় নাম শুনলে তোমাদের প্রাণে আর জল থাকে না; ছোটরা যখন সেই একই কথা বলে তখন তোমরা রক্ত-চক্ষু শিরা-টান-টান মুষ্টি-বদ্ধ-কব্জি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হও! তোমাদের বলিহারি যাই! অথচ আমাদের দেখ—আমরা যারা তোমাদের জন্যে জীবনপণ করি—আমরা তো একবারও আমি আমি-র জ্বরে ভুগি না!

এই যে দিনের পর দিন আমাকে সময়-নেই অসময়-নেই ব্যবহার করে চলেছো, তোমার যাবতীয় জটপাকানো এলোমেলো চিন্তাগুলোকে আমাকে দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছ তার জন্যে একদিনও কি আমি আমার অহং নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছি ? বলতে পার ?'

মনে মনে বিষম বিপদের সংকেত পেলাম। টুপি বন্ধ করে মুখ-আড়াল অভিমান-তাড়নায় এখন এই অবেলায় যদি তিনি, আমার কলম, চুপ করে যান, গো-স্লো, কাজ-বন্ধ, নিব-রোখ ইত্যাদির যেকোনও একটি মানব-সম্ভব পথ বেছে নেন তাহলেই গেছি আর কি। মৃদু হাস্যের কায়ক্লেশ প্রকাশে ওঁকে 'গুড হিউমারে' রাখতেই হবে, নান্যপন্হা। তাই বলতেই হল : 'আরে, তোমার কথাটাই স্বতন্ত্র ; তুমি তো ত্যাগের দৃষ্টান্তস্থল। ত্যাগে ব্রহ্ম মেলে কি না জানি না, কিন্তু তোমাদের আত্মত্যাগে বিশ্বকবি থেকে বিশ্ববিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক থেকে দার্শনিক সকলেই তাঁদের, 'আসল'-টুকুকে জানতে পেরেছেন, প্রকাশ করে আমি-থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তুমি, তোমরা না থাকলে ওঁরা সকলেই আমাদের মতো আসল হারিয়ে আমি-র নকল অস্তিত্বে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন। তুমিই তো ওঁদের সামনে কলমের শঙ্খে ফুঁ দিতে দিতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে দিয়েছো ভগীরথের মতো। আর এই যে তোমরা নিজেদের সত্তাটুকু যথাযথ জান, আসলটিকে পরিষ্কার চিনতে পার তাতেই তো তোমাদের অমরতা, আমি-মুক্তিতেই তো সেই অমরতা। সত্যিকথা বলতে কি, তোমার, তোমাদের, এই অমৃতসত্তার ছোঁয়া পেয়েই তো সক্রেটিস্ থেকে সুনীল পর্যন্ত সকলেই অমর হয়ে গেলেন বা যাচ্ছেন। তুমি আমার উপর বিরূপ হয়ে অকারণেই আমাকে বেশি মূল্য দিয়ে ফেলছো।'

কলমের দেহে-মনে একটা হিল্লোল খেলে গেল। টের পেলাম। কিছু বললেই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হবার আশঙ্কায় একটা দার্শনিক ভাব চোখেমুখে টানটান মেলে রাখার চেষ্টা করলাম। সংশয় যেতে চায় না! ধরে ফেলবে না তো ? কিন্তু শরৎবাবু আমার পক্ষে ; প্রশংসা বড়ই ভাল দ্রাবক !

'তোমাদের মধ্যে অনেকেই কলমকে হাতের পুতুল বলে মনে করে ; যেন খেলার পুতুল ! মনে করে, যা তারা আমাদের দিয়ে বলাতে চায়, করাতে চায় তাই যেন আমরা নির্দ্বিধায়, অবনতশিরে মান্য করতে বাধ্য। এরা নিজেদের চেনে না, আমাদের জানে না। এদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আমি-র প্লাবন এতোই প্রবল যে সেই প্লাবনকেই আসল বলে ভুল ক'রে জীবন কাটিয়ে দেয় ;

জলকে ওরা চিনতে সুযোগই পায় না, যে জল প্লাবনের মূলে, যা না থাকলে প্লাবনই সম্ভব হত না। তোমরা, অর্বাচীন জনেরা, ছোটবেলা থেকেই তো আমার মা, আমার বাবা, আমার টেবিল, আমার ঘর, আমার গ্লাস, আমার বাটি—করে করে নামতার মতো আমি-আমিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠ, মুখস্থ-কণ্ঠস্থ-নিশ্চয়স্থ করে ফেল। তার পরে সেই আমি-নামতার জের টেনে টেনে সমগ্র জীবনের যাবতীয় যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত, বিচার-বিমর্শ-বিশ্লেষণ, অংক-ধারাপাত-জ্যামিতি সম্পন্ন করে থাক। এই আমি-নামতার দাপটে তোমাদের স্ব-স্ব আসলটুকু সেই ছোটবেলাতেই যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তাকে আর কখনই খুঁজে পাও না। ডুবে যাও প্লাবনে, হারিয়ে ফেল জীবনের যা আসল সেই জল, বা প্রাণকে। তোমরা যে বিধি-বিড়ম্বিত সেই সত্যটুকুরও স্থান থাকে না গোছা-গোছা আঁটি-আঁটি আমি-র স্টোর রুমে!

'সারা জীবন তোমরা শত-সহস্র প্রশ্নের সামনাসামনি হও। বাজার যেতে হবে কিনা? ছেলেমেয়ে পাশ করবে কিনা, অফিসে মাইনে-প্রমোশন-বদলী হবে কিনা, তৃতীয় মহাযুদ্ধ সম্ভব কি সম্ভব নয়, 'অমুক'-দেশ আমাদের প্রয়োজনে সাহায্য দেবে কিনা, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, রাধার ছেলে হবে কি মেয়ে হবে—নানাবিধ, নানা স্বাদের, নানান প্রেক্ষিতে সারাজীবনই প্রশ্ন আর প্রশ্ন। অথচ দেখ একবারের জন্যেও তোমাদের মনে আসল প্রশ্নটি মাথা তুলে জানান দেয় নাঃ আসলে আমরা কি? কোত্থেকে এলাম? কোথায় যাব? কি উদ্দেশ্যে এই জীবন? —এ-সব প্রশ্ন উঁকি-মাত্রও কি তোমাদের মনে দেয়? দিলে ক'জনের মনে দেয়?'

"মধ্য জীবনে আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ি, আমার সংসার করে করে যখন জীবনের ঢালু-পথে পা রাখার দিন একদিন অনিবার্য সমাগত হয় তখন আবার সেই আমি-আমির কেঁচে-গণ্ডুষ। আমার বেলা গেল, আমার দিন ফুরোলো, আমার সকলি বৃথা গেল, আমি সব হারালাম, আমার সকলই গরল ভেল, আমি বঞ্চিত, ধিক্কৃত, অবহেলিত —হতাশার নামাবলিতে তোমাদের সকলের আমিগুলো আপাদমস্তক মোড়া হয়ে যেন জীবন-নদীর পাড়ে-প্রান্তে অপেক্ষারত।

বেশ বুঝতে পারছিলাম আজ আর কলম মহাশয় ছেড়ে কলম চালাবেন না। তাঁর 'ফ্লো' এসে গেছে। বাধা দিলে প্লাবন রোধ করা অসম্ভব বিবেচনায় মৌন থাকাটাই প্রশস্ত মনে হল।

'অথচ তোমাদের ট্র্যাজেডি দেখে আমাদের, লেখনী কুলোদ্ভবদের, যথেষ্ট বেদনা বোধ হয়। তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের আমি-তাড়িত জীবন কৈশোর থেকে মধ্যজীবন পর্যন্ত সচক্ষেই প্রত্যক্ষ কর; সম্মুখ দৃষ্টিতে —ক্লোজশটে, দীর্ঘ-দূরত্ব-দৃষ্টিতে এবং অপসূয়মাণ আবছা দৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের অবস্থা দেখেদেখে তোমাদের কখনই নিজ নিজ চোখে একবারের জন্যেও সেই জ্ঞানাঞ্জনটুকু লেপন করে নিজেদের চিনে নিতে পার না। এবং 'হেডলং' সেই আমি-লাঞ্ছিত পতাকা হস্তে, আমি-আমির স্লোগান কণ্ঠে আমি-র মহাসমুদ্রের দিকেই দৃপ্ত পদে অগ্রসর হতে থাক। ভরাডুবিতে তোমাদের কী যে মহানন্দ তা আমরা বুঝি না; আমির গঙ্গোত্রীতে উৎসারিত শত-কোটি আমি-র এই মহাসমুদ্র যাত্রাপথের প্রতিটি সময়ের বিন্দুতে বিন্দুতে তোমরা ক্রমাগতই আমি-আমির অমৃতবাণী খোদাই করতে করতে এগিয়ে যাও। একবারের জন্যেও অহং থেকে বয়ম্-এ প্রসারিত হতে চাও না, তত্ত্বমসির উপলব্ধিতে উত্তরণ ঘটাও না আর সোহম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে সচেষ্ট হও না। এটাই বৃহত্তম ট্র্যাজেডি।'

'পক্ষীকুলের ট্যানটালাস্-কে দেখ; চাতক পাখির ভাগ্যবিড়ম্বনাটুকু অবধান কর। এই পৃথিবীর তিনভাগ জল, তাছাড়া ক্রন্দসী আকাশ জলের জোয়ারে অকৃপণ, শিশির বিন্দুসকল শীতল বিন্দু-বিন্দু জলে শ্যামল ধরণীকে প্রাণের স্পর্শ দেয় নিশান্ত ভোরের স্নিগ্ধ সকাল পর্যন্ত। কিন্তু চাতক? তীক্ষ্ণ কণ্ঠের রক্তঝরা ক্রন্দনে সেই জলের আকাঙ্ক্ষায় আকাশ-বাতাস মথিত করে তৃষ্ণার বেদনাটুকুকে অবিশ্রান্ত অসহায়তায় ঘোষণা করে ফেরে। আর তোমরা? পৃথিবীর সমস্ত বায়ুস্তরটুকুকে আমি-র বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে দিয়ে কেমন উদাসীন আত্ম-ভোলা আসল-হারান অস্তিত্বে মগ্ন। বেদনা বোধ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আত্মঅনুসন্ধান নেই। আমি-র নেশায় মত্ত-মাতাল জীবনান্ত-অবশেষ-সময়ে স্বগৃহে যখন প্রত্যাবর্তনের সময় সমাসন্ন হয়ে ওঠে তখন হাহুতাশ করা ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না। পথের মধ্যে আমি-তাড়িত পদক্ষেপ বেসামাল হয়ে ওঠে, আবার স্বগৃহের অবস্থানটিও তেমন পরিষ্কার দেখা দেয় না। তোমরা প্রত্যেকেই সান্ধ্য-নেশায় নেশাগ্রস্ত আমি-স্পৃষ্ট (বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো!) যাত্রী মাত্র। এই সার্বিক ভরাডুবির মধ্যেও যে দু'চারজন আমি-মুক্ত বুদ্ধ-জীবন, সোঅহম্-উপলব্ধিতে সন্নত, ত্বমেব-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁরাই তোমাদের জীবনে সার্থকতার ছোঁয়া এনে দেন, তোমাদের অমর করে রাখেন।

তোমরা তাঁদের জন্যেই বাঁচ, তাঁদের জন্যেই স-সত্তা হও, তাঁদের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে সব দুঃখ ভুলে যাও।'

'তোমাদের হাতে পড়ে আমরা সারাজীবন মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ করি, নরক যন্ত্রণা ভোগ করি। কেন? তোমাদের হাতে আমরা বাজারের হিসেব রাখি, অংকের যোগবিয়োগ করি, ব্যবসায়ের বিবরণ লিখি, স্বার্থের ভাষায় ভাগ-বাঁটোয়ারার রূপরেখা টানি। তোমাদের হাতে পড়ে তোমাদের নিত্যদিনের স্বার্থান্ধ তাড়নায় আমাদের চোখের জল কাল কাল রেখা হয়ে কাগজের বুকে বিষের জাল বুনতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তোমাদের আমি-গুলো আমাদের অস্তিত্বে কালিমালেপন করে, কালিমা-লিখনের অনৃত-সত্তায় আমাদের টেনে নামায়। নোঙর ছেঁড়া তোমাদের প্রবহমান আমি-র ঢেউগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের আঘাটায় টেনে নিয়ে যায়। আমাদের দীর্ঘশ্বাস তোমাদের কাজে লাগে—পত্র হয়ে, জমিজমার দলিল হয়ে, ঝগড়াবিবাদের কুৎসিত বিবরণ হয়ে।'

কলমের উত্তেজনাবোধ এবং বেদনার গভীরতাটুকু আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল; বিনম্র অনুশোচনায় আমার মনে কলমের বেদনার ধ্বনিটুকু গ্রহণ করতে পারছিলাম। তাই বললাম: 'অমন করে ব'ল না; আমার বড়ই কষ্টবোধ হচ্ছে। আমরা শত-কোটি কলমধারীরা তো প্রকৃতির মার খেয়ে খেয়ে অবশ, অদৃষ্টের কষাঘাতে জর্জর বাস্তবদৃষ্টি, জীবনের উৎসমুখটি থেকে উৎক্ষিপ্ত জীবনযুদ্ধের টালমাটাল সংগ্রামে পযুর্দস্ত। আমরা জন্মাবধিই নিরুদ্দেশ। তাই আমি-র নৌকোয়, আমি-র মাস্তুলে, আমি-র পাল তুলে আমারা শতকোটি মানবেরা আমির দড়াদড়িতে, হালে-বৈঠায়-লগিতে নিজেদের নিঃশেষ করে ভাসিয়ে দিতেই বাধ্য। আমাদের হাতে পড়লে তোমাদেরও আমি-পলিউশন তাই অবধারিত। আমি-লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত আমরা তাই তোমার লাঞ্ছনাকেও আমাদের সামিল করে নিয়ে থাকি। যদি কখনও আমরা, এই সব শত-কোটি আমরা আমাদের উৎস, মোহনা এবং মোহনার দিক্-নির্দেশটুকু যথাযথ পেয়ে যাই, আসল সত্তার সন্ধান পাই, তাহলেই তো আমাদের মুক্তির আলোয় আলোয় তোমার কলমের শঙ্খটি বেজে উঠবে।'

'আশাই জীবন, আমার জীবন, আমার প্রাণ। আমরা তো সেই আশাতেই বসে থাকি, হস্তধৃত হই তোমাদের। আমাদের সর্বদার প্রার্থনাই এই: কবে আমরা হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে হৃদয়ের অনুভবে মুখ ডুবিয়ে জীবন সার্থক করতে পারব। প্রত্যেক জীবনের আসলটি যেখানে সুপ্ত-স্থিত-সনাতন,

সার্বিক জীবনের স্বরূপটি যেখানে সত্য শিব সুন্দর হয়ে, উজ্জ্বল আলোর উৎসটি হয়ে, সদা-বিরাজমান, সেই যেখানে আনন্দের সংগ্রহটিকে আমাদের সর্বঅস্তিত্বে গ্রহণ করে, প্রকাশে, সঞ্চারে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারব—এই বাসনাই তো আমাদের জীবন। আমি-মুক্ত তোমাদের আসলের অনুভবেই আমাদের মুক্তিস্নান, আমাদের অমরত্ব।'

কলম চুপ করে গেল এতক্ষণে; ভবিষ্যতের দিকে তার দৃষ্টি। আমি নীরব হলাম; অতীতের প্রান্তরে আমার অন্বেষণ। দু'জনেই মনে মনে বোধহয় নিজ-নিজ আসলটুকুর খোঁজে মৌন হয়ে গেলাম।

॥ মন নিয়ে মনআনি ॥

নিজের মনকে নিয়ে যে এই শেষ বয়সে এমন বিপদে পড়তে হবে তা কখনও কল্পনা করি নি। আর ঠিক তাইই হল। সেই বিরাট বিপদটিই ঘনিয়ে এলো অসময়ে, অকারণেই।

দুপুরেই সবে একটা লেখা শেষ করেছি, বিষয়-এর মধ্যে কলম নিজেই ছিল একটি অংশ হয়ে। গম্ভীরকে একটু ছুঁয়েই ছিল সেই লেখাটি ; লেখাটিতে গুরুও ছিল, লঘুও ছিল ! সেই হল কাল, কলম আমাকে শাসিয়ে দিল যদি বিকেলের টেবিলে একইভাবে তোমাকে নিয়ে, সে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল, তোমাকে নিয়ে একইভাবে নাড়াচাড়া না কর তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

দুপুরের অন্নগ্রহণ সেই মুহূর্তেই আমার মাথায় উঠেছিল, দিবা-দ্বিপ্রহরের দৈনন্দিন সুখ-নিদ্রাটুকুও বালিশ-ন্যস্ত মাথা ছাড়িয়ে চোখের পাতায় উঠে যে আসবে না তাও আমার জানা হয়ে গেছিল। বিছানা-পিঠ বালিশ-মাথা দেহখানিকে ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করে করে নেড়ে চেড়ে বিষয় খুঁজতে সচেষ্ট ছিলাম। আলমারির মাথায় দ্বাদশ-বিন্দু চক্ষুটি টাইম-পীসের অপলক দৃষ্টি নিয়ে আমার অবস্থাটা টিক্ টিক্ করে মেপে যাচ্ছিল। ঊর্ধ্বদৃষ্টি পার্শ্বদৃষ্টি নিদ্রাহীন তন্দ্রাচ্ছুট আমার চোখ-দুটি যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয় ব্যাপার ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আসছিল। ইত্যবসরে কড়িকাঠের দৈর্ঘ্য, ছাদের কারুকার্য, দেওয়ালের রং-বালি-চুন, আলমারির বর্ণসৌন্দর্য টেবিলের উপর দাঁড়ান বেড-ল্যাম্প, জলের বোতল, রীডার্স ডাইজেস্ট, টুকিটাকি ওষুধ-পত্রের অকারণ অলস অবস্থান —সবই আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু অধরা বিষয়ের নাগাল পেলাম না ; চক্ষুদ্বয় পলকের জন্যেও পলকফেলার সুযোগ না পেয়ে কর্কশ হয়ে এলো, 'সাবভোকাল' বিরক্তি অধরের স্বাদকে আর জিভের সরসতাকে শুঁষে নিল, স্বল্পশস্য মস্তকের যে যে স্থানে খোঁচা খুঁচি, টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি করলে চিন্তার আর ভাবের প্রস্রবণ মুখগুলো খুলে যাবার কথা সে-সব স্থানগুলোর কর্ষণ করে করে চুলের গোড়াশুদ্ধ প্রায় ব্যথা করে ফেললাম অধিকন্তু টোকা মেরে মেরে আর ঠোকা দিয়ে দিয়ে। কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা, চলতি কথায় কাকস্য পরিবেদনা !

প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়েই পড়েছিলাম ; একটু যেন আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন ভাব

এসেছিল শরীরের পূর্ণকুম্ভ অবস্থার দরুণ। অলস-জীবনে বাঙ্গালীর ভাতঘুম বোধহয় রক্তচক্ষুকেও এড়িয়ে যেতে পারে, পেনের বা কলমের রক্তচক্ষু তো তার কাছে শিশু। ঠিক সেই অবস্থায়ই কানের মধ্যে মশা যেমন অস্বস্তিতে ফরূ ফরূ করে ওঠে, তেমনি মনের মধ্যে একটা মনগড়া চিন্তা কেমন যেন ফরূ ফরূ করে উঠলো। সেই ফরফরানির মর্মোদ্ধার করতে সময় লাগল না, যেন পরিষ্কার মাতৃভাষায় জানান ছিল ওরে মূর্খ তোর নিজের মধ্যেই তো অসীম সম্পদ লুকিয়ে আছে, তাকে ফেলে অকারণে দুপুরের ঘুম নষ্ট করে আকাশ-পাতাল খুঁজে মরছিস কেন? ওঠো, জাগো, প্রাপ্য বর লাভ কর—তোমার কলমের শাসানির হাত থেকে মুক্তি নাও।

এক মুহূর্তেই তিমি মাছের জলোচ্ছ্বাস ফোয়ারার মতো আমার এতক্ষণের জমে ওঠা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তাগুলো যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে ছাদের দিকে ধেয়ে গেল; আমি হাল্কা মনে হৃদয়ের ডুপ্-ডাপ্ শুনতে পেলাম, রক্তচলাচলে তরঙ্গ-ভঙ্গ যাতায়াত অনুভব করতে সুযোগ পেলাম আর শান্ত চিত্তে মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলাম। মনে হল, তাইতো, মনকে নিয়ে মনগড়া মনমানি করার এমন সুযোগ থাকতে কলমে কি ভয়? তিড়িং করে বিছানা ছেড়ে সটান চলে এলাম টেবিলে। মনের মধ্যে সিংহের চলন, ব্যাঘ্রের অকুতোভয়, হরিণের দ্রুতগতি চলনের শব্দ যেন ছলাৎ ছলাৎ করে কলমের ডগা বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। গুছিয়ে বসে কলম বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাগজের বুকে।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই বাধা পেলাম, যাকে নিয়ে কলম চালাব সেই মনটিকে প্রত্যক্ষ করা চাই তো; তবেই তো তার গতিবিধি, চাল-চলন, লুকোচুরি আর লীলাখেলা লেখা যাবে। সেই মন মাতানো, মনমোহন, বংশীবাদক, গোকুলের কুলমণিটি আছেন কোথায়? খুঁজতে গেলে সে হারিয়ে যায়, অনুসন্ধান শূন্য হাতে ফিরে আসে। মহা বিপদের কথা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি এক সময়ে মন ছিল, এবং বেশ বেশি মাত্রাতেই সে উপস্থিত ছিল; উপস্থিত ছিল অন্য অনেকের স্বীকৃতিতে, সান্নিধ্যে, নৈকট্যের মাধুর্যে। কিন্তু আজ এই অপরাহ্ন বেলায় যখন নিজের মনটিকে খুঁজতে গেলাম তখন গালে হাত দিয়ে টেবিলে বসে ভাবতে হচ্ছে সেই মনটি গেল কোথায়? এখন যাকে দেখছি আমার সঙ্গে সে যে প্রায় জড়ত্বে পৌঁছে গেছে। নিজে থেকে নড়ে চড়ে না, সংবেদনে আনন্দ বেদনা তার সমমান-সমমাত্রা-সমতুল; অতীতের দিকে মুখটি করে যেন নিথর নিঝুম, যেন মৌনমূক মহামুনি! হাহতোস্মি! একে নিয়ে লেখা? সেও কি সম্ভব?

বাধ্য হয়েই অতীতমুখী হতে হল। মনটিকে খুঁজতে খুঁজতে মনের প্রবাহ পথ বেয়ে বেয়ে উৎস-সন্ধানে যেতেই হল। জগদীশচন্দ্র গঙ্গাকে খুঁজে পেয়েছিলেন শিবের জটার জটিল জালের মধ্যে; তিনি ভাগ্যবান। মনের উৎস-সন্ধানে পাকদণ্ডি, ঘুরপথ পাথার-জঙ্গল শ্যামল-সমতল বেয়ে বেয়ে যখন প্রায় কাছাকাছি পেঁছে গেছি তখনই দেখি সেই গোড়ার কাছে মনের হদিস নেই, চিহ্নমাত্র হারিয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ়ত্ব, যৌবন, তারুণ্য, কৈশোর-বাল্যের সব এলাকায় মনের চিহ্ন ধরে ধরে যখন শিবের জটারূপ শৈশবে পেঁছলাম তখন দেখি দেহ আছে মন নেই! কি ভয়ানক অবস্থা, কী বিষম আশাহত অনুসন্ধান। নেই তো একেবারেই নেই, বেমালুম নেই।

মনের এহেন অব্যবস্থিতচিত্ততায় ভেসে এলো বাল্যে শোনা কবির লড়াই এর চক্ষু-কর্ণ-দৃশ্য। গ্রামের পটভূমিতে শামিয়ানার নিচে ধুতি-চাদরের আচ্ছাদনে বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে নবীন কবি প্রশ্ন করছেন অন্য কবিয়ালকে 'এই নবীনের হাত, এই নবীনের পা, এই নবীনের বক্ষ, এই নবীনের কক্ষ, কিন্তু নবীন কোথায়? বলতো কবিয়াল মন কারে কয়?' যেমনি মনে পড়া অমনি মনে মোর লেগে গেল খট্‌কা! রাজা মিরান্দা আর রথের রথত্বের গল্প ঝট্‌ করে মনকে অবশ করে দিল। একবার মনে হল মন নিয়ে নাড়াচাড়া আমার কর্ম নয়; তৎক্ষণাৎ কলমের শাসানিতে মন যেন কেমন করে উঠলো!

আলোচনাকে গুরুগম্ভীর করায় কলমের কড়া নিষেধ আছে; কিন্তু সনাতন ভারতীয় প্রথায় গুরুস্মরণ না করলে মন মানে না। দর্শনে বিজ্ঞানে আজ থেকে নয়, প্রাচীন অতীত থেকেই মন নিয়ে মাতামাতি স্বাভাবিক ভাবে ঘটে চলেছে। আত্মার অনুসন্ধান আর স্বরূপ নির্ণয় বাসনায় যার শুরু সেই স্রোতধারা ব্যবহারবাদে এসে মনকে একেবারেই বাদ করে দিতে চেয়েছে। শাস্ত্র প্রবাহের প্রশান্ত গতিতে যে আত্মাকে আমরা একমাত্র আত্মার আত্মীয়, ষড়ৈশ্বর্যের কিরীটী বলে মান্য করে সেই আত্মার জ্ঞানকে, বিদ্ধিকে, একমেবাদ্বিতীয়ম, সারাৎসার, প্রস্থান-মূল বলে স্বীকার করে এসেছি সে সব হঠাৎই খরস্রোতা হয়ে বিজ্ঞান-ডুবুরীদের ঘন ঘন জ্ঞানসাগর মন্থনে কেমন যেন তছনছ হয়ে গেল। অধ্যাত্ম অস্তিত্বের সুউচ্চ শিখরপীঠ থেকে আত্মা নেমে এলেন মনের জগতে; বিজ্ঞান তাকে নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে যখন ব্যস্ত তখনও আমাদের কোথায়ও হারিয়ে যাবার মানা ছিল না মনে মনে; কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া তখন হাতছাড়া হয় নি। মন আমাদের মনেই ছিল, তখনও দেহের বন্ধনে পিষ্ট হয়ে লুপ্ত হতে

পারে নি। মনকে খুঁজতে গিয়ে দেহকে ব্যবচ্ছেদাগারে যাঁরা পৌঁছে দিলেন তাঁরা মনেরও হদিস পেলেন না দেহখানিকেও মর্যাদা দিলেন না। কিন্তু ঘোষণা করে বসলেন মন একটা 'বাই-প্রোডাক্ট' একটা 'এপীফেনমেনন' মাত্র। তাতে মনের মান কতটা রাখা গেল তা জানা গেল না, শরীরকে অনেকটাই বেশি মূল্য দেওয়া হল। সেই মন মাতানো, মন হারানোর দৌড় সব সীমা পার হয়ে একেবারে চোখের-জলে-নাকের-জলে হয়ে গেল। এতোদিন পর্যন্ত আমরা দুঃখ পেলে কাঁদতে অভ্যস্ত ছিলাম, আনন্দেও কখনও কখনও অশ্রু ঝরতো, এবারে জানা গেল যে চোখের জল পড়ে বলেই আমরা দুঃখ পাই। ফলে, দুঃখ বোধের জন্যেই দুঃখ হতে আরম্ভ করার কথা। এতোদিন আমরা ভয় পেয়ে পালাতাম, উত্তেজিত হলে শারীরিক পরিবর্তন ঘটত, গন্তব্যে যাবার বাসনায় পদদ্বয়কে চালিত করতাম। সব কেমন উল্টো-পুরাণ হয়ে যাবতীয় মন বিষয়ক জ্ঞান-দেহখানি শীর্ষাসনে ঊর্ধ্বপদ হয়ে মাথায় রক্ত উঠে মর-মর হয়ে এলো কারণ এখন থেকে আমরা পালাবো বলেই ভয় পাবো, শারীরিক পরিবর্তন হবে বলেই উত্তেজিত হয়ে উঠবো, এবং, বোধহয় বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, ট্যাঁপাটেঁপীর হাত ধরে, হাঁটতে থাকব বলেই শ্বশুর বাড়ি গন্তব্য করব। এতোদিন মনে মনে যতো কথা ভেবেছি, যত গান গাইব বলে ভেবেছি, যতো কল্পনার জাল বুনেছি, এমনকি মন দেওয়া নেওয়ার জন্যে মন মাতানো পরিবেশ খুঁজে মরেছি একটু একান্ত হবার ইচ্ছায়, সে সবই দেহখানির অবদান ছিল বলে বিজ্ঞান নিজের জয়ঢাকে কাঠি দিয়ে জানান দিয়ে গেল। মনোতোষ-রা এখন সকলেই দেহ-তোষ বলে পরিচিত হবে; দেহের পুষ্টিতেই তার 'বাই-প্রোডাক্ট' মনের তুষ্টি ঘটবে। মনে মনে আর নাতি-নাতিনীদের নামকরণ করা যাবে না; দেহে-দেহে করতে হবে?

যারা এমনি করে মনকে একেবারে কুলোর বাতাসে ভাসিয়ে দিতে চায় তাদের কথায় না হয় মন দিলাম না, কিন্তু যারা কথায় কথায় মনকেই এগিয়ে দেয় তাদের বেলায়? ছোটবেলা থেকেই তো শুনে আসছি: মন দিয়ে পড়বে, মন দিয়ে শুনবে, মন দিয়ে পরীক্ষা দেবে, মন দিয়ে কাজ করবে? তখন সমস্যায় পড়িনি, অভিভাবকের কথা মন দিয়েই শুনেছি অথবা মন দিয়েই পাশ কাটিয়ে গেছি, ফাঁকি দিয়েছি। কিন্তু এখন যে বেশ খটকা লাগছে! এখন তো পরিষ্কার জানি যে চোখ দিয়ে পড়ি, দন্ত-জিহ্বা-তালু-কণ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা উচ্চারণ করে করে পড়ি, কান দিয়ে শুনি, কলম দিয়ে পরীক্ষা দেই, হাতের দ্বারাই কাজ করি। এখন বুঝি যে শত-সহস্র মন একাট্টা হলেও কলমটিকে এক মিলিমিটারও নাড়াতে

পারবে না, অথচ সেই কাজই হাত তার আঙুলের দ্বারা সহজেই করে ফেলবে। তাহলে ?

এখন বারে বারেই খটকা লাগে যখন স্মরণের পথ বেয়ে স্কুল-জীবনের পড়ার টেবিলে ফিরে যাই, সেই অভিভাবকদের প্রশ্ন ; পড়ার সময় মন কোথায় থাকে ? খেলার মাঠে মন পড়ে থাকলে কি অংক ঠিক হয় ? সব ক্ষেত্রেই সেই এক ধুন ; মন কোথায়, মন কোথায়, মন কোথায় ? তখন অতশত বুঝি নি, তবে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম যে এতটুকু প্রতিপ্রশ্ন করলেই মস্তিষ্কে জৈব-প্রোথিত হ্যান্ডেলদ্বয় অনিবার্য আকর্ষণে বেদনার জন্ম দেবে ; কান টানলে মাথাও যেমন আসে, রক্তও তেমনি মাঝে মাঝে ঝরে, ঝরতে পারে বৈ কি ? তা যে একেবারেই ঘটে নি তা তো নয় ; এবং তখন প্রত্যক্ষ জেনেছি যে শরীরের শ্রবণযন্ত্রের হাওয়া-তরঙ্গ ধারক সেই 'অরিকুল' পিষ্ট হলে বেদনা বোধ অবধারিত মনে পৌঁছে যেতো ; কর্ণমর্দন থেকে চোখের জল, এবং উভয়ের জন্যে মনের বেদনাবোধ। তখন যদি আধুনিক মনোবিজ্ঞানী জেমস্ সাহেব সামনে থাকতেন তাহলে তো তার কথা সহজেই মেনে নিতাম।

আচ্ছা আপনারাই বলুন না তাঁরা, সেই সব অভিভাবকরা কি মনে করে অমন সব প্রশ্ন করতেন ? ছেলে টেবিলে পুস্তক-দৃষ্টি বসে আছে, আর তার মন মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে এটা কি আদৌ সম্ভব-ছিল, সম্ভব হয় এখনও ? মনের হাত-পা আছে ? এমন কি হতে পারে যে আমি এখানে শরীর আগলিয়ে মরছি আর আমার মনটা তার পুচ্ছটি উচে-তুলে যত্রতত্র টহল মেরে বেড়াচ্ছে ? তাহলে কি আমার শরীরটা একটা ডেড্-বডি মাত্র হয়ে যাবে না ? যদি বলেন ; না, তা হবে না, কারণ রক্ত চলাচল যথারীতি চলবে, হাপর থেকে যাবতীয় যন্ত্রপাতিগুলো নিজের নিজের কাজ করেই যাবে, তাই তুমি মৃতদেহ হবে না, জ্যান্ত দেহটি হয়ে মা-বাবার কর্ণ-আকর্ষণটুকু অনিবার্যই বুঝতে পারবে, তাহলে আমার প্রশ্ন ঃ মনটা আবার সেই জ্যান্ত-'ভূতের', মানে জ্যান্ত-জড়ের—মধ্যে প্রবেশ করবে কি ভাবে ? সামনে জাগ্রত শমনের মতো মা-বাবাকে দেখে ভয় পাবে না ? দেহের দরজা খুলতে গেলে ক্যাচ্-কোচ্ শব্দ হবে না ?

মনের গহনে যখন ঘুরপাক খেতে খেতে বেশ হিমশিম অবস্থা তখনই মনের গভীরে রিণ্-রিণ্ করে যেন মধ্যঅতীতের মনভোলানো উপস্থিতির সঙ্গীত ধ্বনিত হল। কলেজ-জীবনে সবুজ-সতেজ ঘাসে দেহভার রেখে বৃক্ষের শীতল ছায়ায়

মন দেওয়া-নেওয়ার কথা মনে পড়ে গেল ; আর তখনই ঝাঁকে ঝাঁকে জোড়া জোড়া মনের মরাল-মিলন মন দেওয়া-নেওয়ার ছবিগুলো ধীর গতি মন-মাতানো চেহারা নিয়ে হাজিরা দিয়ে যেতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গথিক থামের আড়ালে, স্বর্গোদ্যানের কুঞ্জ-আতপ একাকিত্বে, গঙ্গাধারের ঝির-ঝিরে বাতাস ব্যজনে, সিনেমা গৃহের শতজনের মধ্যে একান্ত দ্বিত্বে জনে জনের যে অনাদি-অনন্ত মন দেওয়া-নেওয়ার সনাতন প্রবাহ সে কি মিথ্যে ? যদি ছাতনা তলায় অগ্নিসাক্ষী করে 'যদিদং তদিদং' করে হৃদয় দেওয়া যায়, তাহলে মনের আর বাধা কোথায় ? মন তো অনেক আটপৌরে ব্যাপার ; হৃদয় অবশ্যই দিনক্ষণ বিচার করেই গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের সংস্কৃতিতে মোড়া। তাছাড়া বাস্তবে চোখ রাখলে বলা যায় হৃদয় দিতে গেলে একজন, অন্তত একজন, ডাক্তার ছাড়া উচিতই নয় ; এতো আর মাত্র 'হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারিতাম'-এর মতো ভাবাত্মক অভীপ্সা নয় ; একেবারে একজনেরটি অন্যজনকে সামিল করে দেওয়া !

এতদূরে এসে বেশ ঝরঝরে একটা বোধ মনকে ছেয়ে ফেলল। আমরা প্রত্যেকেই একসময়ে না একসময়ে মনের কারবার করেই ছেড়েছি—ঐ দেওয়া নেওয়ার কথা বলছি। দর্শন-বিজ্ঞান যতখুশি তাণ্ডব করুক মনকে নিয়ে, করুক টানা হেঁচড়া, সময় যখন আসবে তখন সে সবই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার নিজের জোরে, জোয়ারের টানে। তখন মন দেওয়াও হবে, নেওয়াও হবে। আর পুরো ব্যাপারটাই সহজ-স্বাভাবিক হয়েই হবে। যাদের জীবনে সেই সময় জোয়ার হয়ে সব ভাসিয়ে নিতে সময় পায় না তাদের দুঃখে এই লেখাটি উৎসর্গ করে দিতে পারি। আমার মনে তার জন্যে কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

মন নিয়ে ছেলেখেলাও চলবে না, দর্শনের কচকচি আর বিজ্ঞানের যন্ত্র-ঝংকারও তথৈবচ। সেই সুদূর অতীতে পত্র বল্কলের আড়ালটুকু সম্বল করেও মন দেওয়া নেওয়া চলেছে ; এখন মহাকাশচারী জীবন বৃত্তের তেরতলা তেত্রিশ তলায় চুন-বালি-সিমেন্টের ঘরের মধ্যে ঘরেও সেই মনেরই লেনদেন সমানে চলছে। মনে করলেই আর মনকে তার দেহের ছাপ পাল্টে দেওয়া যাবে না।

তবে বয়স হলে যে সেই মনেই ছোপ পড়ে, মনের চোখে ছানি পড়ে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এটাই যা মনের দুঃখ।

॥ সমঝোতা ॥

ক'দিন ধরেই সময় তার আলস্য হারিয়ে বসেছে। হাত-পা ছেড়ে যে সময়ের টানে অকর্মণ্য বসে বসে সময় কাটিয়ে দেবো তা আর আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। একটা প্রশ্ন যেন আমার সমস্ত অলস অবসর সময়েই উত্তরের আশায় আমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনুসরণ করে চলেছে। প্রশ্নটা যে সেরকম কোন জটিল তা অবশ্যই নয়; কিন্তু তাকে প্রশ্নকর্ত্রী বেশ জটিল করে তুলেছে। এ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যাপারটা কি? উপাদান কি কি? কোন উপাদান প্রধান? —এরকম নানান জিজ্ঞাসা প্রশ্নটির ডালপালা বেয়ে তার ঘাড় থেকে সে আমার মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। সময়ের স্রোতে আমার মনের ভাসমান ভাবনাচিন্তাগুলো নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করাটা আমার অভ্যাসই হয়ে গেছিল; যাকে খুশি তাকে নিয়ে যেমন খুশি তেমন করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। এতে করে সময়ের ছিল না কোন দায়, বিষয়ের ছিল না কোনও প্রতিবাদ এবং আমারও ছিল না কোনও তাড়া। বাদ সাধল অনিমা। অনিমার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আগেই হয়েছে। কিন্তু আপনাদের ব্যস্তজীবনে অনিমা স্মরণের কোনও সামনের সারিতে স্থান পেয়েছে তা আমার মনেই হয় না। কিন্তু আমার সকালের অবসরে, দুপুরের বিলম্বিতলয় বিশ্রামের সময়ে আর অলস বিকেলে সেই অনিমার প্রশ্নটি—প্রশ্নগুলি—কখনও কাগজ-পড়ার সময়ে পত্রিকাবক্ষে, কখনও ইজিচেয়ারের দেহে এলিয়ে পড়া শরীরের পিছনে ঠিক মাথার কাছে অথবা নিরুদ্দেশ-দৃষ্টি বিকেলের আকাশের দেওয়ালে আমার চেতনাকে খোঁচা মেরে মেরে ব্যস্ত করে তুলছে।

অনিমার প্রশ্নে প্রবেশের মুহূর্তে প্রথম বাধা পেলাম তার শব্দটিতে—এ্যাডজাস্টমেন্ট। প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচনায় 'এ্যাডাপটেশন', পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বেঁচে থাকার, সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া বলে জেনে এসেছি। সমাজবিজ্ঞানে এবং মনোবিজ্ঞানে, এমন কি জীবজগতের অনেক ক্ষেত্রেই 'এ্যাডজাস্টমেন্ট' কথাটি ব্যবহৃত হয়। এ-থেকেই মনে হয়েছে প্রথমটি অনেক বেশি ব্যাপক, প্রাচীন এবং গভীরে প্রোথিত জীবন- বা প্রাণ-প্রক্রিয়া। এ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্র অনেক পরের, উন্নতশ্রেণীর এলাকায় পড়ে, সচেতন প্রচেষ্টায়

অপেক্ষা রাখে এবং শুধুমাত্র প্রবৃত্তিজ উদ্দেশ্যের যোগ্য-সাধনের জন্যেই ব্যবহৃত নয়, মানবিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই প্রধানত অনুসৃত হয়ে থাকে। এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-প্রকাশক শব্দটির জন্যে বাংলায় বেশ লাগসই কোন শব্দ বা ধারণা যে কেন তৈরি হল না তা আমার মাথায় এলো না। তাহলে কি বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে, বাঙ্গালী জীবনে এ্যাডজাস্টমেন্টের তেমন প্রয়োজন বোধই অনুভূত হয় নি! পারিভাষিক 'প্রতিযোজন' বা 'অভিযোজন' তো অত্যন্ত কেতাবী, বেশ ভারি শব্দ। এই বোঝা বয়ে বয়ে তো সাধারণ বাঙ্গালী জীবন যাপনকে সহজ করে নিতে পারে নি। মানানো, মানিয়ে নেওয়া, মানানো-গোছানো শব্দগুলো বেশ সাধারণ সাধারণ চেহারার, এবং সকলের পক্ষেই নিজ-নিজ জীবনে মানানসই ব্যবহারেরও উপযুক্ত। কিন্তু খটকা লাগল যখন চলন্তিকায় এদের এবম্বিধ ব্যবহারের সাক্ষাৎ পেলাম না! মনে মনে ভাবলাম: চলন্তিকায় না হয় না-ই থাকল তাতে তো জীবনের চলন্ত ছুটন্ত সমস্যাগুলোর সমাধান আটকে থাকছে না। প্রত্যেকেই তো বেশ মানিয়েই চলেছে। ট্রেনে-বাসে, পথে-ঘাটে, অফিসে-কাছারিতে, বাজারে-হাটে, গৃহে-গৃহাভ্যন্তরে আড্ডায়-মজলিশে, সর্বত্রই তো মানিয়ে চলতে হচ্ছে। 'হালাতে'র সঙ্গে কে 'সমঝোতা' না করে পারছে?

অলস চেতনার দিগ্‌বলয় চিরে চিরে ছুটে চলেছে অনিমার প্রশ্ন: কে এই মানিয়ে চলার পিছনে শক্তি বা গতি যোগায়? কে সমঝোতা করতে সাহায্য করে? প্রশ্নের ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় সম্ভাব্য ভিতরের বুদ্বুদ হয়ে আছড়িয়ে আছড়িয়ে পড়ছে সফেন উত্তরমুখী আরও কিছু প্রশ্ন: অর্থনৈতিক অসাম্য বা চাপ? উদ্দেশ্য-আদর্শ-লক্ষ্য? জীবনের মূল্যবোধ? শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদ? মানসিক প্রৈতি, প্রতিন্যাস, প্রবণতা? মননের সুপরিসর লেনদেনের —গিভ-এ্যান্ড-টেক্-এর পটভূমি? কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনবোধ? কি আছে আমাদের প্রতিনিয়তর মেনে নেওয়ার পিছনে?

এই সব প্রশ্নের হুলগুলো আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তীর-বর্শা-বল্লম হয়ে অলস অবসরকে তীক্ষ্ম খোঁচায় অনলস করে তুলছে। আমি পণ্ডিতও নই, বিশেষজ্ঞও নই, নই বিজ্ঞানমানসে অনলস; এই যন্ত্রণা তাই অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত-নিশ্চেষ্ট অবসর উপভোগের বাসনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্নগুলো যে আমার পিছু ছাড়ে না! জীবনের ছাত্র হয়েই সারাটা জীবন কেটে গেল; এখন এই অবেলায় গুরু হয়ে এই সব গুরুতর বিষয় নাড়াচাড়া

করতে বেশ সমীহ বোধ হয়। কিন্তু নান্যপন্থা ; অনিমাও নাছোড়, প্রশ্নগুলোও যেন নাছোড়বান্দা।

জীবনের একনিষ্ঠ ছাত্র-হিসেবে যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই আমার সম্বল। পর্বে-পর্বে, পর্যায়ে-পর্যায়ে, ধাপে-ধাপে জীবনের 'সিলেবাস' পাল্টায়, পাঠ্যতালিকায় পরিবর্তন হয়, মানিয়ে চলার গুণ ও পরিমাণে রং বদলায়, রূপের পরিবর্তন হয়, আচার-আচরণ-প্রকৃতি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। শৈশবের মানিয়ে চলাটা নেহাতই মেনে চলা, তারুণ্যের আর যৌবনের মানিয়ে চলাগুলোতে প্রধানত অন্তঃসলিলা বিদ্রোহের দানাগুলো দমন করার সাময়িক প্রচেষ্টাই প্রবল থাকে। বিবাহোত্তর জীবনে একাধারে চলে সমঝোতা, এ্যাডজাস্টমেন্ট, দেওয়া-নেওয়া—গিভ্-এন্ড-টেকের-মিছিল এবং পাশাপাশি, বৃহৎ পরিবারের দায়-দায়িত্ব-দাবির পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্নিহিত স্পৃহাকে ঠেকিয়ে রাখা। প্রৌঢ়ত্বের পড়ন্তবেলায় যৌবনের শক্তি-ক্ষমতা-দম্ভের অবদানকে মেনে নিয়ে নূতন জাগ্রত যৌবনের গতি-শক্তি-অহং-এর সঙ্গে একঠাঁই থাকার জন্যে শুধু ছেড়ে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ঘটে জেনারেশন গ্যাপ আর অব্যবস্থিতচিত্ততা। জীবনের সন্ধ্যেবেলায় যন্ত্রণা কমে যায় অতীত তেজের ঢলে-পড়া আবছা আলোয় জীবনকে যেন আবার সহজ বলে মনে হয় ; জীবন চায়না কিছুই, জীবনকে দেবারও থাকে না কিছু। তাই সহজ হয়ে যায় লেনদেনের হিসেব নিকেশ। ছাত্রজীবনের ছুটির ঘণ্টা তখন ঢং ঢং করে শরীরের অবশ তন্ত্রীতে, মনের অলস অবসরে আর চেতনার ম্রিয়মাণ তরঙ্গে খুব বেশি ঝংকার তোলে না। তাই মানিয়ে চলা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। অনেকটা যেন ধর্মের মধ্যে পড়ে।

তাই যা কিছু সমস্যা তা যেন জটপাকিয়ে ওঠে মধ্য যৌবনে, বিবাহ আর বিবাহোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করে। প্রাক্-বিবাহ যৌবন নিজের শক্তি আর গতির চাপেই সব বাধাবন্ধের তটসীমাকে ভেঙ্গে, ধ্বসিয়ে, গুঁড়িয়ে নিয়ে যায়। আদর্শ আর লক্ষ্যের টানে দিক্-বিদিক ছুটে চলে দুর্দম ; আপন বিশ্বাসের তীব্রতায় মানিয়ে চলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে হতেই পারে। তার কতটা সত্য কতটা গ্রাহ্য সে প্রশ্ন অবান্তর বলেই তখন মনে হয়। 'তরুণ গরুড় সম ক্ষুধার আবেশ' তখন জীবনকে তাড়িত করে, মথিত করে ; আদর্শের সুধা আর মূল্যবোধের অমৃত সন্ধানে তাই তরুণ মন আর যুবক স্পৃহা মেনে নিতে আর মানিয়ে চলতে অনীহা দেখায়।

এই উন্মুক্ত দ্বার যৌবন যখন রুদ্ধদ্বার বিবাহ-বন্ধনে নিজেদের আটকায় তখন ভিতরের আগুন আর সংসারের বদ্ধ-জলাশয়ে বাধে প্রবল প্রতিরোধ, বিরোধ, বৈপরীত্য। একই সঙ্গে সমান গভীর প্রবৃত্তি-প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে চলে দ্বৈত-চলন সপ্তপদী জীবনকে। ওখানে মান্যতা মার খায় প্রতি-পদে, এখানে মেনে নেওয়াটা রক্তের ঝংকারে ঝংকারে বাস্তব হয়ে ওঠে।

এই পর্বে ক্রমশই জেগে ওঠে বহুরেখ সম্পর্ক, স্বার্থ চেতনা আর ভবিষ্যতের কল্পজগৎ। গড়ে ওঠে নোতুন নোতুন তাল লয় ছন্দ—শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা-শালী, দেবর-ভাসুর—সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো কিছু কিছু তাল ভাঙে, ছন্দের ঘটে পতন আর লয়ে ধরে টান। অর্থ সামর্থ্যের কাপড়ে কোটের মাপ সঠিক বেড় পায় না, আর নব জীবনের কুলমাতানো কলধ্বনিতে অন্তর খোলা দিল দরিয়া খরচার হাতছানিও সামলানো কঠিন হয়ে পাড়ে। একদিন-দু'দিনের খরচার পাখনা-মেলা আকাশ-পক্ষতাড়না মাসের অন্যান্য দিনের উপর কালো ছায়া ফেলে। সংসারের সেতারে দ্বৈত-সুরের তার-বন্ধন ক্রমশই সুরে-বেসুরে বাজতে থাকে। অহং পথরোধ ক'রে সমঝোতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতি-প্রবৃত্তির জগতে জীবন যথেষ্ট খোলামেলা হয়ে দেখা দিলেও ব্যক্তিত্ব আর অহংকারের সূর্যোদিয়ে সরলতা-সাবলিলতা-স্বচ্ছতা মার খেয়ে যায়। মানিয়ে নেওয়া আর মানিয়ে চলা ক্রমশই পিত্ত-কফ-শ্লেষ্মা, বাত-ব্যাধি-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবাহ ও গতি— দুইই হারিয়ে ফেলতে থাকে!

অর্থ বা টাকা-পয়সাকে জীবনের পেট্রল বলা হয়েছে; গতির উৎস। বহুরেখ সংসার জীবনে এই অর্থের অনটন সম্পর্ক গুলোকে মুখ থুবড়িয়ে ভূপাতিত করে দিতেই পারে; গতির অভাব স্থানু করে দিতে পারে। পিতার প্রয়োজন পূরণে টান ধরে, মাতা সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যেতে পারে, স্ত্রীর জীবন সাহারার মতো বিরস-নীরস মনে হতে পারে; পুত্র-ভ্রাতার হাতখরচায় উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়া অসম্ভব নয়। কন্যা-ভগ্নীর স্কুল-কলেজের জীবন ঊষর হয়ে যেতে পারে। কতো সমঝোতা সম্ভব? কতো জনের সঙ্গে? অর্থ আবার সব অনর্থের মূলেও বটে! তাহলে কি মানিয়ে চলার প্রধান বিঘ্ন অর্থ? অর্থই মানিয়ে চলার জন্যে প্রাথমিক সূত্র?

কিন্তু না। সীমাহীন অর্থপ্রাচুর্যের বাতাবরণেও তো প্রতিযোজনায় বিঘ্ন নৈমিত্তিক ঘটনা; অনেক থাকলেই অনেক পাওয়া সম্ভব হয় না; বিচ্ছেদ, বেদনা, আঘাত-সংঘাত •অর্থের কারণে ঘটতে পারে কিন্তু শুধু অর্থ তাকে,

সেই সব অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকে দূরীভূত করতে পারে না। অর্থের প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্যে, অস্তিত্বের দায় পূরণ করার জন্যে। অর্থনীতির পরিভাষায় 'মানি হ্যাজ এ ফাংশান ফোর, —মিডিয়াম, মেজার, স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড স্টোর'! মানিয়ে চলার পথে, সমঝোতার ক্ষেত্রে এবং এ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজনে তো ওরা কোনও দাবিই রাখে নি!

অস্তিত্বের সর্বনিম্ন দাবি—রোটি-কাপড়া-মকান—অর্থের যোগানে সহজ, সম্ভব এবং নিশ্চিত হয়। এই দাবি পাশবিক, প্রাক ঐতিহাসিক স্তর পার হয়ে যখন মানবিক এলাকায় প্রবেশ করে তখনই মানিয়ে চলার দায়িত্ব মানুষের ঘাড়ে এসে পড়ে। অর্থের সামর্থ্য মানুষকে দেয় ভোগ্যদ্রব্যের উপভোগ; উত্তরণ ঘটায় না মূল্যবোধের এলাকায়। প্রবৃত্তির অস্বীকারে মানুষের সভ্যতা; প্রবৃত্তির পূরণে অর্থের শক্তি সর্বজনস্বীকৃত; সভ্যতার এলাকায় সেই সামর্থ্য পঙ্গু-অন্ধ অক্ষমতায় দীন! মনের মধ্যে সৃষ্টির চেতনা, হৃদয়ের মধ্যে অনুভবের সামান্য হয়ে প্রকাশ পাবার বাসনা আর উপলব্ধির সত্য-শিব-সুন্দরের শিল্প-কাব্য-সুর হয়ে, নির্ঝর হয়ে, শাশ্বত হবার আকুতিই মানুষের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

এ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে অন্ধ প্রকৃতির বশে যান্ত্রিক মানিয়ে চলা; এ্যাডজাস্টমেন্ট হল মনের ধ্রুবকে প্রাপ্য করার জন্যে ত্যাগ। সমঝোতা আমরা জান্তব বেঁচে থাকার জন্যেই করি না; মানসিক বেঁচে থাকার জন্যে অনুসরণ করি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ত্যাগ করেন বলে বলা হয় সে এই বৃহত্তের পাদমূলে ক্ষুদ্রের বলিদান মাত্র। প্রাণিজগতে চলে নখদন্তের নিয়ম; ত্যাগ-ধৈর্য-তিতিক্ষা সেখানে জৈবিক মৃত্যুর পরোয়ানা। মানুষের জগতে অন্তঃস্যূত বিচার ভাবনার নীতি; ত্যাগ-ধৈর্য-তিতিক্ষা সেখানে উত্তরণের পাথেয়। ব্যত্যয়-ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সন্তান ধারণ-প্রসব-লালনে পশুজগতে আছে ত্যাগের দৃষ্টান্ত, মানুষের স্বার্থচেতনার উন্মেষে-পূরণে-সংরক্ষণে বার বার ঘটে গেছে নখদন্তের, গোলা বারুদের প্রয়োগ। মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে হিংস্রতা-জিঘাংসা-হত্যাস্পৃহা তার জান্তব অস্তিত্বের ইতিহাসেই।

যা থাকলে মানুষ মানুষ, না থাকলে মানুষ মানুষ নয় তাই মনুষ্যত্ব—সাহিত্যসম্রাট যত দার্শনিক করেই বলুন না কেন, কথাটার ব্যঞ্জনা তাতে কিছুমাত্র হারায় না। দক্ষিণেশ্বরের শান্ত শীতল পরিবেশ থেকে উৎসারিত 'স'—সয়ে যা, সয়ে যা—অত্যন্ত সাদামাটা করে সমঝোতার নীতিটি ঘোষণা করে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যা তাকে মানুষ হয়ে উঠতে

সাহায্য করে ; সেই গুণাবলীর মধ্যে সহনশীলতা অবশ্যই একটি প্রধান গুণ। আর এই গুণটিই মানিয়ে চলার পথ প্রদর্শক।

মানুষ যা কিছুই করে তা অন্য কিছুর জন্যেই করে ; কোনও কিছুকে পাবার জন্যেই করে। খাওয়াটা বেঁচে থাকার জন্যে, পড়াশুনোটা জ্ঞানার্জনের জন্যে বা চাকরি পাবার জন্যে, গৃহনির্মাণ আশ্রয়ের জন্যে, বিবাহ পুত্রার্থে বা সংসারের বা সাহচর্যের জন্যে, মন্দির-মসজিদে যায় ঈশ্বর-আল্লার জন্যে, চাকরি করে অর্থের জন্যে…। সবই ইনস্ট্রুমেন্টাল, ভ্যালু-ইন-ইউজ। এমন কিছু আছে যা নিজের জন্যেই, সেই-কিছুর জন্যেই, করা হয় ? ঈশ্বর-আল্লা হতে পারেন সেই-কিছুটি ? এমন কি সেও অন্য কিছুর জন্যে, শান্তির জন্যে বা আনন্দের জন্যে। কিন্তু আনন্দ চাই আনন্দেরই জন্যে। আনন্দই একমাত্র কারন এবং কার্য—একাধারে। জীবনের আনন্দ যজ্ঞে আনন্দই আমাদের প্রেয় শ্রেয় ভূমা।

মনের শান্তি, হৃদয়ের প্রশান্তি আর আত্মার আনন্দ আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যেকেরই। কিন্তু সব সময়ে আমরা তা টের পাই না ; ছোট ছোট লাভ-ক্ষতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা নিয়ে আমরা এতোই জড়িয়ে পড়ি যে ছানি-পড়া আচ্ছন্ন-আবিষ্ট-দৃষ্টিতে ভুগে মরি। কি চাই তাই বুঝি না, কি পাই তার হদিস মেলে না ; কি হারাই তা টের পাই না, কি পেলাম না তার হিসেব নিয়ে চোখে ঝাপসা দেখি। আর এই ছোট ছোট নিত্য নৈমিত্তিকের পিছনে অন্ধবেগে ধেয়ে বেড়াই বলেই আমাদের নখগুলো প্রতিনিয়তই বেরিয়ে পড়ে, দন্ত-পেষণে কিড়মিড় করে ওঠে, রক্তচক্ষু দৃষ্টিপাতে পাত্রাপাত্র বোধ হারিয়ে বসি। মানিয়ে নেওয়া, মানিয়ে চলা আর সমঝোতার পথগুলো কেমন যেন কণ্টকাকীর্ণ, পাথুরে আর উত্তপ্ত মনে হয়।

মনকে দূর পর্যন্ত দেখার তালিম দেওয়াটাই আসল কথা। সেটার অভাবে নাসিকা-দূরত্ব-দৃষ্টি আমাদের মনটি বার বার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা হয়ে যায়। যৌবনেই মনে বাত ধরে যায়, আড়ষ্ট হয়ে পড়ি আর মানিয়ে চলার জন্যে যে প্রাণশক্তি, দূরদৃষ্টি এবং ত্যাগের প্রয়োজন সেই কথাটা বেমালুম ভুলে বসে থাকি। মাতৃ বিয়োগের মতো বেদনা বিধুর আদি অন্তহীন ক্ষতটাকে পর্যন্ত আমরা স্বার্থের চোরা বালিতে হারিয়ে ফেলি, পুত্রের অভাবজনিত আদিগন্ত হাঁ-টাকে আমরা 'এ্যাডজাস্ট' করে ফেলি। কিন্তু একটা বালতি, একটা বাটি, একটা আলমারি, বা তিন ইঞ্চি জমি, এক ফালি বারান্দার শোক সারাজীবন

ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না কটু কথা, একটু বঞ্চনা, কিছু প্রতিহিংসার বাসনা। এটা কি অর্থের প্রাচুর্য বা অনটনের জন্যে ঘটে? এটা কি আদর্শ বোধের জন্যে সম্ভব? ওরা কখনও কখনও নিমিত্ত মাত্র হয়ে সামনে দাঁড়ায়, বাহানা-র মতো পতাকা তুলে জানান দেয়। প্রকৃত পক্ষে মানিয়ে চলাটা একটা মানসিকতা, একটা মূল্যায়ন থেকে ঘটে থাকে। একটা দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। সমঝোতা করে থাকার, আনন্দকে ধরে রাখার মানসিকতা যদি একবার উন্মেষিত পরিশীলিত হয়ে ওঠে তাহলে এ্যাডজাস্টমেন্ট করাটা আকাশের মতো উদার হয়ে যায়, সমুদ্রের মতো প্রসার পেয়ে যায়, সবুজের মতো মনোহর বলে মনে হয়।

এ্যাডজাস্টমেন্ট একটা জীবন-দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা প্রতিন্যাস। এ্যাডজাস্টমেন্ট-টা কখনই লক্ষ্য নয়, পথ মাত্র; কণ্টক যেমন কখনই লক্ষ্য নয়, গোলাপটাই লক্ষ্য। পথের কষ্টটা এ্যাডজাস্টেবল্, কেননা গন্তব্যের প্রাপ্তি সেই কণ্টকে অনিবার্য মেনে নিতে বলে। দিনান্ত খাটুনি, উদ্বেগ-শ্রম, আর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি-অবসন্নতা-দুঃখ সবই গর্ভধারিনী জননীর কাছে শিশুর লালন কল্যান-স্বাস্থ্যের কাছে অকিঞ্চিৎকর। দুঃখটা বস্তুতে নেই, বস্তুর অভাবে নেই, আছে মনে। মনই আমাদের মান দেয়, অপমান দেয়; মন আমাদের পথ দেখায়, লক্ষ্যের নির্দেশ দেয়, মানিয়ে চলতে সাহায্য করে। তাই মানিয়ে চলার জন্যে মনের দিকেই মন দেওয়া দরকার, বস্তুর দিকে নয়, ভোগের হাতছানিতে নয়, আঁচলে-সংগ্রহে নয়। মনে মনে যেমন হারিয়ে যাবার বাধা নেই, মনে মনে তেমনি সমঝোতারও বাধা হয় না। হারিয়ে যেতে লাগে কল্পনা, সমঝোতার জন্যে লাগে ত্যাগ।

আমাদের প্রত্যেকটি 'আমি'ই যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু নয়, অপরেরও যে দাবি আছে, মন আছে, জীবনবোধ আছে, লক্ষ্য আছে, এই সত্যটি যখনই মনের অন্দরে সহজ প্রবেশের সনদটি পায় তখনই মানিয়ে চলাটাও সহজ হয়ে ওঠে। অপরের সঙ্গে নিজের আত্মস্থতার উপলব্ধিতেই সমঝোতা সুন্দরকে ধরে ফেলে; প্রাণঘাতী তৃষ্ণায় আর্ত জন যখন মৃত্যুপথযাত্রী অন্য সৈনিককে জলের পাত্রটি তুলে দেয় এ্যাডজাস্টমেন্ট তখন পূর্ণভাণ্ড প্রাণ-স্বরূপ বিগলিত করুণা, ত্যাগের প্রস্রবণ এবং সুন্দরের বর্ণছটায় নয়ন-মনের সামনে হাজির হয়ে ওঠে।

এ্যাডজাস্টমেন্ট যখন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ঘটে তখন তা 'এক্সপিডিয়েন্সি', বাস্তববুদ্ধি মাত্র; সমঝোতা যখন এক মনের তরঙ্গাঘাতকে অন্য মনের প্রবাহতটে

পৌঁছে দেয়, সঞ্চারিত করে দেয়, তখন তা 'এক্সসেলেন্ট', সম্পন্ন হয়ে প্রকাশ পায়। স্ত্রী যখন স্বামীর সঙ্গে সমঝোতা করেন সম্ভাব্য আর্থ শক্তির, শারীর শক্তির বা সামাজিক শক্তির ভয়ে তখন তা দুর্বলতা, মান্যতা নয়, তখন তা শৃঙ্খলিত অস্তিত্ব, সমঝোতা নয়। কোন কথাই শেষ কথা নয়, কোনও সত্যই 'এ্যবসলিউট' নয়—এই বিশ্বাসে যখন অপরের মতকে মেনে নেওয়া হয় তখন তা বিচার-নিষ্ঠ সমঝোতা। ভালবাসা যেখানে বিরুদ্ধতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেখানে মান্যতা আনন্দের মাত্রা পায়। আমরা সকলেই শত-সহস্র 'চাই-চাই' এর জঙ্গলে হারিয়ে না গেলে দেখতে পাব যে আমরা সকলেই স্বস্তি চাই, শান্তি চাই, আনন্দ চাই; এই আনন্দই দ্বিমাত্রিক মেরুরেখায়, চাওয়া-পাওয়া, কার্যকারণ, গতি-গন্তব্য, পথ-আর-পথের শেষ নির্দেশ করতে পারে। আনন্দ চাই বলেই সমঝোতা করি; সমঝোতা করি বলেই আনন্দ পাই। এর অন্যথা হলেই ভয়ের কারণ, ধ্বস নামার সম্ভাবনা, নিজ-নিজ অস্তিত্বের মেরু-বিন্দু থেকে হারিয়ে যাবার পথটি সটান অপমৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

সমঝোতাই জীবনের লক্ষণ ও বাণী; 'ম্যাল-এ্যাডজাস্টমেন্ট' অপমৃত্যুর দ্যোতক।

নৃত্য যেমন এক পায়ে ছন্দ খুঁজে পায় না, সমঝোতাও তেমনি অন্তত দুজন না হলে লয়বদ্ধ হয় না। মিলের আর অমিলের দ্বৈত প্রদক্ষিণে তাল-লয়-ছন্দ প্রকাশ পায়, মানিয়ে নেওয়া বা মানিয়ে চলার ক্ষেত্রেও তেমনি দুই বা ততোধিক জনের গতি-প্রবাহে মনের তরঙ্গ-ভঙ্গের যতি-মাত্রা-সম সমঝোতার দেহখানি চলমান রাখে। সমাঝোতা একটা মানসিক 'সিমফনি', 'অরকেস্ট্রেটেড' শত-পদী; আনন্দ-গমন, আনন্দ-পরিক্রমা।

॥ দেহ মন আর শীলন ॥

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, গরীব-বড়লোক, গ্রাম্য-শহুরে—আমরা সকলেই কম বেশি সুন্দরের পূজারী। এই পূজা প্রথম প্রথম প্রকাশ পায় নিজেকে কেন্দ্র করে, সাজগোজে, জামা-কাপড়ে, চলনে-বলনে, প্রসাধনে-রূপচর্চায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সীমারেখাটি পার না হলে এই পূজা পর্বটি শুরু হয় না। প্রাণী জগতে জিহ্বা-লেহন, ধূলি-স্নান, জল-ঝাপটা এমন-কি গড়াগড়ি দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো প্রকৃতি-নির্দেশিতই বলা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সীমারেখার এ-পারেরই বলা চলে! আমাদের মানুষের সমাজেও তাই স্নান-ইত্যাদি হস্ত-পদ দেহ প্রক্ষালন সেই প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকাশ।

ধাতু-দর্পন এবং পরে আয়নার ব্যবহার মানুষের সমাজে প্রথম সুন্দরের পূজার উপকরণ বলা যায়। স্বাস্থ্য-নিয়মের প্রাকৃতিক রেখার বাইরে সেই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। সুন্দর তখন নিজেদের কেন্দ্র করেই আমাদের রেখা-পারের খেয়া-নৌকো। স্বভাবজ নিয়মেই আমরা প্রত্যেকেই 'নার্সিসিস্ট'। সেই কোন আদ্যিকাল থেকে আমরা নিজেদের সুন্দর করে তুলছি, অপরের চোখে স্বতন্ত্র-গুণে উপস্থাপিত করার চেষ্টায় মাথায় পালক, শিরস্ত্রাণ-পাগরি, খোপায় ফুল, কানে দুল গুঁজে চলেছি। নিজ নিজ দেহখানির যৎ-সামান্য চেহারাকে অসামান্যতায় মনোহর করে সুন্দরের আসনখানি করে তৃপ্তি খুঁজে বেড়াতে ব্যস্ত থাকি। নিজ-নিজ দেহ-মন্দিরে এই ব্যক্তি-সুন্দরের পূজা-আবাহন নিজের জন্যেই হয়ে শেষ হয়ে যায় না। আমরা প্রত্যেকেই চাই যে অপরের চোখের তারায়, দৃষ্টির আয়নায় আমাদের এই মনোহর প্রকাশটুকু স্বীকৃতি পাক। একপ্রান্তে 'নার্সিসিজম' তো অন্যপ্রান্তে 'শো-ম্যান-শিপ'। এই দুয়ে মিলে দেহ-আমিটির পূজার আয়োজন সমাপ্তি পায়।

শৈশবের ল্যাজা আর বার্ধক্যের মুড়ো বাদ দিলে স্বনির্ভর আমি-র দেউলটি আমরা প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে গড়ে তুলি, তাকে নিয়ে ঘষা মাজা করতে করতেই জীবনের অধিকাংশ সময় পার হয়ে যায়। ল্যাজার শৈশবটুকুকে মা-বাবা, মাসি-পিসি, দিদি-দিদিমা-ঠাকুমারা আপন-মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করে দেন, সকাল-দুপুর-বিকেল সাজিয়ে-গুছিয়ে আত্মতৃপ্তির স্বাদটুকু তারিয়ে তারিয়ে

উপভোগ করেন। কিছুটা অপূরিত বাসনার আকণ্ঠ পূরণ, কিছুটা অবদমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাবোধের মূলে জয়ের সুড়সুড়ি দেওয়া, এবং প্রায় সবটাই আমি-বোধের, আমার-বোধের গোড়ায় সরস অহংকারের জলসেচন। সন্তানরা, শৈশবে অবশ্যই, মা-বাবার 'প্রজেক্টেড্' অস্তিত্ব ; তাই সেখানে সুন্দর-পূজোর আবাহন আড়ম্বর একই নিয়মেই ঘটে থাকে।

দেহকে দেহলি বানিয়ে ষোড়শোপচার এই যে পূজো-অর্চনা এটা মানুষের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন হলেও প্রকৃতির আপন সংসারে ঋতু-নির্ভর। সেখানে নেহাৎই প্রকৃতির প্রয়োজনে ঘটে চলে সুন্দরের উন্মেষ এবং উপস্থাপনা। মানুষ নিজের স্বভাবের টানেই প্রকৃতির সব জৈবমাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে নিজের জন্যে এক সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করেও সে তার নিজের জন্যে একটা বিশ্ব তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু সেখানে সে দেহ-সর্বস্বতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে পারল কৈ ? বাইরে সে নিজেকে অনেক ছড়িয়ে দিতে পারল, ভিতরের দিকে কিন্তু সে অনেক গভীর পর্যন্ত সুন্দরকে টেনে নিয়ে আত্মস্থ করে তুলতে পারল না। দেহের এবং বস্তুর পূজোয় তার সব সময়টাই কেটে গেল, অন্তরের অনুশীলনে হৃদয়ের পরিশীলনে আর মনের সংস্কারে তার টান পড়ল সময়ের আর ইচ্ছার। এই দীনতার চেতনাটুকু আমার অনেক অবসর সময়ের আলস্যকেই অবশ করে তোলে। একটু বিস্তারিত করা যাক।

আমাদের প্রত্যেকেরই আছে গৃহের পোশাক, অফিসের পোশাক, বাজারের পোশাক ; আছে বিশেষ অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা, বিশেষ-বিশেষ সময়ের জন্যে বিশেষ বিশেষ আবরণ আভরণ। এবং এই ব্যাপারটা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক বেশি করেই আছে ; ওদের মাঝে মাঝেই 'টাচ্' দিতে হয়, 'ম্যাচিং' না হলে ওদের পাঁচালী অশুদ্ধ হয়ে যায়, ওদের হাতে-কাঁধে তাই বন্দোবস্তটুকু পুঁটুলি হয়ে সঙ্গ দেয়। এখানে প্রকৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব ও 'মাধ্যাকর্ষণ' সমানে কাজ করে যায়। ছেলেদের বেলায় সুন্দর আবাহন, আরাধনা আর পরিশীলনে আসন পায় ; মেয়েদের বেলায় সুন্দর দেহজ-স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত, অনায়াসলব্ধ। সেই স্বতঃ-সুন্দরে আলোর রোশনাই সদাজাগ্রত। এবং যথাসময়ে প্রতিফলিত করে তোলাটাই ওদের কাজ। তাই সুন্দরের যাত্রাপথে এদের, ছেলে ও মেয়েদের, যাত্রাবিন্দুই তো আলাদা !

সুন্দরের পূজোয় আমরা দেহ ছাড়িয়ে গৃহকে সামিল করি এবং গৃহকে ছাড়িয়ে পরিবেশে পাড়ি দেই। ঘর সাজানো একটা শিল্পকর্ম, সুন্দরের চাক্ষুষ

উপস্থিতি যা দেহের বাইরে কিন্তু ঘরের চারদেয়ালে টানটান ভেসে থাকবে। জানালার পর্দা, বিছানার চাদর, সিলিংএর বাহার, টি.ভি-র 'ক্যাবিনেট', ফুলদানির চরিত্র এবং বর্ণশোভা—এসবই সুন্দরকে নয়নের সম্মুখে ধরে রাখার বাসনা। এই বাসনার কতটা সুন্দরের অপাপবিদ্ধ পূজার, কতটা অপূরিত অতীতের আশা পূরণে, আর কতোটা অবদমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনায় তার হিসেব মনোবিজ্ঞানীর এলাকায় পড়ে। গৃহ ছাড়িয়ে, সম্ভব হলে, বাগানে, গৃহের বাইরের দেয়ালে, গঠনে, কারুকার্যে আমরা সুন্দরকে আটকে রাখতে চাই। চাই নিজেদের তৃপ্তির জন্যে, অপরের মনে প্রভাব জাগানোর বাসনায়।

এই দেহ এবং দেহসর্বস্ব পূজার ব্যবস্থায় বন্দোবস্তেরও অঢেল প্রক্রিয়া প্রকরণ আছে; এবং সেসবের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই সব প্রক্রিয়া-প্রকরণের সবিস্তার বর্ণনা-আবাহন-ফলাফল প্রতিদিনই দেখতে পাওয়া যায়: শরীরের সুষম গঠনের জন্যে, অনাকাঙ্ক্ষিত মেদ ঝরানোর জন্যে, ত্বকের পরিচর্যায়, সাজপোশাকের নবনব দিগন্ত-ব্যঞ্জনায়, কেশ-বিন্যাসের পরিশীলনে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক 'মেক-আপ' সৃষ্টিতে আধুনিকতার হাতছানি প্রতিদিন আমাদের মুখ চেয়েই সোচ্চার হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে পাবেন 'ইনটিরিয়র ডেকর' 'গার্ডেনিং' 'হোম ডেকর' ইত্যাদির ডাক। দেহ আর দেহ!

কিন্তু মনের যে বিরাট এলাকা আমাদের আচার-আচরণে, প্রকাশে-ব্যবহারে সদাসর্বদা নিজের অন্তরটিকে নিজের সামনে মেলে ধরছে, অপরের মনের দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে সেই মনের সুন্দরকে তো কখনও পূজায় আর আরাধনায়, আবাহনে আর অনুশীলনে সুন্দরের প্রকাশ-ক্ষম করে তুলি না! দেহের অনুশীলনে আমরা অক্লান্ত কিন্তু মনের অনুশীলনে কেন সময়াভাব? সাজসজ্জায় দেহকে আমরা মনোহর করে তুলতে চাই, কিন্তু কতটুকু চেষ্টা করি মনকে মনোহর করে তুলতে? দেহে যে সম্পদ আছে তাকে মূলধন করে আমরা সার্থকতার দৌড়ে যোগ দেই; তখন আমরা কতো রকমের ব্যায়াম করি, শরীর চর্চায় সময় ধার্য করি, চিকিৎসকের পরামর্শ নেই, খাদ্যতালিকা নির্ণয় করি, শৃঙ্খলা অনুসরণ করি। মন বা অন্তরের ক্ষেত্রে সে সব ব্যবস্থার কি কোনও প্রয়োজনই নেই? সে কি এতোই ফেলনা? এতোই 'টেকেন্-ফর-গ্রান্টেড্' বিষয়? শরীর জটিল; কিন্তু তার জটিলতা ডাক্তারের ব্যাপার, প্রশিক্ষকের সমস্যা। মন ও জটিল; তার জটিলতা কার ব্যাপার? কার সমস্যা? কারোই নয়?

মনের একটা অংশের ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলে;

কিন্তু তার বুদ্ধির ব্যায়াম ছাড়াও যে প্রয়োজন আছে, ক্ষুধা আছে, আছে উন্নতি-অনুশীলনের অনন্ত অবকাশ সে কথা আমাদের সমাজে কেন স্বীকৃত নয় ? তার আবেগের এবং চাহিদার—ইমোটিভ্ এবং কোনেটিভ্—অংশের জন্যে কি ব্যবস্থা আছে ? সমান অপরিণত-বুদ্ধি বন্ধু-বান্ধব, অনভিজ্ঞ সখা-সখী এবং জীবন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সাধারণ-বোধ-নির্ভর অভিভাবক গণই এক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা হবেন কেন ? শরীরে সুন্দরকে পেতে হলে বিশেষজ্ঞ-নির্দেশ কাঙ্ক্ষিত কিন্তু মনের বেলায় এই অবহেলা কেন ?

আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনে সম্পর্ক সমূহের মহাসমুদ্রে দেহগত এবং দেহসর্বস্ব সম্পর্কের এলাকা তো খাল বিলের তুল্যও নয় ! প্রায় সবটাই মন-নির্ভর, মন-কেন্দ্রিক। সুন্দর জীবন, সুন্দর জগৎ তাই মনের দ্বারাই সম্ভব, মানসিক পরিশীলনেই বাস্তব হবার কথা। তাই যা সর্বাগ্রে দরকার তা মনের গঠনকে সুন্দর করে গড়ে তোলা, প্রতিন্যাসের অনুশীলন ঘটানো, মনের গভীরতাকে উপলব্ধির চেতনায় জাগ্রত করা। সব চাইতে বেশি আপন, বেশি সমীহ করার মতো যে মন তাকে অবহেলা করে আমরা ঝুঁকে পড়ি সাধারণতঃই যে অবাধ্য সেই শরীরকে নিয়ে। শরীর তো রোগের আর ভোগের বাসা ; ক্ষণস্থায়িত্বে বিধিবিড়ম্বিত। সুন্দরের আসন সেই চঞ্চল শরীরকে দিয়ে আমরা শূন্য আঁচলে গিঁঠ বাঁধি কেন ? মন তো মানুষের আজীবন সম্পদ, সম্বল ; দীর্ঘ স্থায়িত্বের পরোয়ানা নিয়ে সে সদাই আমাদের সঙ্গী। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে আনন্দে বিষাদে যে মন আমাদের একেবারে আপন, অন্তরের নিধি, সেখানে কেন আমরা সুন্দরের আসনটিকে পেতে নিয়ে আরাধনায় মগ্ন হই না ?

এই প্রশ্নটি সময় থাকতে মনে আসে নি, সময় পার করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক, সকলের ক্ষেত্রেই এমনটিই হয়। ছোটবেলা থেকেই শরীর আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুটিতে থেকে থেকে কেন্দ্রটিতে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অসুখ-বিসুখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাটা-ছেঁড়া, ভাঙ্গা-মচকানো দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ-এটা কাল-ওটা এ'তো শরীরের লেগেই থাকে। তাই আমরা নিজেরাও যেমন সদা সর্বদা দেহ-গত হয়ে বড় হতে থাকি, আমাদের অভিভাবকরাও তেমনি শরীর নিয়েই প্রশ্ন করেন, ব্যস্ত থাকেন। জন্মের পর থেকেই তো ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-পথ্য, গরম-লাগা ঠাণ্ডা-লাগা, নানান রকমের নরম-শক্ত রস-রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা টানা-হ্যাঁচড়া চলতেই থাকে। ওজন না-বাড়লে দুশ্চিন্তা, বেশি বাড়লেও চিন্তা ; হাড় জিরজিরে পেট-জোড়া পিলে

নিয়ে আমরা অনেকেই বড়দের হেনস্থার একশেষ করে থাকি। তাঁরাও সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সব রকমের যত্ন-চেষ্টা দিয়ে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে সর্বস্ব পণ করে বসেন। কিন্তু এই সবের মধ্যে কখনও মনের প্রতি ওঁরা মন দেন কি ?

মনোবিজ্ঞানীরা যে বার বার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘোষণা করছেন প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে যায়, তার মনের গঠন, গতি-প্রকৃতি, প্রতিন্যাস প্রতিবন্ধকতা, তার প্রত্যক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এ-সবই যে এই স্বল্প সময়ে ভিত পেয়ে যায়। সে কথায় আমরা কজন কান দিই, দিয়ে থাকি ? শরীরকে নিয়ে তুলকালাম চলতে থাকে বলেই কি শিশুর মনের দিকে নজর দেবার সময় পাই না ? শরীর থাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষে, তাই তাকে এড়ানো যায় না ; আর মন থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অনুমানের জগতে, তাই সে তখন ফেলনা হয়ে থাকে। যা দেখতে পাই সেই হিমশৈলের একদশমাংশ নিয়ে ব্যস্ত থেকে 'টাইটানিকের' মতো আমরা, অভিভাবকরা, অন্ধের মতো. ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাই না তো ? যে মন ভিতরে ভিতরে অদৃশ্য ভাবে সচল, সংগঠনে ক্রমে ক্রমে সবল হয়ে চলছে, যে মন সকলের অজ্ঞাতে সব কিছুকেই দেখে-শুনে বুঝেসুঝে পুষ্ট হয়ে উঠছে, যে মন নিশ্চিত ভাবেই ভবিষ্যতের গতিকে বর্তমানের সুপ্ত সম্ভাবনা করে স্ববক্ষে ধারণ করে চলেছে, সেই মনের দিকে নজর না দেওয়ার বিষময় ফল যখন সোজাসুজি আমাদের সামনে তাকাবে তখন ? আধুনিক মনোবিশ্লেষকদের মতে মনের ত্রিস্তর কর্মজগৎ এবং ত্রি-পর্ব সাংগঠনিক উপাদান এই শৈশবেই তো তৈরি হতে আরম্ভ করে। সংকীর্ণ এবং অপরিকল্পিত ভিত্তির উপর আমাদের প্রায় সকলেরই ভবিষ্য-জীবনের পরিকাঠামোটি তাই অস্থির দাঁড়িয়ে থাকে, টলোমলো করে আর নানা প্রকারের অবদমন, ভয়, আশংকা আর অনিশ্চয়তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। মনঃ সমীক্ষকের কাছে যাবার অভ্যাস বা সংস্কার আমাদের গড়ে ওঠে না বলে আমরা ডাক্তার-বদ্যির কাছে ছুটো-ছুটি করি বন্ধ্যাফসলের বোঝা বাড়িয়ে তুলি আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অনিবার্যকে সোজা সামনে দেখে আঁতকে উঠি।

শৈশবের শিক্ষার কথা বলেছি, মনোবিজ্ঞানীদের কথার জের ধরে ; যে শিক্ষা পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তা প্রধানতই আবেগের এবং বাসনার এলাকায়। বুদ্ধির এলাকা ষোল বা আঠারো পর্যন্ত প্রসারিত। বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা শিশুমনের যাবতীয় ব্যায়ামানুশীলনের দায় শিক্ষকদের হাতে তুলে

দিয়ে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, বাঁচতে চাই। তখন থেকে শিশুর পোশাকের দিকে যতটা নজর দিই ততটা মনের গতির দিকে নয়: খাতা-পত্র-বই যতটুকু উলটে-পালটে দেখি ততটুকু দেখি না মনের পাতা-পত্র-পল্লব অনুসরণ করে; 'প্রগ্রেস রিপোর্টের' দিকে যতটা তীক্ষ্ন নজর রাখি তার একাংশও রাখি না মনের 'প্রগ্রেসের' প্রকৃতি অনুধাবনে। বাড়ি ও স্কুলের মধ্যে যাতায়াতের বাহনটির জন্যে থাকে আমাদের বিশ্লেষণী নির্বাচন, বাহিতের মন কোথায় এবং কিভাবে চলাচল করে সেদিকে একেবারেই দৃষ্টিহীন থাকি। আমাদের সবই দেহ-গত, দেহ-কেন্দ্রিক, দেহ-সর্বস্ব। মনে আমাদের মন নেই, মনের অনুশীলন-পরিচালনে আমাদের জাগ্রত প্রহরা অনুপস্থিত। এটা আগেও বলেছি, আবার বলছি।

তাই হঠাৎ হঠাৎ আমরা আমাদের সন্তানদের দেহ-গত চেহারা চিনে নিতে পারলেও মনের দিক থেকে অচেনা ঠেকে। ওদের শরীরকে অনুসরণ করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ ওদের চেহারা দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি। শরীরে আর মনে যে সন্তান সমগ্র হয়ে উঠছে তার একটির হিসেবের খাতা আমাদের সামনে থাকে, অন্যটির সুপ্ত অন্তঃসলিলা প্রবাহে আপন মনের গহনে বেড়ে ওঠে। তাই হঠাৎ হঠাৎ বিস্ময় আর অচেনা লাগে। একটু কান পেতে রাখা, একটু পথ নির্দেশ, একটু অনুসরণ এই বিস্ময়কে, এই অচেনার বেদনাকে কমিয়ে দিতে পারে। সেটাই বা কম কি?

শরীরের ব্যায়াম এবং চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ব্যায়াম আর চর্চা বেশ ভাল কথা; তার চাইতে বেশি জরুরী কথা মনের ব্যায়াম, অনুশীলন আর চর্চা করানো। দেহের গঠন আর সাজসজ্জা আত্মতুষ্টি এবং অপরের দৃষ্টিস্তুতির কারণ; মনের গঠন আর পরিশীলন নিজের জন্যে, পরিবারের জন্যে এবং সমাজের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। জীবনের ছোট-বড়ো নানাক্ষেত্রে মনের সঙ্গে মনের ছোঁয়ায় যে স্ফুলিঙ্গ, যে অগ্নুদ্গার, যে অবনিবনা, যে সংঘর্ষ, যে অসহ্য সংঘাত সে সবই তো মনের অনুশীলনের অভাবে, দৃষ্টিভঙ্গির রূঢ়তায় ঘটে থাকে, শরীরের জন্যে ঘটে না। ঘর-সংসারকে ফার্নিচারে শ্রীময় করার চাইতে নিজ-নিজ মনের-দেউলকে 'ফার্নিশড্' করে তুললে অনেক বিপত্তি কমে যায়। দেহকে যদি সুন্দর করে তুলতে হয় তাহলে মনকেও সুন্দর করে তুলতে হবে; অধিকন্তু মনকে মননশীল করেও গড়ে তুলতে হয়। মন সুন্দর মননে। শীলনেই মন শ্রীময়।

॥ ভুলো মন ॥

আমাদের সকলেই অল্পবিস্তর ভুলো মন; ভুলে যাওয়াটা মনের ব্যাপার, স্মৃতির পাত্রাপাত্র জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। ভুলে যাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনে, আনতে পারে। আবার অনেক সময়ে ভুলে থাকাটা মনের স্বাস্থ্যের জন্যেও অত্যন্ত প্রয়োজন। ভুলতে পারার যেমন বেদনা আছে, তেমনি ভুলতে না পারারও যন্ত্রণা আছে। অনেক বড় বড় ঘটনা আমরা বেমালুম ভুলে যাই,—ভুলে যাই তাদের সন-তারিখ অনুপুঙ্খ পরিবেশ-পরিস্থিতি। আবার অনেক ছোট ছোট ঘটনাকে একেবারেই ভুলতে পারি না। ভুলে যাই রেল-দুর্ঘটনা, বন্যার তাণ্ডব, দাঙ্গার বীভৎসতা, কিন্তু ভুলতে পারি না কোনও এক অকরুণ মৃত্যু, একফোঁটা চোখের জল, একটি শিশুর জন্মমুহূর্তটুকু।

আমাদের সকলের জীবনেই ঘটনার ঘনঘটা কখনও কালবৈশাখীর দৃপ্তগতিতে ধেয়ে আসে, সব কিছুকেই ওলটপালট করে দিতে চায়, তীব্র আঘাতে আর তীক্ষ্ন তেজে আমাদের অস্তিত্বের ভিত পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায়। আবার কখনও মন্দাক্রান্তা ছন্দে ঢেউএর পরে ঢেউ হয়ে জীবনের প্রবাহকূলে নিতি নিতি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে থাকে, দাগ ফেলে ফেলে আবার মুছে মুছে দিয়ে যায়। তাছাড়া আছে গতানুগতিক জীবন-চলন; ঘটনা নেই, ঘটনার ঘনঘটা নেই, ঢেউ নেই, ঢেউএর চিহ্নও নেই, আছে কেবল দিনগতপাপক্ষয়, এক-দুই-তিন-দুই-এক এর আহ্নিক-চলন, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় এর একঘেয়ে চক্রপিণ্ড যান্ত্রিকতা। এই সব নিয়েই তো আমাদের জীবন, জীবনের অভিজ্ঞতা। এদের কাউকেই মনে রাখার দায় আমাদের নেই, থাকে না। আমরা তবু মনে করে রাখি সময়গুলোকে, পর্যায়গুলোকে; পর্বে পর্বে বিভক্ত আমাদের জীবনের এক একটা পরিচ্ছেদ হিসেবে এরা মনের কিছুটা স্থান দখল করেই রাখে।

ঘটনার মূল্য আছে ঐতিহাসিকের কাছে, সমাজবিজ্ঞানীর মনে, বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। আমরা সাদামাটা অত্যন্ত সাধারণ জন; আমাদের জীবনে ঘটনার গুরুত্ব ঘটনার ঘটমানতার কালেই সীমাবদ্ধ। ঘটনার কার্যকারণে আমাদের অনুসন্ধান নেই, নিকট-বা-দূরবর্তী ফলাফল নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যে বৈশাখী ঝড়ে আমাদের ঘর ভাঙ্গে, প্রিয়জনের কালান্ত হয়

অথবা গৃহাঙ্গনের দীর্ঘ-সম্বন্ধ বৃক্ষটি আমূল উৎপাটিত হয়, সেই বৈশাখ আমাদের মনের গভীরে স্মরণের দাগ কেটে যায়। তেমনি করেই আমরা ভুলতে পারি না যেখানে যেখানে এবং যখন যখন আমাদের আমিটুকুর মূলে গভীর কোনও আঘাত, তীব্র কোনও অনুভব, তীক্ষ্ম কোনও আনন্দ-বেদনা আছড়িয়ে পড়ে। ও-পাড়ার শ্রীধরের মৃত্যু দিনটি আমাদের মনে থাকে না কিন্তু কখনই ভুলতে পারি না আমাদের পোষা মিনিটির মৃত্যুক্ষণটিকে। সকলেরই জন্ম দিন আছে, সে সব আমাদের মনে রাখার দায় নেই; কিন্তু আপনজনের জন্ম দিনটি আমাদের নখ দর্পণে ধরা থাকে। আপনজন বলতে সম্পর্কের সূত্র বোঝায় না, অন্তরের প্রীতি-কে নির্দেশ করে; অনেকেরই তো 'চলন-বাঁকা' বলে আমাদের মনে হয় কারণ তাদের 'দেখতে নারি'; আর যাদের দেখতেই শুধু পারি তাই নয়, না দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার দেখি, তাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়-ব্যাপারগুলোও কেমন তরতাজা হয়ে নয়নের সমুখে উপস্থিত থাকে।

কে যেন বলে ছিলেন, ফুল সুন্দর ফুলের গৌরবে নয় দর্শকের দর্শন মাধুর্যে, সৃষ্টি মহান সৃষ্টিতে নয় দর্শকের মূল্যায়নে। স্মরণ আর বিস্মরণের ভুলভুলাইয়া-চক্রেও তেমনি। ঘটনার স্মরণে ঘটনার কৃতিত্ব নেই আছে মূল্যায়নের তাৎপর্যে, বিষয় স্মরিত হয় বিষয়ের স্বরূপজ কারণে নয়, বিবেচকের মনের নিকষে। ভুলে যাওয়া বা ভুলতে না-পারাটা তাই মনের কারসাজি, কারিকুরি।

লেখাটা নিয়ে বেশ আনমনে এগিয়ে চলেছিলাম হঠাৎ সামনে যুদ্ধং-দেহি দ্বিপক্ষ-উপস্থিতি যথেষ্ট শংকিত করে তুলল। একপক্ষ বিজ্ঞান—বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান অন্যপক্ষও বিজ্ঞান—মনোবিজ্ঞান। লেখক যান কোথা? আসর ছেড়ে দিয়ে দর্শক হয়ে পাশ কাটালাম। ওদের যুদ্ধ ওরা লড়ে নিক!

গোয়েবলস্ থেকে আরম্ভ করে পামলিভ, বটতলার ছাপাখানা থেকে গল্ফ-গ্রীন, ট্রেনের দেয়াল থেকে শুরু করে দৈনিকের পৃষ্ঠা পর্যন্ত সর্বত্রই তো চেপে ধরে মনে রাখানোর ব্যবস্থার মহাকর্মশালা ছড়ানো। তাতেও কারো সন্দেহ থাকতে পারে যে মনে রাখাটা মনের ব্যাপারই নয়, ইন্দ্রিয়গুলোকে বিষয়ের বোমা মেরে মেরে টনটনিয়ে যথাসময়ে জাগ্রত করানোর ব্যাপার মাত্র? তুমি কি বিশ্বাস করবে, কি মনে রাখবে, কি তোমার মনে রাখা উচিত তা সবই তো বাইরে থেকে বিজ্ঞাপনদাতারা স্থির করে দেবে। তুমি কে হে শ্রীযুক্ত পাল? তোমাদের মনের সব মাঠটাই তো আমাদের—বিজ্ঞাপনদাতাদের—ইজারা দেওয়া;

আমরাই সেখানে মনে রাখার আর ভুলে যাওয়ার, মনের সামনে তাজা রাখার আর মন থেকে সরিয়ে দেবার চাষ করে চলেছি। ইচ্ছে করলেই কি তুমি অন্য কোনও মনে-রাখা-ভুলে-যাওয়ার' বীজ বুনতে পার, না, ফসল তুলতে পার? আমাদের পণ্য তোমার কাছে অনিবার্য, বিজ্ঞাপন লাঞ্ছিত, পরম গতি। তোমাদের অনুভবে আর appreciation-এ ফুল সুন্দর? একেবারেই বাজে কথা; আমাদের হাতে ফুল সুন্দরই শুধু নয়, কাঙ্ক্ষিতও বটে। সে ঘেঁটু ফুলই হোক আর শিয়ালকাঁটাই হোক। আমরাই প্রতিভার হাত; আমরা যাহা কিছু স্পর্শ করি তাহাকেই সজীব করে তুলি [সজীব = বিক্রয়যোগ্য]। সুতরাং উদ্ধৃত ভুল ধারণা ভুলে যাও: বিচারকের মনের নিকষ নয়, বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্যের, Trading account-এর, নির্দেশে বিষয় মনের সামনে, নয়নের সমুখে দপদপ করতে থাকবে, কখনও চৌরঙ্গী হয়ে কখনও পার্কষ্ট্রিট হয়ে। এটাই নির্যাস।

মনোবিজ্ঞান-পক্ষ মিটি মিটি করে চোখের সরু কোণ দিয়ে এতক্ষণের বাগ্মিতা পরখ করছিলেন। এবারে মাঠে নেমে পড়বেন: সব বাজে কথা, অহংকারের কথা; আসল কথা অবচেতন, অবদমন অপূর্ণ-বাসনা। আমাদের ভুলো মন, আমাদের ছোট-বড় সব বিস্মরণই আমাদের অপূর্ণ বাসনা-কামনার অবদান। আমরা ভুলে যেতে চাই বলেই ভুলে যাই, মনে রাখতে চাই না বলেই মন থেকে হারিয়ে ফেলি। মনে রাখা-না-রাখার ব্যাপারটা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভোগ্যপণ্যের জগৎ আর মনোজগতের বিষয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে মনে করে রাখার কোনও দায় থাকে না; প্রয়োজনের সময় দোকানের কাউন্টারে দাঁড়ালে চেতনার স্তরে স্তরে তোমাদের ঢাকের—বিজ্ঞাপন জয় ঢাকের—আওয়াজ রিণ্ রিণ্ করে বাজতে থাকে। সেই বাজনায় সঙ্গত দেয় দোকানদার নিজে, তার লাভ-লোকসানের চট্-জলদি হিসেব-নিকেশ, আর ক্রেতার মানসিকতা, চোখের দৃষ্টি, অর্থের সংস্থান। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে উপস্থাপনা, উদ্ঘাটন আর মনোনয়ন, Sugge tion, ego আর Satisfaction অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যায়, কাজ করে, আর মোড়কে লপেটা হয়ে করতলগত হয়।

মনোজগতে চলে অন্যতর টানাপোড়েন; যা ভাল লাগে না তা ভুলে যেতে মোটেই সময় লাগে না, যাকে পছন্দ করি না তার বাড়ি খুঁজে পাই না, যার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেই মনে বিরূপতার সুর বাজে তার নামটি পর্যন্ত মনে থাকে না। প্রায়শঃই যে আমাদের কলম পিছলে যায়, জিহ্বা হড়কায়—Slip of

the pen, Slip of the tongue—হয়, সে কি কলমের দোষে না জিহ্বার আড়ষ্টতায়? আমাদের অবচেতনের গভীরে জমে থাকা অবদমনের বুড়বুড়ি যথাসময়ে সচেতন মনের চলমান গতিপথে বাধার ফুসকুড়ি হয়ে স্মরণকে পিছলিয়ে-হড়কিয়ে দেয়। কথার সুতোয় আর লেখার গতিপথে এই সব জটপাকানো মুহূর্তগুলোকে সময় করে বিশ্লেষণ আর অনুসন্ধান করলে স্ব স্ব মনের ঘোঁটপাকানো চেহারাটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবার কথা। সে সময় আমরা ক'জনে পাই, ক'জনে সেই অনুসন্ধান করে থাকি?

চিঠিকে ডাকবাক্সে ফেলতে আমরা সকলেই এক একটি ভুলের monument; স্মৃতিস্তম্ভ, না বিস্মৃতিস্তম্ভ? চিঠি লিখতেও তাই, কেন এমন হয়? আমরা কি ডাকবাক্স দেখে চিনতে পারিনা বলে? চিঠি লিখতে চাই না কি ভাষার উপর দখল নেই বলে? একবারও কি ভেবে দেখেছি 'চিঠি'-ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে অতীতের অবদমন কতখানি অপরাধ-বোধে—guilt feeling-এ আমাদের চেতনাকে অবশ করে রেখেছে? কিশোর-কিশোরীদের তপ্ত মনের বুদবুদ-অনুভবগুলো পত্রের অনাবিল বক্ষে সহজেই প্রকাশের ভাষা পায়; সামনে যখন একের সঙ্গে অপরের দেখা হয়, পথের কোনও একান্ত কোণে, প্রবৃদ্ধ বটবৃক্ষের কোনও স্বল্প আড়ালে অথবা প'ড়ো বাড়ির শ্যাওলা ধরা আড়ালে তখন দৃষ্টি থাকে সচকিত, চোখ বাঙ্‌ময় কিন্তু কথা হারিয়ে যায়, শব্দের প্রস্রবণ-মুখটি উষ্ণ হৃদয়ের উত্তাপে বিবশ হারিয়ে যায়। তাই আমরা চিঠি লিখি, গন্ধ-নির্যাসে সেই চিঠিকে অধিকতর বাঙ্‌ময় করে তুলি এবং দেওয়ালের ফাটলে, ইঁটের দেহচাপে অথবা 'অবলা' ছোট ভাই-বোনের হাতে ঠিকানার পথমুখী করে তুলি, মাঝে মধ্যেই সেই চিঠি বেপথু, বেঠিকানা হয়ে উষ্ণ-হৃদয়ের দ্বারে না পোঁছে অভিভাবকের উত্তপ্ত-চিত্তের উনুনে রোষাগ্নি সৃষ্টি করে ফেলে। হৃদয়ের ভাপে ভরা সেই সব চিঠি বুদ্ধির চাপে তার সব রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য হারিয়ে আমাদের ভ্যাবাচাতে থাকে। প্রায়শই সেখানে শেষ হয় না; পৃষ্ঠে বোমাবর্ষণ, কর্ণের ক্লিষ্ট আকর্ষণ এবং খিল আঁটা ঘরে লোহার গরাদের আড়ালে নির্বাসন, পত্র-লেখা জীবনের কৈশোরটুকুকে দলিত-মথিত করে তোলে। তার পর? 'চিঠি' কি আমাদের মনে আকাশের নীল আর বনের সবুজ বয়ে আনবে? অবচেতনের বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে সচেতনে ঢেকুর তুলবে না?

একটা সম্ভাব্য কারণকে সবিস্তারে বলা গেল। আরও কতো রকমের ঘটনা আমাদের ফেলে আসা জীবনে খুঁজলে পাওয়া যাবে। সবই এই চিঠিকে বা

পত্রলেখাকে কেন্দ্র করে। স্কুলে চিঠি লিখতে গিয়ে দিদিমণির কর্ণমর্দণ, মাসিকে চিঠি লিখতে মায়ের নির্দেশের অমান্য করলে ফলশ্রুতি এবং ইত্যাদি। কেউ ফেলনা নয়, কেউ হারিয়ে যায় না। শুধুই জড়িয়ে যায়।

সাফল্যের চাইতে বড় সফলতা নেই, বিফলতাই সব চাইতে বড় বিফলতা। মনের যদি কোনও আদ্যোপান্ত ইতিহাস লেখা যায় তাহলে ভুলোমনের রূপ-রেখাটিও সাদি-সান্ত রেখাচিত্রে ফুটে উঠবে। কারো ইতিহাস, ইতিহাসের সন তারিখ, স্থানকাল পাত্র সবিস্তার মনে থাকে; কেউ বেমালুম ভুলে যায়, কিছুটি মনে থাকতে চায় না। একই ব্যাপার কারো অঙ্কে কারো ইংরেজীতে কারো বা ভূগোলে। ছোট বেলায় গৃহ-গুরু অভিভাবক বা গৃহ-শিক্ষক ছাত্র বন্ধু যে বিষয়ে অকারণ রক্তচক্ষু, বেত্রহস্ত হয়ে থাকেন, বিষয় অনুসরণের চাইতে কর্ণাকর্ষণের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়েন, ছাত্র-ছাত্রী স্বভাবতই সেই সেই বিষয়ে ভুলের বোঝা টেনে টেনে এগুতে থাকে। এক সময়ে তারা সকলেই নিজ নিজ মনো জগতকে এক একটি পরিষ্কার শ্লেটের—tabula rasa—মতো, বিষয়ের ছাপ-ছোপহীন করে পেয়ে যায়। তারা তো চেষ্টা করে প্রতিশোধ নিতে, ভোলে না—চেষ্টায় স্মরণ ঘটে, ভোলাটা জমে না একেবারেই—আবেগের চাপে—blocking এর জন্যে নিশ্চিহ্ন ভুলে যায়। আক্রান্ত বিষয় তাদের মনকে আক্রমণ করে, হৃদয়কে কুয়াশাছন্ন করে তোলে আর বুদ্ধিকে তছনছ করে দেয়। আর যে বিষয় ভাল লাগে, সফলতা ঝরনার মতো ঝরে পড়ে, সেই বিষয়ে সাফল্যও সহজ-স্বাভাবিক মনের ঘাটে নাও ভিড়ায়। বিফলতা ভুলো মনকে বেশি বেশি করে ভুলিয়ে দিতে থাকে, বিফলতাকে পাহাড় প্রমাণ করে তোলে। রক্ত-চক্ষু রক্ত চক্ষুকেই স্মরণ করার, বিষয়কে কুলোর বাতাসে ভাসিয়ে দেয়; কর্ণাকর্ষণ কর্ণেরই পীড়া ঘটায় মনের শ্লেটে বিষয়ের রেখাপাত ঘটাতে পারে কি? আজকাল যে বেত তুলে দেওয়া হয়েছে সে তো এই কথা ভেবেই যে বেত্রাঘাত চর্মআবরণেই রেখাপাত ঘটায় মনের পর্দায় বিষয়ের ছবি আঁকে না।

বড় বেলায়, জীবনের স্কুলে, এই সব অভিভাবকরা নানাবেশে, নানা নামে ছড়িয়ে আছেন; জীবন-বন্ধুরা সর্বত্রই কাছেপিঠে অবস্থান করেন। বড়-সাহেব ছোট-সাহেব, বড়বাবু-ছোটবাবু, লেনদার-দেনদার, মুরুব্বী-মহাজন, অডিটর-একাউন্টেন্ট এবং বড়দা-মেজদা, খুড়ো-জ্যাঠা, বাবা-কাকা—আরও কতো নামে, কতো স্থানে, কতো ভাবে জীবনের অভিভাবক-মাস্টার হয়ে এঁরা প্রতিনিয়ত আবেগীয় আঘাতে স্মরণের পথকে block করে চলেছেন। অপরের দৃষ্টিভঙ্গি,

অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সময় নেই এঁদের। নিজ নিজ সিদ্ধান্ত আর নীতিবোধ অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে পারলেই এঁরা সফল বলে মনে করেন। যত গণ্ডগোল তো এখানেই। মন মানে না, বিদ্রোহের শিকড়ে জলসেচ ঘটে যায়, প্রতিবাদ মুখে এলেও মুখর হয় না সব সময়ে; তাই পাওনা বুঝে নিতে মনের গভীরে মুখ লুকিয়ে অপেক্ষা করে সুযোগের। ভুলো মনের গোলকধাঁধাটি তৈরি হয়ে যায়। স্মরণের রেখা গুলো অবচেতনের বুদবুদে ফেটে ফেটে যায়, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। দোষ পড়ে মনের; ইতিহাসটুকু হারিয়ে যায়।

মনে না থাকা ব্যাপারটা কিন্তু ভুলো মন থেকে আলাদা, আবার অন্যমনস্কতাও স্বতন্ত্র। এদের তফাৎ গুলো এমন সূক্ষ্ম নয় যে আছে কি নেই তাই বোঝা দায় হয়ে পড়বে। মনে না থাকাটা প্রধানতই কাঁচা মাথার কাজ। বয়স দিয়েই যে কেবল মাথার কাঁচা-পাকাত্ব স্থির হয় তা নয়; সেটা ঠিক হয় অভিব্যক্তির ধারায় মাথার মধ্যের ঘিলুটুকু কতটা ভার ও ধার পেল তার নিরিখে, CNS, neurone, synapse ইত্যাদি জটিল জালের সংখ্যা-পরিমাণ ও কর্মক্ষমতায়; মনে রাখা ব্যাপারটা তাই মস্তিষ্কের কাজ, ভুলো মন কিন্তু তা নয়। এটা মানুষের মনের কারসাজি। মনকে বিষয়ের সঙ্গে যথোপযুক্ত ভাবে যোগ করে গ্রহণ না করার ফলশ্রুতি হিসেবেই ভুলো মন মনের মধ্যে বাসা বাঁধে; যখন আমরা দেখি কিন্তু দেখি না, শুনি কিন্তু শুনি না, করি কিন্তু করি না—এমনি করে ২রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনকে যথাযোগ্য স্থান দিই না তখনই নৈয়ায়িকরা আমাদের প্রতি আঙুল তুলে বলে দেবেন যে প্রত্যক্ষটিই হল না। সব ইন্দ্রিয়ই একা একা, কেবলমাত্র মন-ইন্দ্রিয়টিই 'দোকা' হয়ে প্রত্যক্ষকে নিটোল করে তোলে। মনঃসংযোগ কথাটা কথার কথা মোটেই নয়; আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কবি হওয়া যায় না, মনটিকে সেই আকাশের নীলের পাশে পাশে, পেঁজা-তুলো মেঘের রৌপ্যরেখার ধারে ধারে সচল করে সংযুক্ত করতে হবে। আর এটা যখন হল তখনই মনের গভীরে কাব্যের কুঁড়িটি মন মাতানো সৌন্দর্যে অভিসিক্ত হয়ে প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে। ভুলো মনের মালিকরা কখনই ইন্দ্রিয় সকলের স্বাধীন গতিবিধির সঙ্গে নিজ-নিজ মনের গাঁটছড়াটি বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখেন না, তাই ভুলে ভুলে ভুলোমনা হয়ে দেখা দেন। আবার এঁরাই জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দড়ি-দড়া শিকল-কাছি দিয়ে এমন করে আপন করে রাখেন যে কিছুই আর ভোলেন না। মা কবে কোন অতীতে

ভাই বোনের মধ্যে পক্ষপাত দেখিয়ে ছিলেন, পিতলের ঘটি-কলসী নিয়ে বড়দা ছোটদাকে কি বলেছিলেন অথবা নবাগতা ভ্রাতৃবধূকে দেখে ননদিনী রায় বাঘিনী কেমন করে তির্যক তাকিয়ে ছিলেন এসবের এক কণাও হারিয়ে যাবার সুযোগ পায় না, দিন যতই না পার হয়ে যাক। একথা ভুলো মনের মালিকদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই বলতেই হয় যে ভুলো মন মনেরই দায়।

অন্যমনস্কতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকমের, অন্য-মনস্কতার। মহাবিজ্ঞানী ডিমের বদলে ঘড়িটিকে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে দিয়ে আনমনে সময় দেখেন বাঁহাতে ধরা ঘড়ির বদলে ডিমের অচিহ্নিত ডিম্বাকৃতি দেহে। চোখ পড়ে আছে অদৃশ্য কাঁটার ধীর গতি চলনকে অনুসরণ করে, মন পড়ে আছে idea-র কোনও গভীর তালাশে। এখানে একটা one to one বিষয়-পরিবর্তন ঘটেছে; আকার-প্রকার এই reversal-কে পুষ্টি যুগিয়েছে মাত্র। সাগর-প্রমাণ বিদ্যা ও হৃদয়ের অধিকারী অনায়াসে লাঠিটিকে বিছানায় শায়িত রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাত কাটাতে পারেন। ব্যাপার-স্যাপার প্রায় একই রকমের। বিষয় বা বস্তুর functional reversal. এরা তন্ময়, তৎ-ময়, ধারণার জগতে গভীর ডুবন্ত; তাই বাস্তবের সঙ্গে তৎ-ময় হয়ে বিবিধার্থ বস্তুব্যবহারে মনস্ক হতে পারেন না,—কখনও কখনও, যখন যখন idea-র অতলে অন্য-মনা অবগাহনে মত্ত থাকেন। আবার দেখুন মাথার মধ্যে শত-সহস্র কীটের দংশনে সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী 'বাথটব' থেকে কেমন অবলীলায় দিগম্বর, দিগ্‌বসন হয়ে ছুটে আসেন 'পেয়েছি, আমি পেয়েছি' বলে। এরা সকলেই অন্য-মনস্ক, কেউই অন্ন-বস্ত্র-বস্তু-মনস্ক নন। এবং এই অন্যমনস্কতা, এই অন্যের প্রতি আকর্ষণ এতই প্রবল যে স্থান-কাল পাত্রাপাত্র বোধ হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানী-মহাজনেরাই যে অন্যের দ্বারা মনস্কতা হারাতে পারেন তা কিন্তু একেবারেই নয়। আমরা, অত্যন্ত সাদামাঠা mortals রাও, প্রায়শই অন্য-মনস্ক হয়ে যাই। দুঃখ এখানে যে কোনও গতিসূত্রের পিতৃত্ব আমাদের অমর করে না, কোনও সাগর-সম্ভব অভিধা আমাদের নামের পিছনে যুক্ত হয় না অথবা বিজ্ঞানের ইতিহাসে উদ্ভাবক হিসেবে চিরায়ত হবার সুযোগ ঘটে না।

সে সুযোগ না ঘটলেও অন্য অনেক কিছুই আমাদের কপালে জোটে যা আমরা চাই না, আশা করি না। কবি সাহিত্যিক দার্শনিকরা অন্যমনস্কতার প্রবাদপুরুষ। তাতে তাঁদের দোষ নেই। ওঁরা সত্য-সুন্দর-শিবকে নিয়ে মনস্ক হবেন, চাল ডাল তেল নুনের হিসেবে মন দেবেন না, এটা যেন স্বতঃ-সিদ্ধ বলে ধরেই নেওয়া আছে। আমরা, 'ইতর'-জনেরা, সাধারণ জনেরা, যদি সেই

সত্যের সন্ধানে মনস্ক হয়ে গৃহ-ত্যাগ করি তাহলেই লেগে যাবে হুটোপুটি, থানা-পুলিশ ; আর ধরে আনতে পারলে ? সত্যসন্ধ হবার পুরস্কার হাতেনাতে পিঠে-কানে অঝোরে বর্ষিত হবে। যদি সুন্দরের আকর্ষণে অন্য মন হলাম তাহলে লেগে যাবে ধুন্ধুমার—লরী বা বাসের চাকায় পিষ্ট হব, অথবা পাড়ার ছেলেরা ওপারে পার করে দেবে। সাহিত্য-সম্রাট সুন্দর-মুখের জয় সর্বত্র বলে ঘোষণা করেছেন ; তাতে তাঁর কোনও ইতর-বিশেষ হয়নি। আমরা যদি কখনও সেই সুন্দর মুখের টানে কদম কদম এগিয়ে চলি, এমন কি স্ত্রী সঙ্গে থাকলে যদি দু'বারের পর তৃতীয় বার সুন্দর-সুধা পান-মানস হই, তাহলেই অনর্থ। অন্যমনস্ক হতে হলে আমাদের তাই অনেক অন্য বিষয় ভেবে চিন্তেই তা করতে হয়।

এখন ভুলো মনের ফাঁদ এড়িয়ে, মনে থাকেনা-র বেড়া পার হয়ে এই লেখাটা সঠিক স্থানে পৌঁছে দিতে পারি তবেই সর্বরক্ষে ; মাঝ পথে অন্যমনস্ক হয়ে কোথায়ও হারিয়ে গেলেই সর্বশান্তি।

॥ ভুলের হিসেব ॥

মোহনায় দাঁড়িয়ে নদীকে পরিষ্কার দেখা যায়, চেনা যায়। সামনে মহাসমুদ্রের ডাক, পিছনে দীর্ঘ বহমান ইতিহাস। এই বহমানতার অভাব নদীকে মানুষ থেকে আলাদা করে দেয়, আমাদের অতীত বহমান থাকে না, পথ ও গতি পরিবর্তনের সুযোগ নদীর মতো মানুষের ক্ষেত্রে সত্য নয়। আমরা একে একে সকল পর্ব-পর্যায় পার হয়ে হয়ে শেষ হয়ে যাই, শেষের মহাগতির মহাসাগরে হারিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করি। নদীর সেটা ললাট লিখন নয়; সে সদাই জীবিত, জাগ্রত, চলমান; তার প্রতিটি বর্তমান বিন্দু সমগ্রের প্রবাহে-আহ্বানে প্রাণময়। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর জীবনে ভুলের কাঁটা নেই; যদিই কখনও ভুল করে বি-পথু হয় তাহলে নিজের বহমান সত্তায় সে সেই ভুলের সংশোধন করে নিতে পারে, সময় নষ্ট করে না। আমাদের জীবনে ভুলগুলো কাঁটা হয়ে স্মরণের সরণীতে, মোড়ে মোড়ে বাঁকে বাঁকে, যন্ত্রণার ছোট ছোট monument হয়ে জীবনের ছবিটাকে অমসৃণ করে তোলে। আমাদের প্রত্যেকের মোহনা জীবন এই স্মৃতি-স্তম্ভ গোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সামনেটা হারিয়ে যাবার মহাভূমি, মহাসাগর; পিছনের আমরা প্রত্যেকেই এক একটি হিসেবের খাতা, Trading and Profit & Loss Account কষতে কষতে পাতা ওল্টাই আর লাল-নীল-সবুজ পেন্সিলের দাগ কাটি, আঁক কষি, debit-credit এর ধারাপাত নিয়ে মশগুল হই। এটা বিধি-লিপি না অস্তিত্বের ফলশ্রুতি?

কখন থেকে আমরা ভুল করি? কখন বুঝি যে আমরা ভুল করেছি? শৈশবে আমরা ভুল করি না, ভুল বুঝিও না। কিশোর-তরুণ-যুবক অবস্থায় আমরা কেউই ভুলের সুতোয় জড়াই না নিজ নিজ জীবনকে। উত্তর-যৌবনে প্রথম আবছা আবছা ভুলের ছোট ছোট চেহারাগুলো চেতনায় ধরা পড়ে; সঠিক মূল্যায়ন তখন করা হয়ে ওঠে না। করা হয়ে ওঠে না তার কারণ বোধ হয় প্রবাহের গতি, মনের জোর আর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গঠনের যোগ্যতা। প্রৌঢ়ত্বে প্রথম Note Book খুলে বসি, বার্ধক্যে মেলে বসি account sheet. মনে হয় সময়ের sand-glass এ যখন প্রথম জীবনের প্রাণ প্রাচুর্য, জীবনী শক্তি এবং ভবিষ্যৎ ঊর্ধ্ব-প্রকোষ্ঠে জমা থাকে তখন ভুলের অনুভব ঝরে পড়তে সময় পায় না। আর মধ্যজীবনে ঊর্ধ্ব-অধঃ প্রকোষ্ঠদ্বয় যখন সমানে সমান হয়ে দেখা দেয় তখন অতীত

আর ভবিষ্যৎ আধাআধি ভাগ হয়ে অতীত-কে গাঢ় করে তোলে আর ভবিষ্যতকে ক্রমশ ক্ষীণ করে ফেলে। ভবিষ্যতের এই ক্রমশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাওয়ার সময়টা তাই আমাদের বেদনার কারণ হয়ে দেখা দেয়। আর তার পরে নিম্ন প্রকোষ্ঠ যতই পুষ্ট হতে থাকে, অর্থাৎ উপরের, সামনের আর ভবিষ্যতের ভাগে অনবরত টান পড়তে থাকে তখন আমরা সকলেই hour-glass থেকে চোখ সরিয়ে হিসেবের পাতায় মন দেই। নিচেটাই তখন বেশি আপনার বলে মনে হয়, অবশিষ্ট আর তেমন করে টানতে পারে না। সময় থাকতে চাষ করলে মানব জীবনে সোনা ফলত; সময় থাকতে সময়ের কদর করা হয় নি; সকলই বিফলে গেল—আক্ষেপ আর অনুশোচনার জ্বালা দীর্ঘশ্বাস হয়ে তখন সেই hour-glass-এর শূন্য অংশকে ভারি করে তোলে। যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি জীবনের জমিতে ফসলের সমারোহকে সম্পন্ন সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছেন তাঁরা জীবনের ধান কাটা সাঙ্গ করে যথেষ্ট পারানির কড়ি সংগ্রহ করে সনাতন জীবনেরই হাতে পুষ্ট account বইখানি তুলে দিতে পারেন। শত-সহস্র আমরা, যারা সময় কাটাই সময় নষ্ট করে, জীবনের চাষযোগ্য জমিকে উষর ফেলে রেখে, তারাই হা-হতোস্মি বলে নিজেরাই audit করতে বসি নিজ নিজ অতীতের জাবেদা খাতাখানা টেনে নিয়ে।

আর তখুনি একের পর এক ভুলের নথিগুলো চোখের সামনে নিজেদের মেলে ধরে। ইচ্ছেটুকু প্রকাশ করেও কেউ কিন্তু ঝাঁটা হাতে জীবনকে যথাযোগ্য বাসযোগ্য করে রেখে যেতে পারে নি; প্রথম পৃষ্ঠায় জন্ম মুহূর্তে ভুল; কেন যে সুইট্জারল্যান্ড বা আমেরিকায় জন্মালাম না, ভুল করে স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ডিত, দারিদ্র লাঞ্ছিত এই দেশে জন্মালাম এবং জন্মেই দেখতে হল ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি! অপত্যস্নেহ যেমন নিজের সন্তানকে সব থেকে সুন্দর দেখে, সব থেকে গুণসমৃদ্ধ দেখে, তেমনি আমরা মাতৃস্নেহে 'সব দেশের সেরা এ দেশ' বলে নিজেদের আত্মতৃপ্তির অনুসন্ধান করেছি। তাই একটু বেশি বয়স হতে না হতেই আমরা সাগর পাড়ে Home খুঁজি brain drain-এর শিকার হয়ে ছটফট করতে থাকি—যদি প্রাকৃতিক ভুলের সংশোধন সম্ভব হয়! যারা যেতে পারি তারা ফিরি না, ফেরার নামও করি না; যারা যেতে পারি না তারা মনে মনে প্রবাসী পরদেশী হয়ে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন আর টেলিভিশন-রেডিওয় চোখ-কান আটকে রাখি। ভুলের খেসারত দিতে মনে মনে আমরা সকলেই migrant জীবন যাপন করি।

এই original sin বাদ দিলে যা থাকে তা সবই আমাদের অর্জিত ভুল। যে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি সেটা যেমন ভুল, যেটায় পড়িনি, পড়তে পারিনি, সেও তেমনি ভুল। যে চাকরিটা পেলাম তার মাশুল দিতে দিতে জীবন কাবার, আর একটু অপেক্ষা করলে অন্য চাকরি একটা হতই। ভুল করে খুঁটো পুঁতে বসে গেলাম। এবারে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভুলটি করলাম বিয়ে করে, যাকে বিয়ে করেছি তাকে বিয়ে করে, মা-বাবার পছন্দের নিরিখে বিয়ে করে, আর জানাশুনো করে ভাব ভালবাসা করে বিয়ে করে বা না করে। আমরা বাড়ি করে ভুল করি, না করেও ভুল করি। জমি-জমা করে ভুল করি, না করেও ভুল করি। শরীর চর্চা না করে ভুল করি, খেতে খেতে ভুঁড়ি বাগিয়ে ভুল করি, পুত্র-কন্যার সংখ্যায় ভুল, লালনপালনে ভুল, মাস্টার নিয়োগ করে ভুল, না-নিয়োগ করেও ভুল। পাতার পর পাতা যতই ওল্টানো চলে লাইনের পর লাইন ধরে ভুলের Procession তেমনি পিল পিল করে ধরা পড়ে।

অতীত কালে তিন চার গণ্ডা ছেলে মেয়ের জনকজননী হয়ে যাঁরা ভুলের পরিমাণ জরিপ করতে দাওয়ায় খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে পড়তেন, তাঁরাই এখন একটি দু'টি নিয়েই হাড়-কালি হচ্ছেন শহর-আধাশহরের ঘেরাটোপে। পরিমাণ দিয়ে কি সব সময় ভুলের পরিমাপ সম্ভব? তাই সংসার চালাতে ভুল করে কাবুলীওয়ালা বা সুদখোর অফিসের পিওনের কাছে হাত পেতে অনেকেই তো মাটি খাওয়া কাজ করে বসেন, সুদ গোনা শেষ হয় না, আসল থাকে অগাধ সমুদ্রে। স্ত্রীকে চাকরির ঘানিতে জুড়ে দিয়ে সংসারের হাল ফেরাতে চাই; সেই সূত্রে জীবনের হালটি হারিয়ে বসি, পুত্রকন্যাদের চিনতে পারিনা এবং সব শেষে এক গোলকধাঁধায় পাক খেতে থাকি। এদিকেও হিসেবের ভুল ওদিকেও হিসেবে গড়মিল। স্ত্রীকে সংসার রজ্জুতে বেঁধে রেখে অর্থের অনটন ঘোচে না, বেড়ে যায় নালিশের পাহাড়; ওদিকে অন্তরের জ্বালা, এদিকে মনের অশান্তি। ওদিকে যদি লিপস্টিকের বহর তো এদিকে শুধু স্টিক। সং-এর সার সংসারে কি ভুল ছাড়া ফসলই জন্মে না?

লোকে বলে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল, অবিশ্বাস করে মানুষকে ছোট করার চাইতে। অথচ মজা এই যে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পুত্র-কন্যা যাকেই আপনি বিশ্বাস করবেন, যখনই বিশ্বাস করবেন, ধরে নিতে পারেন যে আপনি ভুল করবেন। আবার যদি অবিশ্বাস করেন তাহলেও তো ভুল এড়াতে পারবেন না। আমাদের প্রত্যেকেরই তো কখনও না কখনও এই আপসোস করতেই হয়: ওকে

বিশ্বাস করে ভুল করেছি, তাকে অবিশ্বাস করে ভুল করেছি। তাহলে?

এমন কি নিজেকে বিশ্বাস করেও তো আমরা ভুল করি, ভুল করে ফেলি! যে আত্মবিশ্বাসে ভর করে অপরের ঘরের চাবি নিজের হেপাজতে রাখি, ব্যাঙ্কের লকারে চাবি লাগাই, খাতায় সই করি, স্ত্রীর কাছে বুক-টানটান করে গর্ব করি, বন্ধু-বান্ধব-স্বজনকে 'কথা দেই', পরনারীকে সাহায্যের হাত বাড়াই, পুত্রকন্যাদের অংক ইংরেজী দেখিয়ে দিতে যাই, সেই আত্মবিশ্বাস বাস্তবের কষ্টি পাথরে কখনও যাচাই করে নেওয়া হয় কি? তার ফলে কখনও মাথা হেঁট করতে হয়, কখনও খেসারত দিতে হয়, কখনও দেওয়া কথার খেলাপ হয়ে যায়। আবার সাতপাকের বাঁধন ছিন্ন করে অবরে সবরে বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাতখানাই হাত-ধরা-হাত হয়ে জড়িয়ে যায়, আর ভুলে যাওয়া অতীতের জ্ঞান যে কতো অসম্পূর্ণ অক্ষম খোঁড়া তা ছেলে মেয়ের কাছে ধরা পড়ে যায়। একেই কি বলে স্বখাতসলিলে পতন? ভুলের নালা-ডোবা গুলো আমরা নিজেরাই খুঁড়ে নিয়ে কখন যেন তার মধ্যে টুপ্ করে তলিয়ে যাই।

সারা জীবন ভুল করে করে জীবনের শেষ পর্বে এসে এই যে হিসেব নিকেশ করার চেষ্টা এটাই কি তবে তৃতীয় বৃহত্তম ভুল? জীবনের ডেবিট-ক্রেডিট মেলাতে বসে বিরাট ভুল করি? যে চোখ ভুল দেখে দেখে অভ্যস্ত সে তো ভুলের সুতোয় বোনা জীবন-দৃষ্টি। মনের একটা অবস্থায় সর্বত্র সর্ষে ফুল নাকি দেখা যায়, দেখা দেয়। আমরা কি নিশ্চিত যে জীবনের একটা অবস্থানে সর্বত্র ভুলের ফুল অনিবার্য নয়? শরীরে যেমন 'ন্যাবা' হয়, চল্লিশে যেমন চালশে ধরে আর বয়স হলে চোখে পড়ে ছানি, তেমনি কি একটা ভুলের lense আমাদের মনের retina-র প্রাক-আচ্ছাদন হয়ে সব দেখাকেই reverse filter করতে লেগে যায়? কে জানে কি হয়; এটা জানি যে হিসেবের খাতা খানা সামনে মেলে সকলেই সেই দিকে তাকিয়ে twiser দিয়ে, সন্না হাতে নিয়ে, ভুলের পাকাচুল বাছতে বসে যান। বেশির ভাগই তুলতে তুলতে আবিষ্কার করেন যে সব চুলগুলোই যেন পাকা বলে মনে হচ্ছে। যতদূর দেখা যায়, সব ভুল 'বাছা' হয়ে গেলে, একটা বিরাট প্রশস্ত টাক সকলের নিজ নিজ মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে নির্লজ্জের মতো চিকন-মসৃণ ব্যাপ্তি নিয়ে। গা-হাত-পা ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মতো বোবা দৃষ্টি পেন্সিলটাই হাতে ধরা থাকে; বাকি সবই কেন কোনাকুনি দাগে আর চক্রবেড় বৃত্তচিহ্নে জবল জবল করতে থাকে! হিসেব কষতে গিয়ে এরকম বেহিসেবী নির্যাস বড়ই বেদনার। Profit এর বদলে যদি Loss-টাই

সামনে বেরিয়ে আসে তাহলে সে বড় বিপর্যয়ের হয় না কি ?

জন্মাবধি আমরা সকলে এক দুই এক দুই করে জমার ঘরে আঁক বসাই। সেটাই আমাদের আজীবন চেষ্টা থাকে। জন্ম দিনে আমরা সকলেই বয়সের ঘরে একঘর করে বাড়ি, লেখাপড়া করতে গিয়ে মনের ঘরে সম্পন্নতা জমা করতে থাকি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে হয়ে certificate জমা করি, খেলার মাঠে পাড়ার club-সভা-সমিতিতে প্রশংসার ঘরে অভিধা জমা করি ; এই করে করে এক টানা জমার column-টি দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আনন্দে আর উত্তেজনায়, প্রাপ্তির প্রাচুর্যে আর তৃপ্তির আনন্দে জাবেদা খাতাখানা বার বার সযত্ন স্পর্শ পেতে থাকে ; জমার ঘরে ক্রমশ বাড়ি, গাড়ি, স্বজন-বন্ধু, পুত্র-কন্যা। পাহাড়-প্রমাণ করতে থাকি আর মনে মনে জাবেদা খাতার বপু-বৃদ্ধি দেখে দেখে সন্তোষ অনুভব করি।

তারপরেই আসে সেই হঠাৎ দৃষ্টি-reversal. অনেকটা যেন সারা জীবন ভূপৃষ্ঠে মাথা-উঁচু করে হাঁটার পরে sputnik-বাসী ঘূর্ণমান কোনও বন্ধুর ঘোষণায় জানতে পারি যে আমরা ভূপৃষ্ঠে পা আটকে মহাবিশ্বে ঝুলে থাকা এক একজন বাদুড়-প্রমাণ অস্তিত্ব ; যাকে ঊর্ধ্ব বলে জেনে এসেছি তা আসলে অধঃ। তেমনি জীবনের অবেলায় পৌঁছে পিছন তাকিয়ে দেখি যা-সব জমার ঘরে লিখেছি বলে মনে করেছি তা-সবই আসলে খরচার, ভুলের দিকেই, লিখে গেছি। জন্ম দিনে জন্ম দিনে আসলে বয়স বাড়ে নি, fixed account থেকে এক এক ঘর করে কমে কমে গেছে ; যা শিখেছি তার বেশির ভাগটাই কবেই যেন ঝরে পড়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, জীবনের কাজে লাগে নি ; certificate গুলোর কোনই দাম নেই তা ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছি, একমাত্র birth-certificate-টিই সর্বমূল্য ধ'রে কর্ম বিরতি আর অবসর-ক্ষণটিকে সুনিশ্চয় করে দিয়েছে।

কিন্তু এমন হবার কথা নয়। প্রানী জগতে ভুলের কোনও সম্ভাবনাই নেই ; প্রকৃতি তেমন হিসেবের কানাগলিতে ওদের ছেড়ে দেন নি। এমনটা তাই একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব ; প্রকৃতি মানুষকে তার জীবনের সঙ্গেই ভাল-মন্দ বোধ উচিত-অনুচিত বিচার inject করে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন করে পাঠিয়েছেন। যত নষ্টের মূলে এই ইষ্ট অন্বেষণের মানুষী তাগিদ, ভালমন্দ বাছাইএর নিত্যদিনের প্রচেষ্টা, উচিত-অনুচিতের বিচার-বিড়ম্বনা। হিসেবের খাতার লাল-নীল কালির আঁচড়-আখর তো সেই কারণেই।

মানুষ স্বার্থ-চেতনায় ভুল ক'রে বাইরের সামগ্রী জমা ক'রে ক'রে পাহাড়

ক'রে তোলে। জমা করতে থাকে আর মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে; জমার ঘরে অনেক জমা হল বলে। এই সব পার্থিব সংগ্রহের ভিড়ে তার নিজের বলে যে অংশটুকু তা চাপা পড়ে যায়, দ্রব্য সম্ভারে ঝুঁকে প'ড়ে সে অন্তর সম্পদকে অবহেলা করে বসে। এই আমাদের সকলের জীবনের হিসেব। আমার প্রার্থিত আমির সঙ্গে সংগ্রহের পার্থিব বস্তুকে গুলিয়ে ফেলি। জীবন সংগ্রাম তো প্রধানতই জৈব সংগ্রাম; সেখানে প্রাণী আর মানুষে তফাৎ কোথায়? সংগ্রহের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, ফুরিয়ে দেওয়া তো জৈব প্রক্রিয়া, কারণ সংগ্রহ সমাপন হলেই দীর্ঘ নিদ্রা, জৈব শান্তি। সেই প্রথম থেকেই যাঁরা অন্তরের সম্পদ আহরণে 'স্ব-অর্থ' খুঁজে পান তাঁরা মরার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন কারণ তাঁদের হিসেবের খাতা অপরে audit করে, উত্তর পুরুষের হাতে হাতে সেই হিসেব উত্তরোত্তর শ্রী লাভ করে।

আমাদের সংগ্রহ যত বেশি বস্তু-নির্ভর, পার্থিব, এবং জৈব আমরা তত বেশি ভুলের বোঝা বাড়াই। যখন চলে যাই তখন সে সবই ফেলে চলে যেতে হয়, প্রত্যেকটি দ্রব্যের গায়ে ঋণাত্মক চিহ্ন, debit mark, এঁটে যায়। সারাজীবন এই সবকেই তো credit এর ঘরে লিখে চলি: বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি আরও কতো শতো নামী আর অনামী জিনিস পত্র। অন্যদিকে আমাদের অন্তরের সম্পদ যত বেশি সামান্য-সার্বিক, সত্য-শিব এবং সুন্দরের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে সমুজ্জ্বল আমরা তত বেশি অমৃতের পথিক হয়ে উঠি; যতটুকুই পারি ততটুকুই জমার ঘরে পাকা হয়ে লেখা হয়ে যায়। এই আসল জমায় যে যত বলবান, যে যত সম্পন্ন সে ততই স্মরণের ধন হয়ে যায়। আমাদের থাকা আর চলে যাবার মধ্যে এই জমার হিসেবটুকুই সেতু হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে; debited হবার ভয় কমে যায়।

ভুল তাই সংগ্রহে নয়, সংগ্রহের বিষয়ে। জমা করার বাসনায় ব্যাপৃত হওয়ার নয়, ভুল আমাদের ঘটে পার্থিব ভোগ্য পণ্যের হাতছানিতে আত্মবিস্মরণে। বাঁচার সংগ্রামে সচেষ্ট হওয়াতে ভুল নেই, ভুল হয় যখন সেই বাঁচাটাকে জৈবিক, এবং শুধুমাত্র জৈব সামাজিক বলে স্থির করে ফেলি। মনই আমাদের মানিক, অন্তরই আমাদের আর পশুজীবনের অন্তর ঘটায়, হৃদয়ের ধন কিছুই যায় না ফেলা। এখানেই আমাদের জমার ঘরে জমার অংক চিরদিনের হয়ে ওঠে; জীবনের the end হিসেবের the end না-ও হতে পারে।

॥ অভাব ॥

কদিন যাবতই অভাবের ধারণাটা বেশ তাড়া করে ফিরছে ; কোনও বিশেষ যে কারণ আছে তা নয়, তবে বুঝতে পারি যে অফুরন্ত সময় হাতে থাকলে এটা-ওটা-সেটা মনের ফাঁকা অলস অবসরগুলোকে ভরাট করে রাখে, আবার সরে সরে যায়। শরতের সাদা-সাদা মেঘগুলো যেমন শূন্য নীল আকাশের বুকে অলস ভাসতে থাকে, মনের আকাশেও বোধহয় তেমনি ভাবনাগুলো ধীরগতি হাজির হয় কিন্তু যাবার নামটি করে না। সেই সব ভাবনাগুলোর কোনও একটাকে যদি মনোযোগ দেওয়া যায় তাহলে কথায় পাওয়া বৃদ্ধের মতো সে যেন অনেক কথাই বলতে চায়। তার অভিজ্ঞতার যেমন অভাব নেই কথারও তেমনি অভাব নেই। একমাত্র অভাব ধৈর্য্যবান শ্রোতার। সময় যাদের অফুরন্ত তাদের অভাব সংবেদনশীল বন্ধুর, আর কাজের পরিমাণ যাদের সীমাহীন তাদের অভাব সময়ের। এ-এক বিচিত্র বিপরীত অবস্থা। বয়স হলেই বয়সের অভাবটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, অনেকটাই দাঁতের মতো।

শুধু তাই বা কেন ? অভাব ব্যাপারটা যে শতমূল বনস্পতির মতো সহস্রবাহু হয়ে আমাদের আদ্যোপান্ত সবটা জীবনের সমগ্র অস্তিত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, ছত্রাকার ছায়া ফেলে আছে তা বুঝতে পারলে অভাবের জ্বালাটা বোধহয় কমে যেতে পারে। জন্মাবধিই আমাদের পিছু নিয়েছে এই অভাব ; প্রতিদিন পলে পলে অভাবের অক্টোপাসটি আমাদের চেতনার জগতে তার নীরব কিন্তু নিশ্চিত শোষণ-ক্রিয়াটি চালু রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও নাছোড় এই শোষণ শেষযাত্রার দেহগত চিরঅভাবের শবধ্বনিতে সব-অভাবের শেষ করে দেয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই আমাদের জীবনটাই একটা অভাবের ক্রম প্রকাশ, অভিব্যক্তি মাত্র।

জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি ; কেন ? না, অভাব। কিসের অভাব ? কিসের নয় ? খাদ্যের অভাব, যত্নের অভাব, পুষ্টির অভাব, স্নেহের অভাব ; ক্রন্দন আর চিৎকারে আমরা তাই আকাশে বাতাসে তরঙ্গ তুলে, বিছানা ভিজিয়ে আর কাঁথা নষ্ট করে, হাত-পা ছুঁড়ে আর সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে প্রতিবাদ জানাতে থাকি। সেই শুরু ; তার পরে শৈশবের প্রতিটি দিন-সপ্তাহ-মাস রান্নাঘর প্রবাসী মায়ের

অভাব, অফিস গত বাবার অভাব, কর্মব্যস্ত দাদুর অভাব, আলোর অভাব, বাতাসের অভাব, কাঙ্ক্ষিত খেলনার অভাব, অপেক্ষিত প্রিয়জনের অভাব—অভাব আর অভাবের নির্ঝর একদিকে, অন্যদিকে তাল-লয়-ছন্দ-হীন ক্রন্দনের সঙ্গে হস্ত-পদ-দেহের সঙ্গতে আমাদের নিতি-নব তাণ্ডব-সৃষ্টি সমানেই চলতে থাকে।

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে তারুণ্যের জীবন বয়নে অভাবের 'মাকু'-টির চলন আপাতত অনুসরণ না করে চলে আসি একলাফে যৌবনে। জীবনের তাপ যত বাড়ে অভাব বোধের চাপও ততই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে; আর শুধু তাই বা কেন? প্রাক যৌবন অভাবের তাপ ও চাপের মাত্রা স্বভাবতই সেই মাত্রায় বা ডিগ্রিতে পৌঁছায় না যে মাত্রায় গুণগত প্রভেদ সৃষ্টি হবার কথা। প্রথম পর্বের অভাবের অনুক্রমণিকার সব লাইন, সকল অনুচ্ছেদ এবং সমস্ত পৃষ্ঠা পড়া না হলেও অভাবের শব্দরূপ ধাতুরূপ, সমাস সন্ধি কারক-বিভক্তি বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

যৌবন শুধু গতিই আনে না, আনে বেগ, আনে তাপ। গতি আনে ছন্দ, আর ছন্দ খোঁজে দ্বিত্ব, দ্বি-প্রাণ চলন। কিন্তু কোথায় পাব তারে? জীবনে অনেক কিছুই, কোনও কিছুই, সহজ লভ্য নয়। অপেক্ষার একাগ্রতাকে তীক্ষ্ণতর করে সূচাগ্র করতে পারলেই সাধ্য লভ্য হতে পারে। দ্রুতগতি আধুনিক জীবনে সময়ের অভাব, দ্বিত্বের অভাব, দ্বি-প্রাণ চলনের সম্ভাবনার মূলে রক্ত-চক্ষু নিয়ত দৃষ্টি অভিভাবকদের প্রহরা অভাবের মরুসাহারা তৈরি করে রাখে। তাই যাকে চাই তাকে পাই না, কাছে পাই না, কথার দূরত্বে পাই না, চিঠির নাগালে পাই না। অভাবের এমতো পীড়নে যৌবনের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা দিনগুলো কেমন যেন উষর-শুষ্ক-নিষ্করুণ বলে মনে হয়। এই অভাব কৃত্রিম অভাব, প্রকৃতি নির্দেশিত পথে এই অভাব সৃষ্ট নয়; এই অভাব মানুষের নিজহাতে তৈরি বেড়া দিয়ে বানানো। এ অভাব প্রাণের অভাব, অনুভবের অভাব সংবেদনশীলতার অভাব। তাই দেখতে পাই কোনও কোনও দেশে এ-অভাব নেই কারণ সেখানে প্রকৃতিকে রুদ্ধকরার জন্যে উঠে পড়ে লাগে নি, ছন্দকে বেড়ার আড়াল দিয়ে তার গতি-রোধের ব্যবস্থা পাকা করে তোলা হয় নি। আমাদের জীবনে গতির স্ফুরণোন্মুখ দিক-টি আছে কিন্তু তাকে পথের অভাব দিয়ে ভোঁতা করে দেওয়া আছে।

বেগ আসে যৌবনের গভীর থেকে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে, ভূমিকম্পের থরথর কম্পনে। সেখানে স্বাধীনতার অভাব, সমাজস্বীকৃত যোগ্যতার এবং অর্থনৈতিক

স্বরস্তরতার দীর্ঘমেয়াদী অভাব, পঙ্গুত্বের বেড়ি পরিয়ে রুদ্ধ করে বেগকে। আবার আবেগের উথাল পাথাল তরঙ্গ-ভঙ্গ-অনুভবকে প্রকাশ করার মতো শব্দের অভাব, চিন্তা-ভাবনা-সৃজনশীলতার অভাব; বাণীর-ধ্বনির-সঙ্গীতের অভাব কেমন যেন অবশ-নিথর-নীরব করে তোলে। দু'একজন কবি আর দু'চারজনের গান দিয়ে শত সহস্রের মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলে চোর অপবাদের ভয় আছে; আর সেও তো অনেক কষ্টে আয়ত্ত করার বিষয়! অত সময় কোথায়, সুযোগ কোথায়? অন্তরের বেগ তো আর স্কুলের ঘর গুনে গুনে ভূকম্পন ঘটায় না, শ্রেণী মেপে মেপে উত্তাপের পরিমাপ করে না! নিজের অন্তরের মন্থনকে ভাষার বন্ধনে প্রার্থিত জনের মনে সঞ্চারিত করার যোগ্যতার অভাব কী অপরিসীম যন্ত্রণার কারণ তা যে জানে সেই জানে!

তাপের কথা সকলেরই জানা। অভাব শীতল ছোঁয়ার। দক্ষিণে হাওয়া প্রকৃতির দান; তাই তাপ হরণ করতে কোকিলের অভাব নেই নেই দখিনা বাতাসের। নিজের অন্তরের চাহিদাকে সে গানের সুরে ভাসিয়ে দেয়, হৃদয়ের তাপ প্রকৃতির খোলামেলায় শীতল হয়। আমাদের জীবনে তাপের অভাব নেই, অভাব আছে দখিনা হাওয়ার, উষ্ণ করতলের অভাব নেই, অভাব উষ্ণে-উষ্ণ-ক্ষয় হবার মতো আর একটি করতলের। অভাব তাই প্রকৃতির দান নয়, মানুষের অবিবেচনার ফসল।

রোমাণ্টিক অভাবই আমাদের একমাত্র অভাব নয়; বরং অভাবের রাজ্যে বাস্তব অভাবরাই অধিকাংশ ক্ষেত্র জুড়ে বসে আছে। এই এলাকায় আকাশের চাঁদকে দেখায় রুটির মতো, ক্ষুধার রাজ্যে কবির ভাষায় সে হয়ে দাঁড়ায় ঝলসানো রুটি, রোটি-কাপড়া-মকান-এর সাহারায় অভাবের বালুরাশি রাশিরাশি উত্তাপ ছড়ায়, জীবনকে ঝলসিয়ে দেয়, গতিকে করে রুদ্ধ, আবেগকে ক'রে তোলে মৃত্যুশীতল। এটাই সত্য জীবন, রুক্ষ জীবন, বিধ্বস্ত জীবন। এক কথায় অভাবের জীবন। অভাবের সংসার।

খাদ্যবস্তুর অভাবকে সমাজ-সরকার স্বীকার করে নিয়েছে; কারণ র‍্যাশনিং ব্যবস্থা সচল এবং আইনসিদ্ধ। সেই র‍্যাশনে চাল নেই, সিদ্ধ হবার মতো ডাল নেই, তেল নেই; এই ব্যবস্থায় নেই আর নেই। তাই বলা ভাল যে এটা খাদ্যসামগ্রীর র‍্যাশন ব্যবস্থা নয়, অভাবকে বণ্টনের অবিন্যস্ত ব্যবস্থামাত্র। আলো হাওয়ার অভাব কারণ বিদ্যুতের অভাব, স্কুল কলেজ অফিস-কাছারিতে স্থানের অভাব কারণ চাকরির অভাব, বৃত্তি-ব্যবসার অভাব কারণ অর্থের এবং স্থানের

অভাব, সুস্থ-স্বাভাবিক যাতায়াত করতে পারেন না কারণ যানবাহনের অভাব, শহর-শহরতলিতে হাঁটা-চলা করতে পারেন না কারণ শূন্যস্থানের অভাব, গাড়ি-ঘোড়া সাইকেল রিক্সা চড়ে চলাচল করতে পারেন না কারণ যোগ্য রাস্তার অভাব, এমন কি ফুট-পাথ দিয়ে যে হাঁটবেন তারও জো নেই কারণ সেই স্থানাভাব। এই এতো অভাবের মধ্যে, মেঘের প্রান্তে রৌপ্য-রেখার মতো, দু'টি জিনিসের অভাব নেই। এক অভাবের অভাব নেই কোথায়ও কোনও জীবনেই; আর দুই, জনসংখ্যার অভাব নেই কোনও স্থানেই, কোনও প্রবেশ পথেই। অঢেল, অফুরন্ত গড্ডালিকাবৎ অভাব আর জনসংখ্যার দেখা পাবেন—ঘরে-বাইরে পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, স্টেশনে প্লাটফরমে, এবং চাকরির দরখাস্তের স্তূপাকৃতি পাহাড়ে।

যেদিকে তাকান যায় অভাব আর অভাব। মূল্য বোধের অভাব, পথ চলতে সজ্জন লোকের অভাব, স্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারিতে সহানুভূতিশীল সহকর্মীর অভাব, শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী ছাত্রের অভাব, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে মননশীল পাঠকের আর পড়ার মতো বই-এর অভাব, পরিবেশের অভাব। বাজারে তাজা সবজির অভাব, ক্রয়যোগ্য মাছ-মাংসের অভাব, পকেটে অর্থের অভাব, এবং গৃহে শান্তির অভাব। এতো সব অভাব যখন সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাড়া করে ফিরছে তখন সহজেই বুঝে যাবেন যে এ-সবের মধ্যে একমাত্র অভাবেরই অভাব নেই। সেই সঙ্গে অভাব নেই পথে ঘাটে ধৃষ্ট আচরণের, পা-মাড়িয়ে দেবার মতো পায়ের, ধাক্কা মেরে নিজের নিজের পথ করে নেবার মতো শরীরের। এমনিতরো সর্বত্রই অভাবের প্রাচুর্য ঠাসা, ছড়ানো এবং সর্বব্যাপ্য।

রাজনীতির ক্ষেত্র দেখুন যেন আখড়া বনে গেছে, অভাব শুধু সুস্থ রাজনীতির আর দূরদর্শী নেতার। অভাব নেই ধান্দাবাজের। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চোখ ফেলুন দেখবেন কোলে-ঝোল-টানারা চারধারে গিস্‌-গিস্‌ করছে, অভাব কেবল সমবণ্টনের, পরীক্ষিত পরিশীলিত ম্যাক্রো-মাইক্রো আর্থ ব্যবস্থার রক্ত সঞ্চালনের। সর্বদেহকে বঞ্চিত করে অর্থের রক্ত-সঞ্চালন শুধুমাত্র উচ্চকোটি কতিপয় মস্তিষ্কেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে; স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় এটা; সর্ব-সমাজ-দেহ অভাবের তাড়নায় রক্তশূন্য হয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখা যায় বিত্তের অভাব নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নমুখী জনপিরামিডের বিশাল গ্রাম-শহর জুড়ে ধরাশায়ী পড়ে আছে প্রাচুর্যের পাগড়ি-মাথা হয়ে।

এদিকে ধর্মের এলাকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। শূন্যতা আর অভাব। দেবতা মন্দির থেকে কবেই পলাতক; মন্দিরে দেবতার অভাব। কোন্দল,

উচ্চাকাঙ্ক্ষী দলাদলি আর স্বার্থের হানাহানিতে সুযোগ সন্ধানীদের সেখানে বাড়বাড়ন্ত, ধর্মক্ষেত্র এখন প্রকৃতই কুরুক্ষেত্র। আধ্যাত্মিকতার সবটাই এখন রাজমিস্ত্রীর কুশলতার আর আর্কিটেক্ট-এর নিপুণ দূরদৃষ্টিতে এসে ঠেকেছে, আচার-বিচারের প্রাবল্যে, জাগতিক প্রয়োজন বোধসমূহের টানে আর, সর্বশেষ সংযোজন না হলেও তীক্ষ্ণতম বটেই, রাজনীতির দাবাখেলায় বোড়ের চালে কিস্তিমাত করার চেষ্টা সর্বপ্রযত্নেই ঘটে চলেছে। ব্যক্তির ধর্মীয় আত্মানুসন্ধান মার খেয়ে যাচ্ছে, উপলব্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির কোনও হদিস মিলছে না। তাই, সংক্ষেপে, ধর্মস্থানে অভাব কেবল ধর্মবোধের, আর সকলই প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত। দৈনিকের পাতায়, প্রসেশনের সংখ্যায় আর রক্ত-পাতের হিসেবে সব জলের মতো বুঝে যাবেন।

বিদ্যার ক্ষেত্রে বিদ্যা ছাড়া আর সবই প্রবলভাবে উপস্থিত—ফেস্টুন, পোস্টার, প্রসেশন, ধর্মঘট, পথসভা, রাস্তা রোখ, ক্লাস-বয়কট এবং পাত্রাপাত্র যোগসাজসে নানান প্রকারের ক্লিকবাজি। বিদ্যাস্থানে শূন্য, অভাব। প্রকৃত শিক্ষকের অভাব, স্থানের অভাব, সুযোগের অভাব, মানসিকতার অভাব। একমাত্র অভাবহীন হল ছাত্র-সংখ্যা—সে একেবারে অঢেল, অফুরন্ত, অসংখ্য। ভর্তির জন্যে ফর্ম নিতে হোয়াং-হোর মতো লাইন, জমা দিতে নীল-নদের মতো। ছাত্র-সমাজের দুঃখের লাইন-নদী, বছরের একটা সময়েই ঘটে, জনসমুদ্রের উত্তাল বৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্র-নদীতে বান ডাকছে; আর প্লাবনে বিদ্যা ভেসে যাচ্ছে। সেই ভিড়ে 'জনতার' ধ্বনি ওঠে, 'ছাত্র' খুঁজে পাওয়া ভার। এটা কোন আবিষ্কার নয়, ঘটনা। এরা সামাজিক তাগিদে হারে-রে-রে করে ছুটে আসে, যদিও জনে জনে প্রশ্ন করলে জানাবে যে সামনেটাতো দেখা যায় না ভাল। কোনও উদ্দেশ্য নেই, আগ্রহ যে আছে তাও বলা যায় না, অন্য কোনও বিকল্প সামনে খোলা নেই, তাই দলে দলে, বর্ষে বর্ষে এরা ভিড় করে বিদ্যামঠতলে। সম্ভবত পাস-পোর্টের তাগিদে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দানসত্রে যা একমাত্র প্রাপ্য। বিদ্যা! ওরে বিদ্যা কারে কয়? বিদ্যা কোথা পাবি? ঝুলি ভরে বিদ্যার অভাব সযত্নে ভাঁজ করে রাখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাড়িত ছাত্রগোষ্ঠীকে জলের ধারে নেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু জল পান?

বড় বড় ক্ষেত্র ছেড়ে ছোট্ট সংসার বৃত্তে উঁকি দিন। কি দেখছেন? যা থাকলে সংসার গৃহ হয়ে ওঠে, না থাকলে গ্রহ (—গলগ্রহ?—) হয়ে দেখা দেয় সেই স্নেহ-মায়া প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ক্রমশই কর্পূর হয়ে যাচ্ছে না? এ-সবের

অভাব আর অভাব সংসারকে ছারখার করে দিচ্ছে না? আধুনিকতা মাত্রই কি স্বাধীন-চেতা নয়? সব-জান্তায় ঠাসা সংসার জীবনে তেমাথা প্রবীণরা, 'বুজুর্গ'-রা কুলোর বাতাসে একান্তে সরে যেতে বাধ্য। শিক্ষার প্রসার, বহু-প্রত্যক্ষের exposure, আপনাপনের স্বার্থচেতনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাইরের দ্রুতগতি জীবনের হাতছানি সব-সংসারের মধ্যজীবনকে কেন্দ্রাতিগ করে তুলছে। অভাব তাই সংহতির, সমঝোতার, মানিয়ে চলার ইচ্ছার। এই সব মানসিক অভাবের মূলে আছে বাস্তব অভাব, প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, কাঙ্ক্ষিত গুণ-মানের বস্ত্রের অভাব, শ্বাস নেবার যোগ্য বাসস্থানের অভাব। এই ত্রিবিধ প্রাথমিক অভাবের উপর শাকের আঁটির মতো আছে এটা ওটা সেটার অভাব, যা অন্যগৃহে আছে সাজানো গোছানো ভাবেই। আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে অভাববোধ আছে। কিন্তু নেই সেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অভাববোধ পূরণের সাধ্য। অভাব তাই সাধের নয় সাধ্যের। একটু খুঁজলেই দেখা যাবে পাশাপাশি আছে মাত্রা বোধের অভাব, proportion বোধের অভাব, উচিত-অনুচিত বোধের অভাব। সংসারের গভীরে যখন এই অভাববোধের virus একবার ঘর বাঁধে তখন তার শরীরের স্বাস্থ্য আর মনের সংহতি একেবারেই ধ্বসে পড়ে। সদস্যদের স্বতন্ত্র জীবন-প্রত্যয়, চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বসার ঘর থেকে খাবার টেবিলে, রান্নাঘরের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে শোবার ঘরের অবসর প্রান্তরে ছায়া ফেলে, ধোঁয়া তোলে, স্ফুলিঙ্গের ছররায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। এবং সংসার সংস্থাটিও তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

অভাবের শক্তি অভাবের দেহে না অভাববোধের অন্তরে? লাগাম না পরালে ঘোড়ার শক্তি যেমন দেহ-কেন্দ্রিক দিকহীন হয়, আর saddled হলে সেই শক্তিই যেমন পোষ্য-গতি পায়, তেমনি অভাবের দেহে অন্তরের অধিষ্ঠান না ঘটলে অভাব কোনওভাবেই লক্ষ্যের ভাবাত্মক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে না। অভাব আছে বলেই তাকে উত্তরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা প্রক্রিয়া মানুষের সমাজে চালু। অভাব 'দ্রব্য' কিনা তা দার্শনিক আলোচনার বিষয় হতে পারে; কিন্তু অভাব যে সত্য এবং সত্যকে পাবার পথের প্রেরণার উৎস সে কথাটা বলে রাখা ভাল।

অভাব আছে আমাদের স্বভাবেই; আবার আমাদের স্ব-ভাবটি তৈরিও হয় অভাবের নির্দেশে। খুঁটো-ছাড়া বুনো অভাব যথেচ্ছ বেদনার কারণ হতে পারে; মননের লাগাম পরানো অভাব গন্তব্য নির্ধারণে আর নির্দেশে অপরিহার্য।

॥ ঝড় বাতাস ॥

'ঝড় চাই না, বাতাস চাই'—কথাটা বলেই ভদ্রলোক সটান সামনের আকাশটার দিকে তাকালেন। 'এটাই এখন আমার motto, বুঝলেন ?' অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে আমরা নীরবেই একে অপরের মনের প্রবাহকে ভিন্ন ভিন্ন বয়ে যেতে দিচ্ছিলাম। আমরা উভয়েই জীবন পত্রের শেষ পরিচ্ছেদের তালিকায় আরও অনেকের সঙ্গে তালিকাবদ্ধ হয়ে অপেক্ষায় আছি। তফাৎ এই যে ওঁর মাথায় অণুবীক্ষণ অনুসন্ধান করেও কোন কৃষ্ণবর্ণ কেশাগ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আমার মাথায় এখনও 'নিড়েন' দেবার অবকাশ একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। একই তালিকায় উনি আছেন শীর্ষ-অধিকার করে আর আমি সদ্য রেজিস্ট্রিকৃত, তুলনায়, বালখিল্য অনুজতম মাত্র।

জৈব নিয়মে তরুণ বয়সে তরল রক্ত তর তর করে-জীবনের নদীমাতৃক শিরা উপশিরা দিয়ে বয়ে যাবার কথা। তখন আমরা জীবনের মাঠে ঘাটে খেলা করি, রক্তের প্রবাহও ঝরু ঝরু ঝরনার মতো তরল গতি ছুটে ছুটে চলে। ঝড় বাতাসের সন্ধান তখন দূরতম চেতনাতেও হাজিরা দেয় না। তারপরে যখন দু'কুলপ্লাবী যৌবনের শঙ্খঘণ্টা বেজে ওঠে দেহ-মনের প্রাকারে প্রকোষ্ঠে তখন রক্তে আসে মাদকতা, উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে হৃদয়ের প্রান্তে, দপ্-দপ্ করে তাপের প্রবাহ মত্ত-মাতাল ছুটোছুটি করে শিরা-উপশিরা বেয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় বাধাবন্ধ হারা। ঝড়ই তখন কাম্য ; ঈশানের পুঞ্জ মেঘ তখন পূজ্য, ঝঞ্ঝাই তখন জীবনের দেবতা, ঘড়ায় তোলা জলে তৃষ্ণায় বেদনা যোগ করে, বাতাস তখন আর অনুভবের মাত্রা পায় না, ঝড়ের প্রভঞ্জনই একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের জীবন্ত অনুভব হয়ে রক্তে তোলপাড় ঘটায়, জীবনকে জীয়নযোগ্য করে তোলে, প্রাণে আনে তীব্র স্পন্দন। তখন ঝড়ই চাই, বাতাস চাই না। দিন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ ঘড়া-কলসী-গ্লাসের হিসেবী মাপযন্ত্রের হাত থেকে দূরে অফুরন্ত প্রকৃতির নিঃসীম অবগাহনেই সম্ভব।

আমরা সকলেই রোমে রোমানদের মতো ব্যবহারে অভ্যস্ত ; অন্তত আমাদের সকলেরই সে মতো একটা আকাঙ্ক্ষা-নির্দেশ প্রকৃতিদত্ত দিগ্‌দর্শন হয়ে ঝান্ডা তুলে রাখে। তাই চুলের সযত্ন-অবিন্যস্ততার দিনে, টান-টান মসৃণ চিবুকের

জীবনে রক্তের উত্তুঙ্গ ছলাৎ ছলাৎ তরঙ্গ-ভঙ্গের দিনে আমরা জীবন নদীতে হস্তপদতাড়নায় অহেতুক অনেক জলকেই শীকর-সূক্ষ্ম তীব্রতায় আকাশমুখী করে সার্থকতা খুঁজি। তখন কি আমরা মৃদু-মন্দ বাতাস খুঁজি? ঝড়; ঝড়ের দিনে ঝড়েই প্রাণের দিগন্ত মুক্তি পায়। নদীর প্রবাহে ঘূর্ণি, রক্তের তীব্রগতি বহমানতায় নেশার পাক্ ঘুরে ঘুরে ছুটে চলে, আকাশের নীলে চলে মেঘের সঙ্গে মত্ত-বাতাসের মন্থন। আটপৌরে নিশ্চল অচেতন বাতাস নয়, ঝড়োগতি জীবনে ঝড়ই তখন কাম্য।

তারপরে আসে সংসারের চাপ আর বিষয়ের ঢল-নামা প্রৌঢ়ত্ব; রক্তে পৌঁছোয় ভাটার টান, ঘন তরলের গতিস্রোতে অতীতের ডুপ্-ডাপ্ বর্তমানের ধক্ ধক্ আঘাত হানতে থাকে; বাতাসে ধুলো ওড়ে, ঝড়ে আশ্রয় খোঁজার বাসনা তীব্র হয়, গৃহাভ্যন্তরে সংসার সম্পর্কের জটিলতা ঘূর্ণি হয়ে শরীর মনকে শীর্ণ, কুণ্ঠ, ব্যস্ত করে তোলে। আকাশ হারিয়ে যায়, চটের থলের অভ্যন্তরে জীবন দৈনন্দিনের র‍্যাশন হয়ে বাঁধা পড়ে যায়। ঝড়ের প্রতি বিকর্ষণ, বাতাসের প্রতি দৃকপাতহীন হয়ে ক্রমশই আমরা টাকা-আনা-পাই-এর হিসেবের আঁধিতে জড়িয়ে পড়ি। মেয়ের স্কুলের ড্রেস, ছেলের কলেজে 'guardian-call', মুদির দোকানের হিসেব আর দুধের 'বুথে' লাইন-সর্বস্ব হয়ে রক্তের চাপ বাড়াই আর চশমার power পাল্টাই। মৃদুমন্দ বাতাস কোথায় হারিয়ে যায়, তলিয়ে যায় ঝড়ের আকাঙ্ক্ষা, কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের চর্ম-আড়ালে।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা রোমে পৌঁছেও রোমান-ব্যবহারে রাজি হতে চান না; অতীতকে তাঁরা Recurring Deposit Scheme এ জীবনের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে ধরে রাখতে চান। তাঁরা হেলে পড়া জীবনেও ঝড়ের উপাসনা করে জীবনের তাপকে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধুর গর্জনে অনুভব করতে ছুটোছুটি করে থাকেন। মাথায় কলপ, গোঁফে আতর আর হাতের মুষ্টিতে ধুতির কোঁচাটি 'ফুলেল' করে অন্তসূর্যের আড়ালে ঝড়ের অন্বেষণ করে থাকেন। ক্রমশ জমাট বেঁধে আসা রক্তের ভারি গতিতে তাঁরা যৌবনের গান শুনতে কান পেতে থাকেন, শিশি-বোতলের ধার করা তেজের প্রবাহে রক্তের অভ্যন্তরে ঢেউ তুলতে চান, রঙিন-দৃষ্টিকে অতীত-উদ্ধারিণী মন্ত্রের শক্তিতে ফিরে পেতে চান এবং ঝড়ের নেশাকে অবিন্যস্ত পদক্ষেপের বেতালে বেতালে ধ্বনিত করে টান টান চলতে চান। যখন বসন্ত বিদায় নিয়ে চলে গেছে তখনও back gear-এ জীবনকে ঠেলে ঠেলে পিছনে নিয়ে যাবার চেষ্টার মধ্যে যে ব্যাপারটা বিসদৃশ রকমের

nn-Roman, তা আমাদের মধ্যে অনেকেই অংকুশাঘাত ছাড়া বুঝে উঠতে পারেন না। তাই এঁদের যখন বাতাস খোঁজার কথা তখনও এঁরা ঝড়ের প্রত্যাশা করেন।

ঝড়ো মেঘের অবসানে সজল মেঘের আনাগোনা প্রকৃতি স্বীকৃত। আর সংসার আকাশে ভাসমান জীবন যখন ঝড়ো জীবন পার করে সজল-সরস বর্ষার জলসেচনে পরিবারে ফসলের সম্ভার স্তূপীকৃত করে তোলে তখন জীবনের আকাশে পেঁজা-তুলো সাদা-মেঘের শান্ত-বিচরণের সময় আসে। ফজলি আমের সময়ে সেই আমই চাই, সে আম ফুরিয়ে গেলে যদি বলি ফজলিতর আম চাই তাহলে তো বড়োই অনর্থের কারণ হবে। তাই দিশারী কবি বড় বাজার থেকে বড় বড় দেখে আতার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ঝড়-জীবন শেষ হয়ে গেলে ঝড়-তর জীবনের অন্বেষণ অনর্থের কারণ হতে বাধ্য; তাই বাতাসের খোঁজ করাটাই স্বাভাবিক, Roman. তাই শুভ্র-শির, শরতের মেঘ-ঢাকা-মস্তক বৃদ্ধের ঝড়-বাতাস আকাঙ্ক্ষার ঘোষণায় একটি শান্ত শ্রী আছে।

তবে একথা বলতেই হবে যে জীবনের পর্বপর্যায় ক্যালেন্ডারের পাতা বেয়ে বেয়ে আসে না। আপেক্ষিক। সমাজ-সংসারে এর নজির আছে ভূরি ভূরি। দেহ-মনের জটিল সম্পর্ক-আবর্তে জড়িয়ে না পড়েও বলা যায় যে দেহে নয়, মনে মনেই পর্ব-চিহ্ন ছাপ ফেলে যায়। স্বাস্থ্যই সুখের মূল; অবশ্যই সত্য, কিন্তু বেশিটাই স্কুল-পাঠ্য তরুণ-বেলাকার সত্য। মনই সুখের স্রষ্টা। মনটি যার তাজা সবুজের ছোঁয়ার জন্যে তাকে কুঞ্জে-অরণ্যে-বনাভ্যন্তরে ঘুরে ফিরতে হয় না। যে সকল আধমরাদের বাঁচানোর জন্যে কবির আর্তি কাঁচা আর সবুজদের প্রতি ডাক দিয়ে যায় সে সব অর্ধমৃতদের পঞ্জিকা নির্দেশিত স্থান বিষয়ে কিন্তু কবি নিরুত্তর। এ-থেকেই মনে খটকা লাগে। বয়সের পরিমাপ কিসে হয়? দেহের কোষে না মনের নিকষে? সব মেনে নিলেও সমগ্র জীবনের সুপরিসর অট্টালিকার ঘরের মধ্যে ঘরের যে পাশাপাশি এবং সহাবস্থান ঘটে চলে সেখানে checking-in এবং checking-out বলে ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। যত যন্ত্রণা সেই in-out ফলক গুলোকে চিনে নেওয়া, মেনে নেওয়া এবং Roman-দের মতো ব্যবহার করার। বার বার দেহের রগে-রগে আর মনের সুতোয়-সুতোয় টান লাগে, বেদনা বাজে। পার হয়ে যাই তবুও ফিরে ফিরে চাই; যা পাই তাকে শান্ত মনে মেনে নিতে পারি না, যা ছেড়ে যাই তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চোখ ব্যথা করে ফেলি, মনে মনে হতাশার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ঘুর পাক খায়।

ঝড়ের প্রতি টানটুকু মনের গভীরে টন টন করে, আর বাতাসকে আমরা যেন সর্বান্তঃকরণে আবাহন জানাতে দ্বিধা লাগে। যা ছিল আর দিল অসীম আগ্রহে হাত বাড়াই আর যা আসছে তাকে যেন মেনে নিতে পারিনা।

এই অব্যবস্থিতচিত্ততার শেষ প্রান্তে অনিবার্য পৌঁছে আমরা সকলেই একসময়ে ঘোষণা করি ঝড় চাইনা বাতাস চাই; একদিনে সব দিয়ে দিও না, সব দিন কিছু কিছু করে যেন পাই। ঝরনার স্বভাব-উচ্ছৃঙ্খল পেয়-উৎসে অনাগ্রহ; ঘড়ায় তোলা হিসেবী পানের নিশ্চয়তার প্রতি একাগ্রতা। এটা কি ট্র্যাজেডী নয়? জীবনের পূর্ণ পাত্রে প্রকৃতির দেওয়া এই যে প্রাণ, যা নিয়ে আমরা সেই কবে থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্বেষণ-অনুসন্ধান, উপলব্ধি-উপভোগ করেই চলেছি সে কি শুধুমাত্র হিসেব শাস্ত্রের debit credit-এর জন্যে? জীবন অবশ্যই বেঁচে থাকার জন্যে; কিন্তু তিলে তিলে হিসেবী বাঁচার জন্যে কি বিশ্বপ্রকৃতির এমন উদার অফুরন্ত আয়োজন? জীব জগতে existence-টাই কথা; মানুষের জীবনে survival এর পরেও কি transcendence-এর কথা থেকে যায় না? জীবনটাকে কি হাসপাতালের prescription আর খাদ্য-পানীয়ের তালিকা অনুসারী তিল তিল জীবনের যন্ত্রে সচল রাখার মধ্যেই শেষ হতে হবে? তার বাইরে, ঊর্ধ্বে কি আমাদের তাকানোর ক্ষেত্র নেই, চাইবার বিষয় নেই?

আছে, আছে; আর আছে বলেই তো কবি নিজের জীবনকে শঙ্খ করে তোলার প্রার্থনা জানিয়েছেন; আকাঙ্ক্ষা করেছেন একটি ফুৎকারের যা হৃদয়ের মুখে মহাজীবনের গান হয়ে ধ্বনিত হবে। ঝড়ের প্রয়োজন রক্তের তেজকে বাড়িয়ে তোলার মধ্যেই আবদ্ধ নয়; মনের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্তলে ঝড়কে অনুভব করে শান্ত মহামানবের জয়গানে সমৃদ্ধ করে তোলাও সেই ঝড়েরই আর এক প্রকাশ। হৃদয়ের মুখে ঝড়ের ফুৎ-কার প্রাণের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করতে পারে; ফোঁটা ফোঁটা প্রাণের সেচনে আর মৃদু মৃদু বাতাসের ব্যজনে বেঁচে থাকে vegetative অস্তিত্ব। অমৃতের সন্ধান পেতে হলে স্তব্ধ-সাগর-সন্তান শঙ্খের সসীমতায় অসীমের ঝংকার তোলা চাই। তাই বাতাস নয়, ঝড় দিও; তিলে তিলে জীবনকে প্রলম্বিত করার বাসনায় আধমরা অস্তিত্বের বদলে সজীব মনের প্রাণবন্ততা দিও। হেলে পড়া জীবনেও যেন জীবনকে অবহেলা সইতে না হয় তার জন্যে সংবেদনশীলতাকে দীর্ঘায়ু ক'র, চেতনাকে সূক্ষ্মতা দিও। প্রার্থনাকে জৈব নির্দেশের এবং তার অবমাননার হাত থেকে বাঁচাতে চাই; প্রার্থনাকে হৃদয়ের তাপে সমৃদ্ধ করে মানব মনের যোগ্য করে তুলতে চাই।

তাছাড়া ঝড়কে অনেকেই নবজীবনের উদ্গাতা, খসে পড়া জীর্ণ-শীর্ণ-শুষ্ক অতীতের আবর্জনার সম্মার্জনী বলেও উল্লেখ করেছেন। ফেলে আসা জীবনের জড়িয়ে থাকা অকারণ ভারসমূহ পরাশ্রয়ী অবশেষ হয়ে জীবনের সঙ্গেই লেপ্টে থাকতে চায়—মৃদু মন্দ বাতাস তাদের মৃতপ্রায় অস্তিত্বে ক্ষীণ প্রাণের ধারাটি ধরে রাখে। ঝড় নিষ্ঠুর অভিভাবকের মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় জীবনের সব ঝরাপাতা অস্তিত্বকে, নির্মম মালির মতো ছেঁটে-কেটে পুষ্টির ধারাপ্রবাহটিকে গাছের ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চয় করে দেয়। স্রোতের অভাবে আবদ্ধ জলাশয় আবিল হয়ে ওঠে; নদী প্রাণের গতিশীলতার প্রতীক কারণ সেখানে স্রোত আছে। মানুষের জীবনে ঝড় স্রোতের প্রতিভূ; মৃদু মন্দ বাতাস সংসারের প্রয়োজনে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত, নির্জীবতার প্রতিনিধি। সারা জীবনই যদি ঝিরি-ঝিরি বাতাসের নিষ্প্রাণ বাতাবরণ আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে মানব জীবন ডোবা হয়ে দাঁড়াবে—অপেয়, পঙ্কিল, জীবাণুদুষ্ট। তাই বলা চলে জীবনের প্রয়োজনেই ঝড়ের প্রার্থনা স্বাভাবিক; নব নব জীবনের স্পর্শ একমাত্র ঝড়ের আগমনেই সম্ভব। ঝড়ই দিগন্তকে প্রসারিত করে দিতে পারে, নবাঙ্কুর মানব জীবনের সামনে ভূমার আকর্ষণটুকু উচ্চারণ করতে পারে, ঘোষণা করতে পারে যে জীবন বেঁচে থাকার চাইতেও কিছু বেশি। মৃদু বাতাস বর্তমান মুহূর্তগুলোকেই জীবন বলে ভুল করে; ঝড় আসে ভবিষ্যতের বার্তা নিয়ে, সম্ভাবনার বীজ বয়ে নিয়ে আর শাশ্বতের বাণীবহ হয়ে।

অবশিষ্ট জীবনের স্বল্প-আয়ু চত্বরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার ক্লিষ্ট অস্তিত্বে মনে হতে পারে বাতাস চাই, ঝড় নয়; জীবনের র‍্যাশন যোগানসূত্রটি যেন সমবণ্টনে দিন-দিন-প্রতিদিনের প্রয়োজনটুকু পূরণ করতে পারে। যেন একদিনের প্রাচুর্য অন্যদিনের বঞ্চনাকে অনিবার্য না করে তোলে। এটা হিসেবী মনের বেঁচে থাকার আকুতি, মানব মনের সমৃদ্ধ অন্তরের প্রার্থনা হতে পারে না। কিন্তু এই হিসেবী মন অনিবার্য হালের মাঝি হয়ে প্রান্তিক অবস্থানে ছায়ার মতো আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গী হয়ে দেখা দেয়। চতুরাশ্রমের প্রস্তাবনায় বনং ব্রজেৎ-এর যে উপদেশ আছে সে তো জীবনের ঝড়-ঝাপটা থেকে দূরে শান্ত-সমাহিত অপেক্ষার জীবন যাপনের জন্যেই। সংসার তরীর যাত্রীরা তো উথাল-পাথাল আর্থ সামাজিক আবর্তে দোদুল্যমান, অনিশ্চয়তার শিকার। বেলাশেষের 'তে-মাথা' যাত্রীদের জন্যে অন্যের সময় কোথায় সময় নষ্ট করার? তাই যাঁরা বনে যেতে পারেন না, গৃহের নিশ্চয়তাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন তাঁরা ঝড়কে ভয়

পাবেন এটাই স্বাভাবিক, তাঁরা মৃদু-মৃদু নির্ধারিত জীবন-বাতাসটুকুকে সমবণ্টনে দীর্ঘমেয়াদী করে নিতে চাইবেনই।

পারানির কড়ির প্রার্থনায় অঞ্জলিবদ্ধ অপেক্ষা যখন অনিবার্য, তখন জীবন নদীর এপারে দাঁড়িয়ে আমরা কিসের প্রতীক্ষা করি? ঝড়ের? অবশ্যই নয়; শান্ত ব্যজনে ক্লান্তি অপনোদনক্ষম মৃদু মন্দ বাতাসেরই প্রতীক্ষা করি। যুদ্ধ আর চাই না, চাই ক্ষমা, চাই শান্তি। ঝড় যুদ্ধের প্রতীক, তাই ঝড় চাই না; ঝড় সংঘর্ষের বার্তাবহ তাই ঝড় আর চাই না। মৃদু বাতাসের আলতো পরশে ওম্ শান্তি ওম্ শান্তি অন্তরের গভীর প্রার্থনা হয়ে আকাশে বাতাসে ধীর অনুরণন তুলবে এটাই তো তখন অপেক্ষিত। তবে, তাই হোক, তাই হোক, তাই হোক।

॥ সম্পর্ক ॥

মানুষের জীবনে সম্পর্ক ব্যাপারটি অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। বিষয়টি যেমন গভীর তেমনই সূক্ষ্ম। সম্পর্ককে সকলেই প্রায় সুতোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সম্ভবত সুত্রের টানাপোড়েনে যেমন বস্ত্রের বুনোট তৈরি হয় তেমনি সম্পর্কের সুত্রেই আমাদের পারিবারিক সামাজিক অস্তিত্বের স্বত্ত্বটি সত্য হয়ে ওঠে বলেই এই রকমের তুলনা। এবং মনে হয় সামাজিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-নিগড় আর লজ্জা নিবারণের জন্যে আচ্ছাদন-বস্ত্রের প্রয়োজনবোধ বেশ সমসাময়িক। তার আগে, প্রাগৈতিহাসিক মুক্ত জীবনে, জান্তব প্রয়োজনবোধ সম্পর্কের সামাজিকীকরণকে পাত্তা দেয়নি। প্রবৃত্তির মূল্যে, প্রবৃত্তির অস্বীকারের মধ্যেই মানুষের সভ্যতার উদ্ভব; আর সভ্যতা সম্পর্কের বন্ধনকেই প্রাথমিক বলে মেনে নিয়ে থাকবে।

সেই তবে থেকেই সম্পর্ক ক্রমশ কেন্দ্রীভূত পরিশীলিত আর গণ্ডিবদ্ধ হতে হতে পরিবারের এককে এসে নিজের অন্তরকে খুঁজে পেয়েছে। প্রেম ভালবাসা, সমবেদনা-সহানুভূতি, স্নেহ-মমতা, লালন-পালন—যা কিছুই মানুষকে মানুষের কাছে টানে, ধরে রাখে তার সব কিছুই তো পরিবারের সুতিকাগারেই প্রাণের স্পর্শ পায়। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই তো শিশু স্নাত হয় হৃদয়ের তাপে আর অনুভাবনায়। মা-বাবা এবং স্বজন-পরিজনের জাগ্রত চেতনার মধ্যমণিটি হয়ে শিশু সম্পর্কের শত-সহস্র সুতোয় বাঁধা পড়ে যায়। প্রাণিজগতের নিয়ম কানুন আলাদা, প্রাথমিক জৈব সুরক্ষার দায়টুকু মিটে গেলেই সেখানে 'খুঁটে খাবার দিন' এসে যায়, চাচা আপন বাঁচার, জীবন সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়, সম্পর্কের সব সুতোগুলো প্রকৃতির আপন নিয়মেই ছিন্ন হয়ে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। তাদের বেলায় জীবনের নির্দেশ থাকে, থাকে না মনের বালাই। মানুষের বেলায় ব্যবস্থা অন্যরকমের: তার বেলায় আছে মন, আছে মননশীলতার দায়; তাই মানুষের আছে দীর্ঘ শৈশব, চঞ্চল কৈশোর আর তপ্ত তারুণ্য। পরিবারের উৎসমুখে আহরিত-সঞ্চিত সম্পর্কের দ্যোতনা নিয়ে তাই মানব-শিশু সমাজদেহের পরিজন-অন্যজনদের খুঁজে নেয়, ভবিষ্যৎ জীবনের সুপ্রশস্ত সম্পর্কের বস্ত্রখানি বয়নের জন্যে সে বেছে নেয়, খুঁজে নেয়, সংযোজন করে অসংখ্য-অগণ্য নোতুন

নোতুন সুতোর। জীবনবৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দুটি ছাড়িয়ে পরিসীমার দিকে বেড়ে ওঠার মধ্যেই তার যাথার্থ্য। শত-সূত্রের অণ্বেষণই তাই তার জীবন প্রসারের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

আর এই করতে গিয়েই ঘটে যায় প্রত্যেক জীবনের 'হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের' ইতিহাস। পুরোনোকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পুরোনোকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা, চলমান-ধাবমান জীবনের গতির কাছে ইতিহাস মুখ-থুবড়ে পথপ্রান্তে পড়ে থাকে, যৌবনের দৃপ্ত তেজের অহংকার হারিয়ে ফেলে উষার মৃদু-দ্যুতি—মা-বাবার অফুরন্ত স্নেহভালবাসা, আত্মীয় পরিজনদের নৈকট্য-হৃদ্যতা। যৌবনের স্বপ্নপ্রাণ প্রাপ্তির বেদীমূলে নিরুদ্দেশ ভবিষ্যতের পতাকাটি অনেকেই আমূল প্রোথিত করে নেয়। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে মা বাবাকে ভুলে যায়, অথবা বলা ভাল, জীবনের মণিকোঠায় তীব্র বর্তমানের স্থান করে দেয় বলেই অন্য সবকিছুই ম্রিয়মাণ বোধ হয়।

কেন এমন হয়? প্রত্যেক মা-বাবাকেই কেন অনেক অনেক দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে হয় পড়ন্ত বেলার পথপ্রান্তে বসে! জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ না করতে পারলে ব্যর্থ হয় গানের পসরা—যে ঋষি-দৃষ্টি কবি এ কথাটি বলে গেলেন তিনি তো ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক কথায় সব কথাই বলে গেলেন। সম্পর্কের সঙ্গীতটি যদি বেসুরো বাজে তাহলে অবশ্যই জানতে হবে যে জীবনে জীবন যোগ করাটাই হয়ে ওঠে নি। কিন্তু প্রত্যেক মা বাবাই তো জীবনের যা কিছু সংগ্রহ-সঞ্চয় তা সব দিয়েই তাঁদের সন্তানদের শৈশবকে, কৈশোরের দিনগুলোকে আর তারুণ্যের সম্ভাবনাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ সমুন্নত করতে সচেষ্ট থাকেন; যখন সন্তান শুধুমাত্র ইচ্ছে হয়ে মায়ের মনের গভীরে অবস্থান করে, যখন সে প্রথম শঙ্খধ্বনিতে জাগ্রত আবাহনের স্পর্শ পায়, সেই তখন থেকেই তো সন্তান-জীবন মা-বাবার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত হয়ে যায়, বেড়ে উঠতে থাকে। সম্পর্ক-সূত্রের টানাপোড়েনে, নিত্য-নব স্নেহের রঙে আর গভীর গাঢ় হৃদয়ের রস-সেচনে সেই সন্তানের জীবন বস্ত্রখানি, গানের সুরের মূর্ছনার মতো, ভবিষ্যতের দিকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলা থাকে। তাহলে সেই সন্তানের মধ্যজীবনে গানের পসরা কেন ব্যর্থ হয়? এবং কেন এই পরম্পরা অনাদি অনন্ত কাল ধরে; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত সমানে বেসুরো বেজে চলবে? কেন ব্যর্থ করে দেবে প্রতি প্রজন্মের গানের পসরা? পড়ন্ত বেলায় সব জীবনই কেন সব হারিয়ে অতীতের শ্মশান-ঘাটে বাঁধবে?

এই শূন্য আঁচলে গিঁট বাঁধাই যে মানুষের প্রকৃতি-দত্ত ললাট লিখন। মানুষের জীবনটিকে শৈশব থেকে বার্ধক্যের দিকে, শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে আর কোরা কাগজের অদৃশ্য-লিখন থেকে বহুবর্ণখচিত সর্বজনপাঠ্য বৃত্তান্তের দিকে নিয়ে যেতে যেতে প্রকৃতিদেবী নিজের হাতেই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জীবন-দৈর্ঘ্যকে পর্বে-পর্যায়ে বহুভাগে ভাগ করে রেখেছেন। তাই জীবনকে একটা একক বলে মনে হলেও সে আসলে একটি জটিল এবং মিশ্র গঠন মাত্র। প্রত্যেকেরই দেহখানি এক থেকেও এক থাকে না, বহু পরিবর্তন আর কোষ বিভাজনের স্বাক্ষর বয়ে বয়ে সেই দেহ বার বার গঠন হারায়, শক্তি হারায়, যোগ্যতা হারায়, আবার তেমনিই, নব-নব বিন্যাসের ধারক ও বাহক হয়ে একদিন লাঠি-সম্বল করে পুকুর ধারে, নদীর পাড়ে অথবা দাওয়ার মেঝেতে অপেক্ষাকে একাগ্র করে তোলে। মনের বেলাতেও এর অন্যথা হয় না। খেলা করার মনটি হারিয়ে যায় খেলোয়াড়ী মনের আড়ালে, তরুণ গরুড়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হারিয়ে যায় সংসার জীবনের রথচক্রপেষণে আর তার পরেই সব যেন মিছে হয়ে যায় আঁচলের শূন্য-গ্রন্থি সর্বহারা সম্পন্নতায়! জীবন চক্রের চলনের পথেই তাই এই ঊর্দ্ধ-অধঃ অবস্থান অনিবার্য।

এর সঙ্গে যখন স্মৃতির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যটি যোগ দেয় তখন সে হয়ে ওঠে 'সুগ্রীব দোসর'। স্মরণের স্বভাবই এমন যে সে আনন্দের বিষয়কে বেশিদিন ধরে রাখে না, বেদনার ইতিবৃত্তটিকে ছাড়তেই চায় না। মা-বাবার মনে সন্তান লালন পালনের পর্বের বহু কষ্ট, বহুতর রাতজাগা উৎকণ্ঠা, অনেক ত্যাগ, অনেকতর কৃচ্ছ্রতা, সব মিলিয়ে সন্তানদের জন্যে তাঁদের কৃপণ জীবন-যাপন দীর্ঘ-স্মরণের দাগ কেটে যায়। সন্তান যে তাঁদের জীবনে ঊষার কিরণের আলোর বন্যা বয়ে আনে, যৌথ জীবনের সুপ্ত বাসনা পূরণের প্রাণকেন্দ্রটি হয়ে তাঁদের সমস্ত অস্তিত্বকে ঘিরে রাখে আলোকিত করে রাখে, সেই আনন্দের হাট তো কবে কোথায় হারিয়ে যায় যখন সন্তানের বয়সন্ধি পার হয়ে সে বহির্বিশ্বে প্রসার খোঁজে; তখন সেই সন্তান ক্রমশই তাঁদের কাছে 'অবুঝ অবাধ্য' বলে মনে হতে থাকে। খাঁচায় আবদ্ধ তোতার জীবন-জিজ্ঞাসা যে সেই খাঁচার পরিসীমায় আবদ্ধ থাকতে চায় না তা মা-বাবার মনের আশঙ্কা উৎকণ্ঠার সরু তারে বোনা খাঁচা-সীমা-চেতনাকে বার বার আঘাত দিতে থাকে। বিচ্ছেদ বিরক্ততার বীজটি সন্তানের এই সময়ের পক্ষতাড়নার সমূহ উপ্ত হয়ে যায়। আর বাইরের জগতটি যখন সন্তানের জীবন সীমায় ধরা পড়ে, আকাশের মুক্ত জীবনে বিচরণ পর্বান্তে সে যখন আবার নিজেই সংসারের দাঁড়ে ব'সে নিজেকে, নিজেদের, গুটিয়ে এনে সন্তর্পণে

মনের মাঝারে আবার একটি ইচ্ছাকে তা' দিতে সচেষ্ট হয় তখন মা-বাবার দৃষ্টিতে অতীত ফিরে আসে ; কিন্তু সেই অতীতের কোনও ছাপ পড়ে না সন্তানের মনে, কারণ তার সেই অতীত ছিল না, এবারে গড়তে চলেছে মাত্র। তাই, যা তার নেই তা কেন নেই বলে আফসোস করারও তো কোন কারণ থাকতে পারে না! আর যা তাদের মা-বাবার আছে তা আছে বলেই তো তাঁরা নাতি-নাতনীর মধ্যে পুনর্বার খুঁজে পেয়ে আনন্দের বন্যায় আপ্লুত হতে পারেন।

সন্তানদের বেলায় স্মৃতি কিভাবে কাজ করে? তাদের মনে তরুণ কালের শাসন-বেষ্টন-নিষেধগুলো বেদনার অভিজ্ঞতা হয়ে জমে থাকে, যৌবনের বাধাবন্ধহারা অন্ধ-যাত্রাপথে মা-বাবার অভিভাবকত্ব বর্শা ফলকের মতো খোঁচা দিতে থাকে, আর দৃষ্টিভঙ্গিজনিত প্রভেদ, মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক বৈপরীত্য এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-মানসিক বিরুদ্ধতাগুলো প্রতিপদে প্রতিক্ষেত্রে দূরত্বকে বাড়িয়েই তোলে। সন্তানরা অতীতের স্নেহভরা সবুজকে ভুলে যায়, মা-বাবার নিশিজাগরণক্লিষ্ট দিনগুলোকে জানতেই পারে না, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সদাসতর্ক বাল্যকালের স্মৃতি তাদের হারিয়ে যায় বয়সকালের উপদেশ-নির্দেশ অভিভাবকত্বের স্টিমরোলারের চাপে। প্রত্যেক সন্তানই তাই যৌবনে মা-বাবার বিরুদ্ধ শক্তি, ব্যক্তিত্বের সংঘাতে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সন্তানরা সংসারমুখী হবার প্রাক্কালে, জমে ওঠা এই বিষাক্ত বিরুদ্ধতার শিকার হয়ে পড়তে পারে। আর তার পরেই সদ্যকাটা খালের নোতুন জল বেয়ে স্বার্থের বিভেদপথটি খুলে যায়। 'পরিবারের মধ্যে পরিবার' বোধটি দানা বাঁধে, সেচন পায় এবং সুতরাং কলায় কলায় ষোলকলার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই নোতুন পরিবার পরিকল্পনায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গা মিলে যায়; জৈবচেতনায় সাড়া জাগিয়ে নোতুন জলের ঢেউ ওঠে, নোতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, সূচনা ঘটে নোতুন মূল্যবোধের। আমাদের সমাজ পরিবার পুরুষ প্রধান, পুরুষ শাসিত। অবশ্যই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ ব্রহ্মপুত্রেই নোতুন দৃষ্টির, নোতুন মূল্যবোধের আর নোতুন সংস্কৃতির জোয়ার আসে। আসে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বেয়ে, দিবসের দৃশ্যমান চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের আলো হাতে নয়; আসে অত্যন্ত সন্তর্পণে, ধীর সরীসৃপ গতিতে, নির্বাপিত আলোকের ঘন যামিনীতে; জানালা দরজা খোলা বাতাসের স্পর্শে নয়; আসে রক্তের দৃপ্ত-গতি ধমনীর পথ বেয়ে দেহ-নৈকট্যের একাত্মতার শিহরণ মেখে মেখে, মুক্ত দৃষ্টির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হয়ে নয়। আর তাই বলা যায় পুরুষ প্রধান সমাজ যেন ঐ

একটুখানি পোকায় খাওয়া কলঙ্কের বাইরের সমগ্র চন্দ্র বক্ষটি ! পুরুষের পায়ে এই অদৃশ্য বেড়িটি প্রকৃতি স্বহস্তেই পরিয়ে দিয়েছেন ; লখিন্দরের সুরক্ষিত দুর্গপ্রমাণ বাসস্থানে ঐ একটি মাত্র ছিদ্র ছাড়া আর সর্বত্রই তো পৌরুষের বেষ্টনীটি বজ্র কঠিন সত্য ছিল ! সন্তানের সদ্য-স্মৃতির বাতাবরণে এই একটি মাত্র ছিদ্র পথে যে পরিবার সর্পটি তার শীর্ণ দেহখানি অনুপ্রবিষ্ট করার সুযোগ পায়, সেই স্বার্থের দেহখানিই ধীরে সুস্থে চন্দ্রকলায় বেড়ে বেড়ে একদিন ভূমিকম্প ঘটানোর শক্তি অর্জন করে ফেলে। সব পুত্র সন্তানেরাই, অচিরেই, পুত্রত্বের খোলস ছেড়ে স্বামীত্বের বর্মে আত্মসমর্পন করে থাকে। ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে মাত্র। আর সব কন্যারাই ক্রমে ক্রমে পুত্রবধূত্বের আবরণ সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীত্বের নিশ্চয়তায় অবগাহন করতে সচেষ্ট হয়। অধিকার বোধ পুরুষকে বেশি মাতাল করে না নারীকে তা বোধহয় প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। প্রশ্ন রাখে কতটা ঘোমটার আড়াল রাখা সম্ভব, কতটাই বা protocol বজায় রাখা চলে আর কতটা 'ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি' সফল হতে পারে।

পুত্র থাকে সংসার গড়ায় মত্ত, দিক-বিদিক জ্ঞানহারা মাতালের মতো সদ্য-প্রাপ্ত বেদ-বেদাঙ্গে' নিমজ্জিত, একচক্ষু হরিণের মতো সদা ভীত-ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত, 'পান চুনের' মুহূর্তে মাত্র সম্ভাবনায় সদাই ব্যস্ত। এখানেও প্রকৃতি ; সেই নিয়মের রাজত্ব। অন্যদিকে সম্ভাব্য সম্রাজ্ঞীর স্বর্ণমুকুটটি শনৈঃ শনৈঃ কাছে দেখে দেখে নির্ভুল দাবার ঘুঁটি চালেন খাল বেয়ে আসা আপাত-শান্ত,বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে সুনিপুণ তার সহচরী। এখানেও সেই প্রকৃতি, সেই অনিবার্যতা। যে স্বল্প-সংখ্যক নারী গৃহিনী হতেই প্রকৃতি নির্দেশিত, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে নয়, তাঁরা অশেষ দুঃখে, অসীম ধৈর্যে নিজ নিজ আসনটিকে স্বাভাবিক প্রাপ্তিতে উজ্জ্বল করে তোলেন। অধিকাংশের অধিকার বোধ ঘরের মধ্যে ঘর গড়ে তোলে।

প্রত্যেক পিতার থাকে নিজ নিজ ইতিহাস, তাই সে ইতিহাসকে ধরে রাখতে চায়, গড়ে তুলতে চায়। সন্তানের থাকে না ইতিহাস, সে ইতিহাসের কোলে-পিঠেই বড় হয়, সৃষ্টির বেদনাবোধ তার থাকে অজানা। তাই সে স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায়। ভাঙ্গাটা তাই পিতার পক্ষে নয়, পুত্রের পক্ষেই সহজ হয়। যার ছিল তারই ভাঙ্গার ভয়, যার নেই তার ভাঙ্গার ভয় থাকবে কেন ? এবং, এখানেই ট্র্যাজেডী। যখন পুত্র একদিন বিকেলের রোদ গায়ে মেখে স্থিতধী হবে তখনই অতীত তার কাছে ফিরে আসতে চাইবে তার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে।

সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাতা পিতার আত্যন্তিক ব্যাগ্রতা যেমন সন্তানের কাছে

অকারণ পরাধীনতার জ্বালা বয়ে আনতে পারে, ঠিক তেমনিই সন্তানের স্বাধীনতা প্রিয়তা মাতা পিতার মনে উৎসারিত করতে পারে অনেক অকারণ দীর্ঘশ্বাস। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষের জগতে আবদ্ধ থাকে বলেই মনে হয় একটা বৃত্ত-পর্ব সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সম্পর্কে টান ধরে, ছিঁড়ে যায়, কখনও বা কষ্টে-সৃষ্টে কোনমতে প্রাণ ধারণের মতো করে একটা শত-তালি দেওয়া আচ্ছাদনে সম্পর্কের বহুৎসবকে চাপা দেবার করুণ প্রচেষ্টা চলে।

পশ্চিমের দেশগুলো ক্রমশই মুক্তি দিয়ে মুক্ত হতে চাইছে, স্বাধীনতা দিয়ে নিজেরা স্বাধীনতা পেতে চাইছে। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হাতে স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক তুলে দিয়ে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস আর সন্তানের জ্বালা দুটোর হাত থেকেই রেহাই পেতে চাইছে। তার ফলে ওদের দেশে একাকিত্বের বিষম ভারবাহী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওদের দেশের এই অঙ্গ-বিচ্ছিন্ন করে—এ্যামপুটেট্ করে—সম্পর্ক স্থির রাখার প্রক্রিয়াটি ভাল কি মন্দ, সুফল-প্রদায়ী কি কুফল-প্রদায়ী তা ওরাই ভাল জানে। আমাদের দেশে 'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে' নীতিতে পুত্রকে মিত্রের মতো ব্যবহারে যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেবার ঘোষণা আছে, ঘরের মধ্যে ঘরের দ্যোতনা নেই সেখানে। ওরা ওদের দেশে ঘরকে আলাদা করে দিচ্ছে বলেই ঘর ভাঙার প্রশ্ন উঠছে না; আমরা পারিবারিক ইতিহাসের ধারাটিকে বহমান রাখতে গিয়ে প্রায়ই সূত্র-ছিন্ন হয়ে পড়ছি। ওরা অর্ধেক ত্যাগ করে বাকি অর্ধেক বাঁচাতে ব্যস্ত তাই ওদের বেদনা-বোধও অর্ধেক; ওরা agree ক'রে disagree করেছে। আমরা সবটা বাঁচাতে সবটাই হারাচ্ছি তাই আমাদের বেদনাবোধ পূর্ণাঙ্গ; আমরা disagree করছি agree করতে। ওরা পণ্ডিতের মতো ব্যবহার করছে; আর আমরা সংস্কারের বোঝা ঘাড়ে করে ভারকে কেবলই বাড়িয়ে চলেছি।

সম্পর্ককে সুতোর সঙ্গে তুলনা করেই আমরা ছেঁড়ার পথে পা বাড়িয়েছি; একে যদি আলো-বাতাসের মতো করে সহজ করে নেওয়া যেতো তা হলে ছেঁড়ার বা হারানোর প্রশ্ন দেখা দিত না। সুতোয় টান পড়ে, টন টন করে, ছিঁড়ে যায়। পিতাপুত্রের, মাতাকন্যার, ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্কও তাই strained হয়, stress-কে সহ্য করতে পারে না। যদি আলোর মতো সর্বত্র প্রসারী হত, যদি বাতাসের মতো elastic হত তাহলে অনেক সহজে কাছাকাছি থেকেও দূরে দূরে থাকা যেতো, দূরে দূরে থেকেও মনের পাশাপাশি থাকা যেতো।

স্বাভাবিককে সহজ মনে বরণ করে নেওয়াই বোধহয় সব থেকে কঠিন।

জীবনে সব কিছুকেই সংগ্রামের আর সংঘর্ষের পথে পেতে হবে এমন কোনও কথাই নেই। কিন্তু আমাদের মনে জীবনের অনুসরণ প্রতিনিয়তই যেন সংগ্রামকেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ করে তুলছে; দম বন্ধ করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রক্তচক্ষু দৃপ্ত পদক্ষেপ যে একমাত্র ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষের প্রকাশ নয় তা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। শান্ত চিত্তে, ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর সময় নির্বাচনে যে অনেক কঠিনকেই সহজ করে তোলা যায় সে কথাটা আমাদের কে বলে দেবে?

যারা চোখ বন্ধ করে সম্পর্কের আলোটুকুকে অস্বীকার করতে চায়, যারা দম বন্ধ করে সম্পর্কের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথরোধ করতে চায়, তাদের জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া নান্যপন্থা।

যতো মত ততো পথ। ঈশ্বর-সাধনায় এটা যেমন সহস্র কথার এক কথা, প্রেম-ভালবাসার সাধনাতেও তেমনি লক্ষ কথার এক কথা, যতো পথ ততো মত। ধর্মীয় চেতনায় মতটা আগে আসে, হস্তান্তরিত হয়, সংস্কারবদ্ধ হয়। পথটা একমাত্র পেঁছোনোর জন্যে। তাই কে কোথায় পেঁছতে চায় সেই লক্ষ্যটিই লোকের পথটিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। প্রেমের পথটাই বিচিত্র, প্রত্যেককে নিজের নিজের করেই পেয়ে নিতে হয়, খুঁজে নিতে হয়, দেখে নিতে হয়। তাই কে কি ভাবে পায় তার উপর বিশ্বাসটা, বা মতটা দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রেমও তো ঈশ্বরই। অনেকের কাছেই। সারাজীবন না হলেও জীবনের কোনও কোনও মোড়ে তো বটেই। ভালবাসাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? আর শুধু ধর্মের পথই একমাত্র 'কঠিন অতি' নয়; প্রেমের পথও কম কঠিন নয়। ঐতিহ্য সকলেরই জানা, তবে 'সত্যটি' সকলে সমান সহজে বলতে পারে কি? বলতে যে পারে না তার প্রধান কারণ আমাদের সভ্যতার দায়। প্রকৃতির অস্বীকারেই সভ্যতার জন্ম; মহাজন পণ্ডিত বলেছেন, প্রবৃত্তির মূল্যে সভ্যতার প্রাপ্তি।

সভ্যতার প্রধান কাজ আবার সহজকে কঠিন করে তোলা। যা সরল যা সহজ, তাকে জটিল করাই তো সভ্যতার কাজ। অগ্রগতি মানেই তো পাশবিক থেকে মানবিকে উত্তরণ। অবশ্যই ক্রমান্বয়ে, ক্রমপর্যায়ে। অভিব্যক্তির ধাপে ধাপে যা স্বতঃ তাই পরতঃ, যা জলেজঙ্গলে আবহমান ঋতু-বৈচিত্র্যের মতোই আসা-যাওয়া ক'রে প্রাণী জগতের শ্রেণীবৃদ্ধিকে উত্তরোত্তর করে চলেছিল তাই সমাজ-নিয়মের নিগড়ে আটকা প'রে প'রে আজকের 'না-না-না'-তে এসে দাঁড়িয়েছে। নেতি-নেতি করে যে শুধু ভারতীয় দর্শনে অনির্বচনীয়কেই পাবার কথা বলা হয়েছে তাই নয় সভ্যতার জীবন বেদটিও ক্রমশ ঘোষিত 'এটা নয়, ওটা নয়'-এর অকরণীয়ের নির্দেশে শৃঙ্খলিত হয়ে চলেছে। বাল্যকাল থেকেই যেমন শিশুর জন্যে 'এটা করবে না' 'ওটা করবে না', 'এ-রকম করতে নেই, ও রকম করতে নেই'-এর নেতি বাচক সামাজিকীকরণ চলতে থাকে, সভ্যতার শৈশব থেকেও তাই। নৈতিক বিধানের বেশির ভাগই নঞর্থক নীতি-নির্দেশ। সর্বদেশে সর্বকালেই।

এই একই বিষয়কে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ?' এ-যেমন কবির প্রশ্ন তেমনি 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার'-ও তেমনি আমাদের সোচ্চার ঘোষণা। কিন্তু সভ্যতা মাত্রই স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। স্বাধীনতা ত্যাগ না করলে, অন্তত আংশিক ত্যাগ না করলে, স্বাধীনতা অর্থহীন। সভ্যতা সেই স্বাধীনতার জন্যে স্বাধীনতার বিসর্জন প্রক্রিয়া। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করা সম্ভব। 'তেন ত্যক্তেন'। অথবা কনফুসিয়সের মতো বলতে হয় 'ডাই টু লিভ্'।

এখানেই একটা মূল প্রশ্ন ধারাল খড়্গ হয়ে দেখা দেয়ঃ কাকে ত্যাগ করব ? ভোক্তা কে ? কার মৃত্যু ঘোষণা করা হবে ? কার বাঁচার জন্যে ? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কি তাহলে অনেকগুলো 'আমি' বসে থাকে ? সে তো থাকেই। শিশু 'আমি', ভোলানাথ ; বৃদ্ধ আমি, কাশি ক্ষক ক্ষক। এবং এমতো অজস্র আমির প্রসেশনের নামটাই তো আমি। জাতকের প্রশ্ন আর ছোটবেলায় শোনা কবিগানের কবিয়ালের প্রশ্ন তো একইঃ 'রথ' কোথায় ? 'বিপিন কৈ ?' 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি'—ক'রে কবির তির্যক উক্তিতেও তো সেই একই প্রশ্ন। এটা চাকা, ওটা ঘোড়া, সেটা রজ্জু ; এই বিপিনের হাত, এই বিপিনের পা এটা বিপিনের মাথা ; কিন্তু কোথায় রথ ? কোথায় বিপিন ?

আমার প্রেম, অমর প্রেম। সব প্রেমই মানুষের ইতিহাসে শুভ্র সমুজ্জ্বল। [কিন্তু ক'টি তাজমহল ?] যত গোলমাল এই 'আমার' প্রেমের 'আমার' মধ্যে। এটা কোন্ আমি-র প্রেম ? প্রকৃতির আমি, সমাজের আমি, কাব্যময় আমি ? বৌদ্ধিক আমি, দার্শনিক আমি, ধর্মের অধ্যাত্ম আমি ? কিন্তু খুঁজে দেখ এই সব আমির যাত্রাশুরু ইন্দ্রিয়-আমিতে। জান্তব আমির চৌহদ্দিতে। আমি বাঁধা আছি আমার ইতিহাসে, জন্মে, স্বভাবে।

প্রতিবাদের ভ্রূকুঞ্চন আমি অনেকের কপালে চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ধীরে। একটু সময় দিতেই হবে। আমরা সকলেই তো জ্যান্ত 'আমি'-রা, ইন্দ্রিয় আমি-রা ? এখানে কোনও প্রতিবাদ আছে ? প্রতিবাদ অবশ্যই হবে যদি বলি আমরা শুধুমাত্র জান্তব, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সর্বস্ব। তা আমার বলার কারণও নেই সাহসও নেই। বীজ থেকেই গাছ ; কিন্তু তাই বলে বীজটাই তো গাছটা নয়। গাছের সম্ভাবনাটুকু বীজের অন্তঃপুরে সুপ্ত ; তাই বলে অকারণে সম্ভাবনাকেই বাস্তব বলব না। তবে বীজের উৎসেই গাছের প্রকৃতিটি খুঁজতে হবে এটা ঠিক।

গল্পের ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর প্রেমভালবাসা, প্রকৃতির কোলে ময়ূরের পেখম তোলা ভালবাসা ময়ূরীর জন্যে, মণ্ডূকের গ্যাঙর্-গ্যাঙ্ মণ্ডূকীর আশায়, অথবা শঙ্খসাপের দ্বৈত বিহারে আত্মনিবেদন, প্রতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ লাগি, এবং ইত্যাদি প্রভৃতির যতো উদাহরণ বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত সূতিকাগারে প্রতিনিয়ত ঋতু-নির্ভর অনুষ্ঠিত সে সবে এক-থেকে-বহুর আবির্ভাব। সে সব ক্ষেত্রে একটাই নিয়ম ; প্রকৃতির নিয়ম, প্রবৃত্তির নিয়ম, সহজ নিয়ম। সেই সত্য যা রচিবে তুমি। এই তুমিটি, এখানে, প্রাণী-প্রকৃতি। আর যখনই বলা হল "কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন" অমনি অন্য কথা অন্য তাৎপর্য এসে গেল। "মনোভূমি" ব্যাপারটাই যে প্রকৃতিতে নেই, আছে মানুষের ক্ষেত্রে। আর মানুষ তো 'আর্টিস্ট', সৃষ্টিকর্তা, শিল্পী। সকলেই স্বীকার করবেন যে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষের শিল্পী সত্তা। বীজের শক্তি-উৎসে, সম্ভাবনার সুপ্তিতে যে বনস্পতির আবির্ভাব তাই প্রেম। শুধু শক্তি জান্তব, কেবলমাত্র সম্ভাবনাটুকু ঐন্দ্রিক। সংখ্যাবৃদ্ধিটাকে আমরা বলি কামুক-পাশবিকতা।

আমরা আমাদের প্রাণী জীবনেতিহাসের যে অধিকাংশ অর্ধাংশ ইতিহাসে রেখে এসেছি সেটাই আমাদের পাশবিক অতীত, ঐন্দ্রিক ইতিহাস। সভ্যতার যাত্রারম্ভে আমরা আমাদের মনোভূমিকে সত্যের জনম ভূমি করতে চেষ্টা করেছি। পূর্বাংশে আমরা প্রকৃতিরাজত্বের খাস তালুকের প্রজা ছিলাম, আর অধুনা-অংশে স্বরাজ্যের অনুসন্ধানে সভ্যতার আবরণে-মোড়কে নিজেদের নাগরিক করে তুলছি।

কিন্তু জলে পড়লে সেই সভ্যতার রং-রূপ আবরণ-মোড়ক সবই একঝটকায় ধুয়ে যায়, সরে যায়, কখনও কখনও একেবারেই মুছে যায়। নিরঞ্জনের পর প্রতিমাটি হারিয়ে যায় খড়-কাঠামো বীজে। যা যায় না, হারায় না, নষ্ট হয় না সে তো সেই ইতিহাসের বীজ, ইন্দ্রিয়ের জঠর-গহ্বর। বৃক্ষ বা বনস্পতি অমর নয়, মরণশীল। বীজ অমর। বীজ থেকেই তো ইতিহাস। বাহিরে কেবল কালো আর ধলো, ভিতরে আমরা সমান লাল। এই রক্তই সকলের মধ্যে বীজ। প্রেম ভালবাসার উৎসমুখ, শক্তিকেন্দ্র, প্রাণস্পন্দন। কালো আর ধলো, পিঙ্গল আর ধূসর, শক-হূন-দল পাঠান-মোগল, সবই পোশাকে আশাকে, রূপে রূপান্তরে উড়ে যায় পুড়ে যায় নিঃশেষে হয় বিলীন প্রেমের আগুনে।

প্রেম তাহলে অনল। সাগর। বন্যা। আরও কতো কি যে আর হিসেব

রাখেন কবি সাহিত্যিকে। আমি অনুলেখক মাত্র। অবধ্য। উপমার সবকটিই তো প্রকৃতি, অ-সভ্য অ-সংস্কৃত নিরালম্ব নগ্নতা। যখন তাকে এক বিন্দু নয়নের জল বলে শ্রী-সমৃদ্ধি-সম্পন্নতা দেওয়া হয় তখনও তা প্রাকৃতিক স্বতঃ সৃষ্টির অনুকল্পে উপস্থাপিত! তবেই দেখুন বীজেই তার স্বরূপ প্রকাশ, আবরণে নয়। নগ্ন নৈকট্যেই প্রেম অঙ্গাঙ্গী। প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কাঁদে।

তাই বলেই কি চেঁচিয়ে বলতে পারি ঃ দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর! তা পারিনা। কেন?

পারি না কারণ পারা উচিত নয়। পারি না কারণ ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পারি না তার কারণ মানবিক পরিশীলন। এই উচিত বোধটা কোথা থেকে এলো? নীতি শাস্ত্রে নিয়ত থেকে নিয়তি, 'ইজ' থেকে 'অট্', বর্ণনাত্মক অস্তিত্বশীলতা থেকে মূল্যায়নাত্মক উত্তরণে একটা যাথার্থ্যের কথা বলা হয়েছে। সেই সমস্যা যেমন গভীর তেমন ব্যাপক। সে এক অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ। সহজ জীবনের সোজা কথাটা এই যে রুটি কাপড় আর গৃহ আমাদের অস্তিত্বের জন্যে প্রয়োজন; জান্তব অস্তিত্বের, বেঁচে থাকার জন্যে অনিবার্য। সেই অনিবার্যের বাইরেও একটা জগৎ আমাদের কাছে ধরা দেয়, হাতছানি দেয়। ফুল দুলে দুলে আমাদের ডাক দেয়, উপরের নীল আকাশ আনন্দের চাঁদোয়া টাঙায়, দূরের দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা আমাদের শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই দেয় না মনকেও টানে, শিউলী আর কাশ ফুল আমাদের হৃদয়ের অন্দরমহলে কি যেন এক তাৎপর্যের দ্যোতনা বয়ে আনে। এ মতো আরো কতো শত। কবি সাহিত্যিকেরা মুখর। আবার কোথা থেকে আসি কোথা চলে যাই? কেনই বা আসি কেন চলে যাই? কে সত্য কে সুন্দর কে শিব তা নিয়েও তো আমাদের কম যন্ত্রণা নয়। দার্শনিকে আর নীতিবিদে মিলে কতো না বিনিদ্র রজনী যাপন। সে কি শুধু অকারণ? আমরা যা আছি আর আমরা যা হতে চাই—এই দু'য়ের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান সেই তো আমাদের বেদনা। আমাদের সব চেষ্টাই তো এই থাকা থেকে হওয়ার দিকে যাবার। প্রাণীরা সন্তুষ্ট; কারণ অ-সন্তুষ্ট হবার 'এরিয়ালিটিই' যে ওদের নেই, জন্মায়ই নি। আমরা অসন্তুষ্ট কারণ হওয়া রূপ ভবিষ্যৎটি সদাসর্বদাই দূর থেকে দূরে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমাদের মানবিক 'এরিয়ালিটিতে' মানবিক কল্প-ভবিষ্যৎটি সদাসর্বদাই সামনের দিশারী। ভাগ্যলিপি একেই বলে।

৯

তাইতো পোড়া কাঠ-কয়লা দিয়ে গুহা-পাথরের দেয়ালে ছবি আঁকলেই আমাদের কাজ শেষ হয় না। আমরা তুলি-রঙ পর্যন্ত পেঁছিতে চাই। ছবিটা একই থাকে, প্রকাশের মাধ্যমটা পাল্টায়। আমরা পাথরের প্রান্ত দিয়ে অন্য পাথরে অস্ত্রের সম্ভাবনাটিকে রূপায়িত করি। কিন্তু যন্ত্রণা আমাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে কুশলতার তৃপ্তি খোঁজে। অন্বেষণ একই থাকে ক্ষমতার আরোপে অসংস্কৃত প্রকাশ সুসংস্কৃত হয়। মনের ভাবভালবাসাও তাই। নেচে-নেচে মিলন-বিহারে প্রজন্মান্তরে পেঁছে যাওয়াটা সহজ হলেও অপরিশীলিত পথ পরিক্রমা শেষ করে সেই প্রক্রিয়াকে শিল্পের সুষমায় সুপরিস্ফুট করে তুলতে চাই। উদ্দেশ্য এক হলেও উদ্বেল হৃদয় তাকে কাব্যের মহিমা দিয়ে, ভোগ নয়, উপভোগ করতে চায়। কেউ তো বুক টান টান করে বলতে পারে না ঃ "চাই না আমি সুসভ্যতার আলোক"। কেন পারে না?

পারে না এই জন্যে যে সভ্যতার স্বরূপই এ রকম। সভ্যতা একবার যাকে ছুঁয়ে যায় সে আর সেই ছোঁয়ার প্রভাব ত্যাগ করতে পারে না। যাকে সে ফেলে এসেছে তাকে আর সে ফিরে পেতে পারে না। ফিরে যেতে পারে না যতক্ষণ মনের আলোটি জ্বালা আছে। অন্ধকার বড় ভয়াবহ। অন্ধকার মনকে অন্ধ করে দেয়, আলোটি নিভিয়ে দেয়। সেটাই প্রত্যাবর্তন। আলো থেকে অন্ধকারে প্রত্যাবর্তন। তমসো মা জ্যোতির্গময়-র পরিবর্তে সেই যাত্রা জ্যোতি থেকে তমসার দিকেই। এটাকে বলি অব-মানসিকতা; অথবা 'পারভার্শন।' আর কখনও কখনও বলি অনিবার্য-আবশ্যিক। তখন সে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি স্বরূপ। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পুরুষের জ্যোতি সান্নিধ্যে আগ্নেয় আলোড়নে সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উৎসমুখে উন্মোচিত করে। প্রকৃতির পক্ষে প্রাকৃতিক; পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। দু'য়ে মিলেই পার্থিব ভালবাসার জন্ম। এবং প্রেম!

কিন্তু দর্শনে যা ব্যাখ্যা, জীবনে তাইই যে বর্ণনা। বর্ণনা বিজ্ঞান, কাব্য নয়; সাধারণ জ্ঞান, দর্শন নয়। কাব্য-দর্শনের তুলি কলমে টান না পড়লে কাঠ-খড়-মাটির স্তূপ তো প্রতিমা হয় না! প্রেম ভালবাসা তো আমাদের প্রতিমা, আমাদের কাঙ্ক্ষিত, আরাধ্য, অভিলাষ।

সর্বজন স্বীকৃত খাদ্য যে রুটি তাকেও আমরা ভালবাসার মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করি। রুটি খাদ্যসারের যোগান দেয়, মোড়কটি মনের তুষ্টির 'আবরণ'। তবুও কি বলতে পারি মোড়কটি মূল্যহীন? রসবোধ রসে না বোধে? পায়সান্নের সৌকর্য কি পায়সে না স্বাদ গ্রহণে? বস্তুর গুণ বস্তুতে

না গুণ-গ্রহণের ক্ষমতায় ? সহজ করে বললে, ফুলের সৌন্দর্য ফুলের মধ্যে না সৌন্দর্য গ্রহণের মানসিকতায়। যদি ফুলেই হত তাহলে তার জন্যে একটা রসিক মনের প্রয়োজন হয় কেন ? তৃণভোজী প্রাণীর কাছে গাছ এবং ফুলে কি প্রভেদ ? কোনও মূল্যান্তর আছে কি ?

এই মূল্য দেবার পদ্ধতির নাম কাব্য সমালোচনা, অথবা যুক্তায়ন ('র‍্যাশানালাইজেশন')। 'রিভিউ' বা মূল্যায়ন। আরও কতো ভাবেই এটা করা হয়। প্রেম ভালবাসা কি তাহলে যুক্তায়ন মাত্র ? একটা 'সাবলিমেশন' মাত্র ?

এবারে একটু অন্য দিকে আলোকপাত করা যাক। মাতা-পিতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার সম্পর্ক, ভ্রাতা ও ভগ্নীর সম্পর্ক, ঠাকুর্দা ও নাতনীর সম্পর্ক, এবং আরও অনেকানেক সম্পর্ক আছে আমাদের মধ্যে, আমাদের পরিবারে, সমাজে, জীবনে। কোথায়ও সেই সম্পর্ক রক্তের ধারায় কোথায়ও মনের নৈকট্যে নিশ্চিত। এই সম্পর্কযুক্ত জনগোষ্ঠীর বাইরে আছে কোটি কোটি জন-জনতা যারা আমাদের কাছে 'ব্যক্তি' (পার্সন) নয়, 'ইনডিভিজুয়াল' মাত্র, 'লোক'। এই 'ক্যানভাসে' দেখলে তিনটি সংযোগ সম্পর্ক পরিষ্কার ধরা পড়ে। এক, সম্পর্ক আছে এবং প্রেম ভালবাসার উৎসে-পত্রে-পল্লবে সেই সম্পর্ক নির্ধারিত, যেমন স্বামী স্ত্রী, প্রিয়া-প্রিতম, প্রেমিক-প্রেমিকা। দুই, সম্পর্ক আছে এবং প্রেম ভালবাসার অ-জৈবিক মূল্যবোধের বি-দেহী নৈকট্যে সমাদৃত, যেমন মাতা-কন্যা, পিতা-পুত্র, দাদু-নাতি-নাতনী। তিন, সম্পর্কের 'অভাবটাই' আছে সম্পর্ক হয়ে ; সম্পর্ক হীনতাই সেখানে একমাত্র সম্পর্ক, যেমন হাটে-মাঠে-বাটে, পথেঘাটে ট্রেনে লোকের সঙ্গে লোকের। সে সব 'অভাব-সম্পর্কের' সংযোগে নর-নারী, মানব-মানবী, স্ত্রী-পুং ইত্যাদি প্রধান। শ্রেণী বিন্যাসের অন্যান্য নীতিও সেখানে ব্যবহৃত হয় যেমন শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ (বয়সের নিরিখে), সুস্থ-অসুস্থ (স্বাস্থ্যের নিরিখে), বিবাহিতা-অবিবাহিতা এবং এমতো কতো শত যা পরিসংখ্যানবিদদের কাজে লাগে। এই লেখাতে আমাদের কোনও কাজে আসবে না।

এই সম্পর্কটা কি ? সমাজতত্ত্ববিদ বলবেন বিপদসঙ্কুল প্রাক্-ঐতিহাসিক সময় থেকেই সামাজিক নিরাপত্তাবোধ মানুষকে, অন্যান্য প্রাণীর মতোই, দলবদ্ধ করেছে। এই দলবদ্ধ-প্রবণতাই, এই আত্মরক্ষার চাহিদাই সামাজিক সম্পর্কের মূলে। বাধা-নিষেধের জোর ততই বেড়েছে যত বৃহৎ-দল ক্ষুদ্র-দলে ভেঙেছে।

যার শেষ পরিণতি এখন ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিবার গঠনে প্রকাশ। হেগেল বলবেন 'বিশ্বচেতনা' নিজেকে প্রকাশ করতে স্থিতি-অস্থিতি-সংস্থিতির চক্রে ভাঙ্গা গড়া করে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলবেন জীবনের আত্মপরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাথার্থ্যে পৌঁছানোর, শ্রেয়স্-এ উত্তরণের অভিব্যক্তি। মার্কস বলবেন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা একটা বাস্তব সমঝোতা। মনোবিজ্ঞানী জানাবেন যে সম্পর্কটা আসলে প্রবৃত্তির শক্তিকে মনের ইচ্ছা-অনুভব-বুদ্ধির দড়ি-দড়া দিয়ে বাঁধা একটা অবস্থা, একটা 'সাবলিমেশন' যা মানব মনের ক্রম-প্রাপ্ত গভীরতা আর প্রসারতা দিয়ে নিশ্চয়করা মাত্র। সমাজ-দর্শন বলবেন যে ভৌত বিশ্বে যেমন কার্য কারণ পরম্পরা ভৌত-রসায়ন জগতের যাবতীয় সম্পর্ক নিশ্চয় করে ঠিক তেমনি মানব সমাজেও ব্যক্তিমন-সমাজমনের মধ্যে একটা অনুরূপ কার্যকারণ নীতি (প্রিন্সিপ্‌ল্‌, ল' নয়) সদা ক্রিয়া শীল।

এ-সব তাত্ত্বিক জঙ্গলের বাইরে সহজ-বোধের সোজা আলোয় দাঁড়ালে কষ্টও কমে, বোঝাটাও সরল হল। প্রথম দুটি সম্পর্ক-শ্রেণী জৈব-সামাজিক হয়েও মানসিক নৈকট্যে গণ্ডিবদ্ধ, আর তৃতীয়টি প্রধানতই জৈবিক কখনও সখনও সামাজিক মাত্র ; সেখানে মানসিক নৈকট্য নয়, দূরত্বই প্রভাব ফেলে। নিজের বলে যাকে জানি চিনি ["মাদার ইজ এ ফ্যাক্ট, ফাদার ইজ এ ফিক্‌শন্‌ ; অন্য পরে কি আর বলার আছে বা থাকে !] তাকে দেখি মানে মুখ-চোখ মাধ্যম করে ভিতরে প্রবেশ করি, সেখানে স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি খুঁজে পাই। আর যাকে নিজের দলের মধ্যে পাই না, নিজের বলে চিনি-জানি না তার কি দেখি ? কালিদাসের শকুন্তলার বর্ণনায়, কবি সাহিত্যিকের দেহ-পরিমাপ-পরিসংখ্যানেই তো ? কেন ? রাধা যখন নারী মাত্র তখন তার রূপবর্ণনায় কলম স্বাধীনতা পায়, সেই রাধাই যদি আমার মাতা-ভগ্নী-কন্যা তাহলেই তার গুণবর্ণনায় আমাদের স্বরাজ। কেন ?

ফুল যখন অপরের বাগানের, অপরের খোঁপায় গোঁজা তখন তা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রস্ফুটন মাত্র ; যখন সেই একই ফুল আমার বাগানে, আমার মায়ের করধৃত ফুল-আহরণ-দানীতে, তখন তা দেবী পূজার অর্ঘ্য। কেন ? এই 'ইন-ফিলিং' 'আউট-ফিলিং' প্রাণী জগতেও আছে, মানুষ-জগতেও আছে। আমাদের বাড়ির কুকুর, টমি, নিজের সন্তানের পাশে অন্য কুকুর ছানাকে পেয়ে জিঘাংসা তাড়িত হয়ে সেই অপাপ-বিদ্ধ শিশুকে হত্যা করেছিল। স্বচক্ষে দেখা, আমি নিরুপায় সাক্ষী। কিন্তু পরমুহূর্তেই তো সেই জিহ্বাই স্ব-জঠর সন্তানদের দেহ-লেহনে

প্রবৃত্ত হল ! কেন ? ক'এক বছর পরেই সেই টমিকেই দেখলাম 'ইডিপাস কমপ্লেক্সের' পুচ্ছতাড়নাহীন স্বপুত্র-সন্তান প্রসবে আকণ্ঠ মগ্ন। কেন ? কারণ ওদের 'নেতি-নেতির' সামাজিকীকরণ নেই, নেই কোনও 'ট্যাবু' কোনও 'ইনহিবিশন' !

প্রেম ভালবাসার কথা এলেই তাই আমরা অনেক অনেক ভারি ভারি ধারণার অবতারণা করি। বীজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার বাসনায় আমরা প্রেম-বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-শাখা বিন্যাসের জয়গান গাই, সবুজ-সতেজ-সাবলীল সুরক্ষার উল্লেখ করি, অনুভব-উপলব্ধি-উৎকর্ষের সুষমাকে নিয়ে কাব্য করি। এ-সবের কোনওটিই অসত্য নয়, নয় শুধু কল্পনা, নয় অলীক। কিন্তু এহ বাহ্য, এই মাত্র সত্য। কারণ এ-সকলই তো আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখিত ভালবাসাতেও পেয়ে থাকি। এবং অনেক বেশি করেই পাই মায়ের ভালবাসা, বাবার স্নেহ ভাইয়ের নৈকট্য দাদুর চিত্ত-মাধুর্য। তবু কেন মন ভরেনা, প্রাণে দোলা দেয় না ? তবু কেন সমুদ্রের গর্জনের জন্যে উন্মুখ হই, প্লাবনে অঙ্গ ঢেলে দিতে চাই, অগ্নুদ্গারে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে সানন্দে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি ?

তাই বলে প্রেম-ভালবাসা কি জান্তব অবিমৃশ্য হতে পারে ? পারে বাদ-বিচারহীন বন্য হতে ? কেন পারে না ? কারণ সংস্কার, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, আশা আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্য-বিন্দু। এই সব মানবিক প্রলেপ, পরিশীলন, পরিসৃজনই খড়-মাটি-কাঠের প্রেম-ভালবাসাকে প্রতিমায়, রূপান্তরিত করে। এই উত্তরণ আমাদের মানবিক দায়, উৎস আমাদের জৈবিক বন্ধন। বন্ধন থেকে মুক্তির পথই অভিসারের পথ। অভিব্যক্তির পথ। তমসো মা জ্যোতির্গময়-তেও তো এই কথা। বীজ থেকে পুষ্পে যাওয়া। তমঃ থেকে সত্যে। অন্ধকার ছেড়ে আলোর রাজ্যে। গন্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে যাত্রা বিন্দু কি মিথ্যা হতে পারে ? আপেক্ষিক, আক্ষেপের নয়।

কিন্তু যখন দু'ধাপ এগিয়ে চার ধাপ পিছিয়ে পড়ি ? চার ধাপ এগিয়ে দু'ধাপ পিছিয়ে ? গোলমাল সেই তখনই। সব থেকে বড় ধোঁকা তো ব্যক্তি যখন নিজেকে ধোঁকা দেয়। এই 'নিজেটা' তার জান্তবও বটে তার ঐশ্বরিকও বটে। প্রেমের রাজ্য পাটে এই দু'এরই সহাবস্থান। জীবনের ইতিহাস প্রেমেই আপাদ-মস্তক। ক্ষোভের কারণ তো দেখিনা। পা এর কাজ ঋজু উল্লম্ব দাঁড় করানোতে, স্থৈর্যশীল চলনের গতিদানে, অগ্রগতির গতি-অংশকে সম্ভব করে তোলায়। মস্তিষ্কে যে সেই সব দায় নেই সে তো তার দোষের বিষয় নয়।

মস্তিষ্কের কাজ তো দূরেকে দৃষ্টিবদ্ধ করাতে। লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং গতি-রেখাটির উদ্দেশ্য-যাথার্থ্য আর মূল্য নির্ধারণে! প্রেম সাগরের এপাড়ও আছে ওপাড়ও আছে, সে তো দুকূল প্রবাহী। প্রেম শুধু ওপাড়ে অথবা শুধু এপাড়ে—একথা বলাতেই সব থেকে বড় ধোঁকা। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় প্রজনন; তাই বলে প্রজনন নেই এমন জীবনও তো মিথ্যা হতে বাধ্য। ফুল আর ফুলের নির্যাস উভয়ই সত্য। মিথ্যা কেবল সমগ্র ফুলকে নির্যাসের সত্যে দেখা, কারণ সেখানে মিথ্যার ভিত্তিতে সৌন্দর্যটি হারিয়ে যায়।

সেই রথের কথায়, বিপিনের কথায় ফিরে আসা যাক। চলাচলের একটা স্বীকৃত যান হিসেবে সমগ্র রথটি যেমন মিথ্যা নয়, তার অংশের মধ্যে সম্পূর্ণের সন্ধানও তেমনি কাঙ্ক্ষিত নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ অবশ্যই বিপিন নয়, কিন্তু বিপিন আছে বলেই তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-কে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে চিনতে পারি। বীজও যেমন সত্য, গাছও তেমনি সত্য। তার ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা, তার পত্র-পল্লব-ফুল সম্ভার সবই সত্য। কিন্তু দৃশ্যমান শালীন সুষমার প্রকাশই সব সত্য নয়। কে বড় কে ছোট-র ঝগড়া বালসুলভ গল্পে-উপাখ্যানেই তাৎপর্য রাখে; আর বিশ্লেষণের হিং-টিং-ছটেও সেই সত্য-দাবি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাৎপর্যময় বলে মনে হয়।

প্রবৃত্তির আমি, বুদ্ধির আমি আর অধ্যাত্ম আমি নিয়ে বিচারের গোলমাল, মূল্যায়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো চলে আসছে সেই 'এ্যারিস্টটলের' সময় থেকেই। ব্রাডম্যান, কনফুসিয়াস, রবীন্দ্রনাথ হয়ে সেই সমস্যা তো যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। 'এক্সেলেন্স'। সেটি কি? শব্দ বা 'টার্ম' ব্যবহার করে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে সরিয়ে নেওয়া যায়, যুদ্ধ থামে না। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' দৃঢ় মনের আকাঙ্ক্ষা হয়েও সেই ঈশ্বরই একমাত্র আরাধ্য, সর্বৈব প্রার্থিত হয়ে, সব সমস্যার 'চাদর' হয়েই হাজির হয়েছেন বার বার। সে সমস্যা জৈবিক হলেও যেমন, সামাজিক ধর্মীয় দার্শনিক হলেও তেমনি। সহজকে জটিল করে নিয়ে যে সমস্যা তৈরি করা মানুষের স্বভাব সেই সমস্যা থেকেই উদ্ধারের জন্যে হয় পূর্বপ্রান্তে—জৈবিক সূত্রে, অথবা উত্তর প্রান্তে—ঈশ্বর সকাশে পৌঁছানো ছাড়া গতিই থাকে না।

প্রেমের শুরু 'ওভামে'-'স্পার্মে'। পরিবারের মধ্যে সে প্রাণ পায়। এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই পরিবার-বৃক্ষে ডাল-পালা-পত্র-পুষ্প দেখা দেয়। 'এপিফেনমেনন'। তখন সেই মনের মাধুরী মিশায়ে রচিত সত্যকেই সব মনোভূমিই অধিক সত্য বলে মনে করে, প্রকাশ করে, তাজমহল বানায়।

প্রেমের জয় হোক।

প্রেম মানুষকে প্রোথিত করে, ভালবাসা তাকে ভাসায়। প্রেমের উৎসে ভালবাসার বনস্পতির প্রকাশ। এ সত্য প্রাণী জগৎ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ভাবেই সত্য। প্রেমের কচিৎ ভিতে যে নৈকট্য, ভালবাসার দৈনন্দিনতার আলো বাতাসে সেই ব্যক্তি-পরিবার-গোষ্ঠী মন আন্দোলিত। বীজ এক-কালীন, পত্রপুষ্পশোভা বহু কালীন। এটাই জীবন। প্রকৃতি আর সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র।

কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তো এই শুরু এবং শেষ মিলন-সেতুতে আবদ্ধ হতে পারে না। সু-সভ্যতার তীব্র আলোয়, কঠিন চাপে ব্যক্তি পিষ্ট হয়। আসে একাকিত্ব। এই একাকিত্ব বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। আর এক ধরণের একাকিত্বও তৈরি হয়। বীজের তীব্র টানে, প্রবৃত্তির কঠিন তাড়নায় ব্যক্তি চালিত হয়। আসে একাকিত্ব। এই একাকিত্ব জান্তব ব্যষ্টি চেতনার জন্ম দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি তার পূর্ণতাকে হারায়, জীবনের সেতুবন্ধটি খুইয়ে বসে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা বোধে সচেতন যন্ত্রণা থাকে, জান্তব অবক্ষয়ে বোবা নিঃস্বতা থাকে। প্রথম প্রকারের যন্ত্রণা বোধ, বিচ্ছিন্নতা বোধ বা একাকিত্ব মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে, করেও থাকে, আবার প্রকাশের অক্ষমতা তাকে আত্মহননেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের একাকিত্ববোধ যাকে জান্তব অবক্ষয় বলেছি, ব্যক্তিকে সমাজ বিরোধী, কীট-দষ্ট, অপরাধ-প্রবণ করে তুলতে পারে, আবার সেই শক্তির, ধ্বংস-শক্তির জোগানের অভাবে, আত্মহননে ঠেলে দিতে পারে। দু'টি ক্ষেত্রেই, আমাদের বিশ্লেষণে, উৎসে প্রবৃত্তি শক্তি এবং পরিণতিতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আত্মহনন। এই আত্মহনন বলতে জৈবিক আত্মহননকেই বোঝাতে চাই না, যে কোনও প্রকারের অ-স্বাভাবিকতাকেই, অবনমনকেই বোঝাতে চাই। আর একমাত্র বাঁচার ক্ষেত্রই সেই সব একাকিত্বেই প্রশস্ত যেখানে সচেতন যন্ত্রণা বোধ সার্বিক প্রকাশে নিজের কষ্টের প্রকাশ করতে সক্ষম—গানে, কবিতায়, শিল্পে, সাহিত্যে, মাটিতে পাথরে, তুলিতে কালিতে। এই একাকিত্ব নিজের গভীর বেদনাবোধের মধ্যে সর্ব-মানুষের মনের কষ্টকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। সচেতন বলতে এই সচেতনতাকেই বোঝাতে চাই। আর এই চেতনা যখন মনের গভীরে করাঘাত করে তখনই একাকিত্ব বহুত্বের সাধনায়, বিচ্ছিন্ন হয়েও, সার্থক হতে পারে। এখানেও একটি সার্বিক সেতুবন্ধ তৈরি হয়ে ওঠে। একের কষ্ট বহু মনের অনুভব তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে সেই একের

একাকিত্বে অবগাহন করে। নিজেকে হারিয়ে ফেলেও এই যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট একাকিত্ব-লাঞ্ছিত বিচ্ছিন্নতা-আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে অমর করে তোলে।

উৎসটির অন্বেষণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই একাকিত্বের উৎসটির। আমরা তো প্রত্যেকেই একটি 'ওভাম্-স্পার্ম' বিন্দু হয়ে যাত্রা শুরু করি। এবং একদিন বিশ্বকাঁপান চিৎকারে ভূমিষ্ট হই এই পৃথিবীতে। একেবারেই একা-একা। প্রক্রিয়াতে, ভূমিষ্ঠ হবার প্রক্রিয়াতে, অনেকেই সামিল থাকেন, কিন্তু ব্যক্তি-বিন্দুর ব্যক্তি-স্বরূপটি অবশ্যই একাকিত্ব বেষ্টিত থাকে। তার এই আবির্ভাব অবশ্যই একটি ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। সেই ক্ষেত্রটি মাতৃজঠর হলেও প্রসবোত্তর কালে অবশ্যই একটি গোষ্ঠী। প্রাণিজগতেও গোষ্ঠী ক্ষেত্রে, মানুষের সমাজেও গোষ্ঠী ক্ষেত্রে। এই গোষ্ঠীর প্রকৃতিটি 'ট্রাইব', যৌথ পরিবার, একক-পরিবার এবং, অত্যাধুনিক কালে, শুধু মাত্র মাতা-সন্তান 'পরিবার' হতে পারে। (লিভিং টুগেদার-এর প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে)। সুতরাং যা কিছু প্রভেদ তা সংখ্যার এবং সম্পর্কের টানাপোড়েনে সৃষ্ট ক্ষেত্রটির প্রকৃতিগত।

এবারে দেখুন বাল্যে নয়, কৈশোরে নয়, যৌবনে নয়, একাকিত্ব-বোধ ধরা পড়ে কোন সময়ে? একাকিত্ব বোধের বীজটি সুপ্ত থাকে অনেক গভীরে কিন্তু কখন সে সাস্তিত্ব উপস্থিতিটি ঘোষণা করে? উত্তর যৌবনে। এই উত্তর যৌবন প্রতিটি জীবনের 'ক্যালেন্ডার' স্থির করে দেয় না, নিশ্চয় করে দেয় তার মানসিকতা। বুড়ো বয়সেও যেমন অনেক তরুণ-মনা লোক দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় তরুণ বয়সের অনেক বৃদ্ধকে। বার্ধক্যের জরাগ্রস্ততা যখনই ব্যক্তি-মনকে পরাভূত করে তখনই উত্তর যৌবন।

প্রথমে দেখলাম একাকী আমাদের পার্থিব যাত্রাটি। তার পরে দেখলাম সেই যাত্রা একটি 'ক্ষেত্রে' শুরু। এবং তৃতীয়ত দেখলাম একটি মন যার বয়স আছে, মানসিক বয়স প্রধানত। এই ক্ষেত্র-ব্যক্তি-মন বৃত্তটিতে আর আমি নই, মানে ব্যক্তি 'আমি' নই, অনেক 'আমির', ব্যক্তির, অধিষ্ঠান। এই বৃত্তটি যেমন পরিসরে ক্রম ব্যাপ্ত হয়ে হয়ে পৃথিবীকেও 'একত্বের নীড়' করে তুলতে পারে, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে এক পরিবার বলে মনে করতে পারে, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র হতে হতে একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক-স্বয়ং-অহং সর্বস্বতায় বিন্দুবৎ সীমাবদ্ধও হতে পারে। 'হেগেলের' মত অনুসারে আমরা শুধুমাত্র বিশ্বচেতনার অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব নই; বেন্থামের মত মতো আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষী স্বার্থপর প্রাণী মাত্রও নই। মহাপুরুষদ্বয়ের মধ্যে এক জায়গায় মিল দেখা যায়। দু'জনেই

মানুষকে কোনও স্বাধীনতা দিতে চান না। ঈশ্বরের বা বিশ্বচেতনার চলনেই, দ্বান্দ্বিক বা পরীক্ষামূলক যাই হোক না কেন, যদি আমাদের চলন তাহলেও আমাদের স্বাধীনতা থাকে না, আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যান্ত্রিক, বা পরিমাণগত, তাড়নাতেই যদি আমরা তাড়িত তাহলেও আমাদের স্বাধীনতা থাকে না। যন্ত্রণা বোধ, একাকিত্ব, বা বিচ্ছিন্নতার বেদনা তো আমাদের স্বাধীন চেতনার দান। আমরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতও নই, সম্পূর্ণ অ-নিয়ন্ত্রিতও নই, আমরা আমাদের ব্যক্তি-স্বরূপে অবশ্যই স্ব-পরিচালিত, স্ব-নিয়ন্ত্রিত।

এই প্রতিটি 'স্ব'-কে আমরা যেভাবে গড়ে তুলি, যে মানসিকতায় সৃষ্টি করে নিই সেই আমাদের 'প্রত্যেকের 'স্ব'।

এই স্ব-টি কোনও ন-যযৌ-ন-তস্থৌ আকাশ-নিবাসী সম্পর্কহীন মধ্য-বিশ্বে ঝুলে থাকা জিনিস নয়। এটি গোষ্ঠী-পরিবারের মৃত্তিকা-ক্ষেত্রে বিন্দু-বীজ উৎসারিত বহু-সম্পর্কের স্নেহ-মমতা প্রীতি-ভালবাসা, দ্বেষ-মাৎসর্য এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জল সেচনে বেড়ে ওঠা ব্যক্তি-স্বরূপ। এই স্বরূপটি বাল্য-কৈশোর-যৌবন পর্ব পার হয়ে যখন নিজের নিজের স্ব-টিকে খুঁজে পায় তখন পাশাপাশি বৃত্তগুলোও প্রভাব বিস্তার করে। বাল্যে আমাদের যা চাই তা সহজেই পাই— খেলা এবং খাওয়া ; তেমনি বাধা পাই না কৈশোরেও খুব বেশি। যেসব বাধা পাই তা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্যেই পাই। দমন আছে অবদমন নেই, 'সাপ্রেশন' থাকে 'রিপ্রেশন' থাকে না।

যৌবনে উৎসারিত হয় এক নোতুন দিগন্ত, নোতুন শক্তির উৎস, নোতুন চাহিদার জগৎ। সভ্যতা আমাদের স্বাধীনতাকে বিচারকের হাতুড়ি-আঘাতে সমাজ-সমর্থিত দিক নির্দেশ দিতে থাকে। একদিকে অন্ধ তাড়না অন্য দিকে সদাজগ্রত সমাজদৃষ্টির অনুসন্ধানী আলো। রিপ্রেশন বা অবদমন। সম্পর্কের বৃত্তে যারা এতোদিন প্রাণ-বারি-সেচনের যোগ্য ছিল, এখন, এই নোতুন জগতে প্রবেশের পর, তারা সকলেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। নোতুন-প্রাণের সন্ধান চলে। চলতে থাকে। যতক্ষণ এই দ্বিতীয়কে পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ বেদনার-আকাঙ্ক্ষার-কামনার দীপখানি আমরা জেবলেই রাখি। যত বিলম্ব তত অসহায়তা। এবং ক্রমশই তত একাকিত্ব। 'মনের মানুষ' মিললো না, তাই গৃহ মরুভূমি মনে হতে থাকল।

বৃত্ত-পরিসরে তো কোনও অভাব ছিল না, ছোট-বড় বৃত্ত সমূহ তো আমাদের সকল প্রয়োজনই মিটিয়ে দিচ্ছিল। তাহলে হঠাৎ এই উৎ-কেন্দ্রিক

বিক্ষেপের হেতু? বীজের তাড়না, অব্যক্ত কামনার অগ্নি। কিন্তু প্রাণিজগতে যা স্বাভাবিক, সভ্যসমাজে সেখানেই বাধা নিষেধ। একদিকে বোবা ইচ্ছা-বাসনা-তাড়নার প্লাবন অন্যদিকে স্বীকৃত-বাঞ্ছিত সামাজিক বিধি-বিধান উচিত-অনুচিত করণীয়-অকরণীয়ের উপস্থিতি। এই দ্বৈত, বিরুদ্ধ, প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে সেতু বন্ধন সম্ভব হলে একাকিত্ব নেই। যদি এই সেতুবন্ধন যথাযথ সম্ভব না হয় তা হলেই অসহায়তা, একাকিত্ব।

এই একাকিত্বের বোধ বহু প্রকারের হতে পারে, হয়ে থাকে। প্রতিটি মনের পাত্রে প্রতিফলিত এই একাকিত্বের অনুভব বা বোধ স্বভাবতই স্বতন্ত্র হবে। বহু প্রকারের, বহু প্রকৃতির এবং বহু পরিমাণেই তা প্রতিফলিত, অনুভূত, উপলব্ধ। কর্মে একাকিত্ব বোধ, সাহিত্যসাধকের 'লোনলিনেস', সন্ন্যাসীর, পরিব্রাজকের, ধর্মপথ অনুগামীর! গৃহে পিতার একাকিত্ব, মাতার একাকিত্ব, এবং ঠাকুমা-দিদিমা-ঠাকুর্দার একাকিত্ববোধ সবই স্বতন্ত্র, সবই আলাদা। কিন্তু এ সব একাকিত্বের মূলেও কি সেই যৌবনের একাকিত্বের কারণ প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে? পারে যৌন-বোধ, সঙ্গ-সুখ সব একাকিত্বের, জন্ম-মৃত্যু দিগন্তের, সব ব্যাখ্যা দিতে?

শরীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আ-জন্ম মৃত্যু দিগন্তটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাক্-যৌবন, যৌবন এবং উত্তর-যৌবন। এক বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় আবার এই প্রাক্-যৌবনকে 'এ্যানাল', 'ইরোটিক', 'ফেলিক' এবং 'জেনিটাল' পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রবৃত্তি এবং অবচেতনের তাড়নার কথা বলা হয়েছে সেখানে। যৌবনে ক্রমশই এই তাড়না প্রেরণায় 'সাবলিমেটেড' হয়। এটা সভ্যতার দান বা আরোপ। জীবনের অবসন্ন অপরাহ্নে যৌন চেতনার ক্রম-অবসান সূর্যাস্তের নিস্তেজতাকে আবাহন করে। বার্ধক্যের অন্ধকার দিন বয়ে আনে অসহায়তা, ভয়, অনিশ্চয়তা। বেঁচে থাকা মানেই তো এই ত্রি-পর্ব পরিক্রমা। জান্তব বাঁচাতে, মানুষী বাঁচাতেও। প্রভেদ এই যে মানুষের ক্ষেত্রে শক্তির উৎসটিকে সব সময়ে চিনে নিতে না পারলেও সেই শক্তির ব্যবহারকে আমরা আমাদের ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে দিক-নির্দেশ করতে থাকি। আমাদের জীবনে সভ্যতার বাধা-নিয়ম আছে বলেই আমরা অনুশীলন পরিশীলন করে বাঁচতে শিখি, বাঁচাটাকে সুন্দর করে তুলি, আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই বাঁচাটাকেই চিরস্থায়ী করে ফেলেন।

প্রাণী যেমন তার নিজের সুখকে তার গোষ্ঠীর মধ্যে, বৃত্তের মধ্যে, প্রসারিত

দেখে, 'বেন্থাম' সত্ত্বেও, মানুষও তাই তার সুখকে নিজের বিন্দু-ছাড়িয়ে নিকট দূর বৃত্তে প্রসারিত দেখতে পায়। এই প্রসারণের ব্যাপ্তি যত ব্যাপকতর হয় মানুষ ততই স্ব-বিন্দু থেকে মুক্তি পায়। এই চেতনার, এই আশার এবং এই পরিক্রমার নামই তো সভ্যতা। কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ, পরার্থ-সর্বার্থ এ-সবই এই সভ্যতার উৎসে অঙ্কুরিত 'সাবলিমেশনের' প্রাপ্তি।

প্রাণী জগতে নির্জনতা, একাকিত্ব নেই কারণ সেখানে এই ব্যাপ্তির বীজটি তার জীবন-বীজে সংশ্লিষ্ট নয়। মানুষের সম্ভাবনার মধ্যে এ-দুইয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। তাই শক্তির প্রকাশ যখন সভ্যতার দাবিতে সমাচ্ছন্ন হয়ে রূপ পরিবর্তনে, 'সাবলিমেশনে', অক্ষম হয় তখনই 'একাকিত্ব' আক্রমণ করে। স্ব-বিন্দু থেকে যেখানে পর-বৃত্তে উত্তরণের পথ রুদ্ধ সেখানেই স্ব-ক্লিষ্ট নিঃ-জনতা, বিচ্ছিন্নতা বোধ। সে যুবক হলেও সত্য, প্রৌঢ় হলেও সত্য, বৃদ্ধ হলেও সত্য।

বৃহৎ-এর বৃত্তে এই মুক্তি যে কেবলমাত্র বাইরেই প্রাপ্য তা নয়; এই মুক্তি নিজের মনের মধ্যেও পাওয়া যায়। এটাই মানুষের জন্যে প্রকৃতির উপহার। প্রতিটি জীবনের অভিজ্ঞতায়ই তার ভিতরটাও যেমন আছে, তেমনি আছে একটা 'বাইরেটা' যা তার ভিতরে ধরা দিয়েছে। ছোট বড় নানান বৃত্তে বিশ্ব প্রতিটি মনের মধ্যেই বাঁধা পড়ে যায়। যার যেমন মনের গঠন, মনের প্রকৃতি সে তেমন দেখে, তেমন করে পায়। শহরের ভিড়ের মধ্যে থেকেও যেমন 'জনতা আছে মানুষ নেই' হতে পারে, তেমনি হিমালয়ের উত্তুঙ্গ কোনও শীর্ষে বসেও মানুষের সান্নিধ্য অসম্ভব নয়। সেই মনটি চাই যে স্ব-বিন্দু নির্বাসন থেকে মনকে বিশ্ব-বৃত্তে মুক্তি দেবে।

এই বিশ্ববৃত্তটি কোনও 'হেগেলীয়' দর্শন নয়, নয় কোন ধর্মীয় ব্যক্তি-নিরঞ্জন। এটা একটা খেলা; নিজেকে নিয়ে নিজের খেলা। নৈপুণ্য এখানে বড় কথা নয় ব্যাপৃত থাকাটাই বড় কথা। শিশু তার মাকে নিয়ে খেলে, বাল্যকাল ব্যাপৃত থাকে পুতুলে, ড্যাংগুলিতে, হাজারো-খেলনায়। কৈশোর অধিকন্তু বন্ধুত্ব স্থাপনে, যৌবন প্রেমে-ভালবাসায়-কর্মে-সৃজনে-সংস্থাপনে, প্রৌঢ়ত্ব ব্যাপৃত সুরক্ষায়-সুস্থিতিতে এবং বার্ধক্য অতীত জীবনের স্মৃতিরোমন্থনে। এ সব মোটা দাগে এঁকে দেওয়া খেলার জগৎ। প্রজনন ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কোনও না কোনও প্রকাশের চেতনা-বাসনা-প্রচেষ্টা থাকেই। এই খেলার, প্রকাশের মাধ্যমটিকে খুঁজে না পেলেই সব ফাঁকা, সকলই শূন্য। একাকিত্ব। কতো লোক আছেন যাঁরা বাজার করতে এবং খেতে ভালবাসেন।

নেশা। অফুরন্ত অক্লান্ত কর্মবাসনা কতো জনের জীবনকে বৃহৎ-বৃত্তটিতে পৌঁছে দেয়। কেউ বাগানে সময় ব্যয় করেন কেউ বা কাঁথা সেলাই-তে, কেউ কবিতা লেখেন, কেউ সময় কাটান কবিতা পড়ে। ঘর গোছান থেকে পূজো অর্চনা-ব্রত-পার্বণ কতো কিই যে মাধ্যম হয়ে স্ব-বৃত্ত মুক্তির কারণ হয় তার কোনও লেখাজোখা নেই। অসীম-অনন্ত, যেমন অসীম অনন্ত মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্ব-ভাব।

লাভ-লোকসানের হিসেব করে যে চেতনা, যে চেতনা প্রশ্ন তোলে 'কি লাভ বাজারে-খাদ্যে? কি হবে কাঁথা সেলাই করে? কি ফলোদয় হয় বাগান করে? পূজো-পার্বণ তো মূঢ়ের কাজ, নেশাগ্রস্ত অব-মানসিকতা মাত্র'—সেই চেতনা 'নন্দলালীয়' মানসিকতায় আক্রান্ত। যার যেখানে মন লাগে, যার যেখানে মন টানে, সে সেখানেই মনের ফাঁকা সময়টিকে ভরাটের ইন্ধন সংগ্রহ করে। বালকের পুতুল-মাঠ, ঠাকুমার পুজো-কাঁথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিশ্বভারতী, বিবেকানন্দের ব্রহ্ম আর রামাকৈবর্তের হাল-গরু-জমি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্ব-অনুযায়ী ব্যাপৃত, শূন্যতা পূরণে নিয়োজিত।

প্রস্তুতি আর যোগ্যতা। পরিবেশ আর যোয্যতা। দেখে শুনে প্রত্যেকে তার নিজের নিজের জান্তব বাঁচার বাইরে, স্ব-এর কেন্দ্রবিন্দুটি থেকে উর্ধে, সামাজিক বাঁচার বৃত্তটিকে, বিশ্ববৃত্তটিকে খুঁজে নেয়। যে হীরক ফেলে কাঁচের টুকরোটিকে সম্বল করে, যতক্ষণ তার কাছে সেই কাঁচের টুকরোটিই তার মাধ্যম ততক্ষণ কোনও সমস্যা নেই। তার কাছে নেই। আমার-তোমার কাছে, অপরের কাছে, কি লাভ ঐ কাঁচের টুকরোয়? প্রশ্নের শেল হয়ে বিঁধতে পারে। এই মাত্র। নিযুক্ত হওয়াটাই তো আসল কথা, নিয়োজিত থাকাটাই। বিশ্বকে আরও বাসযোগ্য করে যাবার বাসনাটি ভাল কিন্তু অক্ষমের মনে সেই দায় বোধ অসুস্থতার লক্ষণ। এই বিশ্বকে, বিশ্বের প্রত্যেককে উপযুক্ত করে তোলার, মানুষ করে গড়ে তোলার, যুক্তিশীল করে তোলার দায় এ্যারিস্টটলের উপরও যেমন ছিল না আমার উপরেও তেমন নেই। নেই এই ভুবনের ভার। আছে অবশ্যই নিজের নিজের দায়ভার।

সর্ববিষয়ের অত্যন্তম্—গর্হিত; এখানেও এই স্ব-বিন্দু থেকে বিশ্ববিন্দু গমনের ক্ষেত্রেও সেই কথাই খাটে। স্বাভাবিকতা বলে যে মাত্রা বোধ সমাজে প্রচলিত সেই এলাকার বাইরে যে কোনও পদচারণাই বিপজ্জনক। কর্মের ক্ষেত্রে, বিশ্বাস-সন্দেহ-জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং ভক্তির ক্ষেত্রে। স্বাভাবিকের বাইরে

গেলেই গর্হিত। দু'টি ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিকতার গণ্ডি বা এলাকা পার হলে তার অন্য নাম দেওয়া হয়ঃ পাগল বা অস্থির-মতি, অবমানস; আর দুই, প্রতিভাবান, অসাধারণ অমর ব্যক্তিত্ব। আমরা অধিকাংশই যখন সমাজের এই প্রান্তিক পরিসংখ্যানের বাইরে তখন কষ্ট করে সে পথ মাড়ানোটা কোনও কাজের কথা নয়।

বহুর সঙ্গে যোগেই একাকিত্বের মুক্তি। যুক্ত হলেই তো আর বিচ্ছিন্নতা বোধ থাকে না।

আগেই বলেছি এই বহু কোনও বাইরের বহু নয়। এই বহু আছে আমাদের প্রত্যেকের মনে, অন্তরে, অস্তিত্বের মধ্যেই। আবার বাইরেও আছে। যে ভিতরে আছে সেও যেমন বাইরেরই বহু থেকে আহরিত, তেমনি যে বহু বাইরে আছে সেও তো আমাদের ভিতরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই ধরা দেয়। আমরা যখন বিহার করি স্ব-এর একাকিত্বের বিন্দুতে তখনই তো আমারা একা; যখন যুক্ত হই অন্য-পরের বৃত্তব্যাসের অন্য-বিন্দুতে তখনই আমরা অবিচ্ছিন্ন। আমাদের কাজের মধ্যে, চিন্তার প্রকাশে, বিশ্বাসের প্রসারে। নিজের অভ্যন্তরেই আছে গাছ, আছে জঙ্গল। স্ব-বৃক্ষের আড়ালে যদি আমাদের জঙ্গল অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে একাকিত্ব রোধ করবে কে?

'একা কেহ থাকিও না'—এই চেতাবাণী স্বরূপত অসত্য কারণ একা কেহ 'কেহ' হতে পারে না, সমাজের প্রেক্ষিতেই একা তার ব্যক্তিগত একাকিত্বকে অনুভব করে। কিন্তু অনুভব হিসেবে এই উক্তিটি শীর্ষ-দ্যুতি। একা থাকেন মহতো মহীয়ান আর একা থাকেন পাগল-অসংলগ্নমনা। দু'জনের ক্ষেত্রেই এই একা থাকাটা অনিবার্য। একজন দার্শনিক পূর্বস্বীকারে, অন্যজন অবমানসের আঘাতে। এপ্রান্তেও নহে ওপ্রান্তেও নহে যারা আছি মাঝখানে তাদের টেনে নেবার জন্যে আছে প্রত্যেকের শক্তির উৎসটি এবং সেই উৎসের স্রোতস্বিনীতে সদা সংযোজিত জীবন-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই সঞ্চয়কে চেনা-জানা-অনুভব করা, এবং সঞ্চারণ করে দেওয়াতেই স্ব-এর মুক্তি, একাকিত্বের অবসান, বিচ্ছিন্নতার সমাপ্তি।

॥ কে যাবি পারে ॥

আর একটা বছর শেষ হয়ে এলো। প্রকৃতিও এই সময়ে শীতল হয়ে ক্রমশই যেন অস্তিত্বের একেবারে ভিতর পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যায়। অন্তর্মুখী করে তোলে। দিনের স্বল্প উষ্ণতা দেহ মনের অবশিষ্ট তাপকে যেন আর তেমন করে লালন করে না। এগিয়ে যাবার অনুভবের চাইতে সব যেন কেমন সরে-সরে যাবার অনুভব হয়ে আসে। মনের এপার-ওপার যাতায়াত, সামনে-পিছনে দেখা-সাক্ষাৎ, কেমন যেন অলস-গতি অপেক্ষা-ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কিছু একটা ভাবার চেতনা, কিছু একটা করার চেষ্টা বারে বারে মনের দ্বারে করাঘাত করে। কিন্তু যোগ্য উত্তেজনার অভাবে, যথেষ্ট উষ্ণতার অভাবে সে যেন কেমন হতাশ অপেক্ষা হয়েই ফিরে যেতে চায়।

অলস অনুভবের এই দীর্ঘলয় অনুষ্ণতায় একটা সুর যেন সদাসর্বদার আবহ হয়ে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই সুরটা যে সঠিক কি তা আমাদের মতো সাধারণ জনের হৃদয়তন্ত্রীতে ধরা পড়ে না, পড়ার কথাও নয়। বিশ্বকবির মনের তারটি বিশ্বের অন্তরের অনুরণন সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই অনায়াসেই সেই তারে ঝংকার ওঠে; ওগো, তোরা কে যাবি পারে। আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে। এই যে পারে যাবার কথাটি গান হয়ে ধরা দিল, এই যে তরী নিয়ে অপেক্ষার কথাটুকু কতো অনায়াসে প্রকাশ পেল, আর, সব থেকে বড় কথা, কতো সহজেই না মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ 'আমি'-টি গভীর করে সামনে এসে ডাক দিয়ে গেল, ঘোষণা করতে পারল—কে যাবি পারে? এই অনুভবটুকু তো কই আমরা নিজের মনের মধ্যে, নিজের মতো করে, একবারও ধরতে পারলাম না!

শীতের সকালে বিলম্বিত শয্যাত্যাগের পর থেকেই বর্ষশেষের বেলা শেষ দিনে 'তোরা কে যাবি পারে'-র সুরটা যেন ঘুরে ঘুরেই মনকে অবশ করে তুলছিল। 'এ-পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে'—এই 'রে'-টুকু যেন 'রে-রে' করে আমাদের সকলের জন্যেই তেড়ে আসে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই 'রে'-র রেশটুকু যেন তাণ্ডব তৈরি করে চলে। আমরা সকলেই জানি যে এই-জীবন মরুময়, প্রাণবারির অভাবে ধু ধু গোবি-সাহারা। একটু খানি স্নেহের জন্যে শিশুর কান্না, মমতাময় একটি হাতের স্পর্শের জন্যে বাল্যের উত্তপ্ত কপাল

পুড়তে থাকে, একটু ভালবাসার প্রত্যাশায় যৌবন ঘূর্ণি-প্রান্তরে দিক হারায়, প্রৌঢ়ত্বের দাওয়ায় বসে মথিত চিত্ত একটুখানি বিনম্র ছায়ার জন্যে হাহুতাশ ক'রে করপল্লবে মুখ লুকোয়, আর বার্ধক্যের কুঞ্চিতচর্ম নামাবলিটি সর্বদেহে ধারণ করে অবশ দেহ-মনে 'হরি দিন তো গেল'-র দিনান্ত সঙ্গীতকেই লাঠি করে পারের কড়ি খুঁজি। এ-সবই আমরা জানি, বুঝি। ভোগের জগতে মনের অনটন অবশ্যম্ভাবী। তাই মরু-অনুভব আমাদের সকলেরই বাস্তব প্রাপ্তি।

কিন্তু ক'জনে আমরা বলতে পারি—এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি? মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি? জীবনের সব থেকে কঠিন কথাটি এমন সহজ করে বলা তো দূরের কথা, কজনে আমরা বুঝে উঠতে পারি? যখন 'বেলা' থাকে তখন আমরা 'যাবার' কথা না ভেবে 'পাবার' চেতনায় মশগুল হয়ে থাকি, বুঁদ হয়ে ভোগের অতলে পদ্মাসনে জীবন কাটাই। কালের অফুরন্ত ভাণ্ডটি সঙ্গে করে, বাল্যকাল থেকে পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে বৃদ্ধ কালের দ্বারে পৌঁছে শূন্য সেই ভাণ্ডটিকেই কণ্ঠলগ্ন দেখতে পাই। রুদ্ধবদ্ধ জীবনান্ত ঘটে সময়ের, কালের। যাবতীয় ভাবনাকে দুর্ভাবনার বাস্তব ছাপ মেরে মেরে কালের গর্ভে জমা করে চলি। কবিতার অন্তর থেকে আস্ত একটা 'নন্দলালকে' আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের গভীরে প্রতিনিয়তর জলসেচনে সজীব বহাল করে কালান্ত হই

'ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে'—সেই উপবনকে আমরা জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েই নন্দলালের আসন পাতি। বহু জনে যে খেলা, যে খেলায় জীবনে জীবন যোগ করার তানটি উচ্চারিত হতে পারে, সেই সত্য-শিব-সুন্দরের খেলায় আমরা বহুজনেই তো আনাড়ী থেকে যাই। থেকে যাই তার অনেক কারণের মধ্যে 'আমি'-টির অভাব বোধহয় প্রধান। কবির জীবনে এই 'আমি'-টি সদাই উপস্থিত যে—'আমি' তরী নিয়ে বসে থাকে, অপেক্ষা করে, তাঁকে 'ওপারে' নিয়ে যাবার জন্যে। জীবন-দেবতা, সৃষ্টির-দেবতা, কাব্যের বাণী-মূর্তি।

আমরা বাস্তবের মাটিতে প্রোথিত-শিকড়, জৈব অস্তিত্বের দড়া-দাড়তে আষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ থেকে পার্থিব আমির মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে আর কখনই সেই অন্তঃস্যূত সৃষ্টিশীল 'আমি'র দেখা পাই না। দেখাও পাই না, অন্বেষণের সময় ও পাই না। কখনই আর মনে হয় না যে এই বেলা বেলা আছে। আমাদের সব বেলাই সূর্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, তাই অনিবার্য ঘুরপাক খেয়ে মরে। কোন বেলাই আর জীবনের সৃষ্টির টানে সময়, সুসময়, হয়ে দেখা দেয় না। তাই

আমরা যখন প্রতিনিয়ত এপার-ওপার করি, পারে যাই, তখন সেই যাওয়াগুলো মরু থেকে মরূদ্যানে যাওয়া হয়ে ওঠেনা, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণ হয় না, অসত্য থেকে সত্যে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে, বাস্তবের ইঁট-কাঠ-পাথর থেকে ভাবের আলো-জ্যোতি-মঙ্গলের মণ্ডে গতি পায় না। আমরা বেশির ভাগই ছোট আমির ঘেরাটোপের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাই, বড় আমির অসীমে পাখা মেলার আকাশ খুঁজে পাই না।

কিন্তু মজা এই যে আমরা প্রত্যেকেই শৈশব কাল থেকেই আমাদের নিজের নিজের আমিকে খুঁজি। খুঁজি কিন্তু দিশারী পাই না, আলোর দেখা ক'জনে পাই? আবার পারে যাই সকলেই—সেই পার হওয়াটা কখনও মাঠ-প্রান্তর কখনও বিদ্যালয়ের ধাপ, কখনও জলাজঙ্গল কখনও নদীনালা পুকুরের জল। আমরা গ্রাম পার হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে যাই, শহর থেকে শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা জলা-জঙ্গল-জাঙ্গাল পার হতে পারি। এবং পার হই শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্যথেকে তারুণ্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে। সবই আমরা পারি; পারিনা কেবল অহম্-এর আমি থেকে স্বম্-এর আমিতে উত্তরণে। আলো আমাদের ভিতর থেকে পথ দেখায় না, আমাদের আপন-জনেরা—মা-বাবা-স্বজন পরিজনেরা—বাইরে থেকে 'তরী' নিয়ে বসে থাকার সময় এবং মানসিকতা খুঁজে পায় না। পায় না কারণ বাস্তবের ঠুলি আঁটা চোখে, নিত্যকার জৈব চাওয়া-পাওয়ার খুঁটোয়-বাঁধা চক্রাকার ঘূর্ণ্যমান জীবনে তাঁরাও তো চক্র-চিহ্ন-বৃত্তাকার পথ পরিক্রমার থোড়-বড়ি-খাড়ায় আবদ্ধ। তাঁদের নির্দেশে তাই আমরা বই-এর জগতে বর্ণমালাকে দেখতে শিখি, স্বর-ব্যাঞ্জন-সন্ধি খুঁজি বই-এর বাধাটুকু পার হয়ে জীবনের প্রসারে বিচরণের অবকাশ পাই না। নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে আকাশকে দেখতে পাই না, ইতিহাসে ব্যক্তির প্রজন্মবৃক্ষটি মুখস্ত করি, বৃহত্তর জনমানসের চিত্তটির হদিস হারিয়ে ফেলি। ভূগোল আমাদের কাছে উচ্চাবচ স্থান চিহ্ন মাত্র, মরু-নদী-পাহাড়ের অবস্থান মাত্র, কখনই সে আমাদের পার্থিব গৃহ হয়ে মন টানে না। বেত্র-হস্ত রক্ত-চক্ষু নীরস-নির্দয় task master হয়ে গৃহে বিদ্যালয়ে আমাদের অভিভাবকরা আমাদের মুখে-মগজে বই-পত্র তত্ত্ব-তথ্যের শুকনো পাতাগুলো ঢুকিয়ে দিতে চান। আমরা সকলেই বিদ্যাসত্রের আঙিনা পার হতে হতেই তোতা কাহিনীর প্রাণহীন দেহ-মনে জ্ঞানের সম্ভারটুকু পুঁজি করে বৃহত্তর জগতে পার হয়ে আসি। জঠরের অভ্যন্তরে যে সীমাহীন বর্ণমালার সম্ভার তারই প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে, অভিজ্ঞান সমূহের সম্পন্নতাকে জীবন

সাগর পাড়ি দেবার একমাত্র তরী করে ভাবতে শিখি। কেউ আমাদের জন্যে তাই বসে থাকে না, অপেক্ষাকে একাগ্র করে ডাক দেয় না। আমরা কোথায়ও বসে গিয়ে পার পেতে চাই—অফিসে-দপ্তরে, কলেকারখানায়, দেশে বিদেশে! অর্থের আকর্ষণে অনর্থকেই পারের কড়ি ভাবি ভোগের তাড়নায় সেই বেলা আর বেলা থাকে না। জৈব প্রয়োজনের তাগিদে এ-পারের জল জঙ্গল অরণ্যে পথ হারিয়ে ও-পারের উপবনের কথাটাই মনে আনতে পারি না।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তো একটা করে ও-পার আছে, আছে একটা উপবন। সেখানে ফুল ফোটার জন্যে বৃক্ষের কম্পন থাকে, পাখির গান গেয়ে ওঠার জন্যে কণ্ঠ থাকে, সৃষ্টির আবেগ প্রকাশের পথ খোঁজে, নিজেকে ছাড়িয়ে স্ব-এর সন্ধানে আকুতি থাকে। কিন্তু ক'জনে আমরা সেই স্ব-এর পথিক হতে পারি? সেই ফুলের বৃন্ত-কম্পন অনুভব করতে পারি? পারি না বলেই তো পার হতে পারি না। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রাণ ধারণের গ্লানি প্রতিনিয়তই পথরোধ করে ও-পারের যাত্রাপথকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে।

তার পর একদিন সত্যি সত্যিই সূর্যের পাটে নেমে যাবার সময়-আসে, সুবাতাস যায় থেমে এবং সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে খেয়া বন্ধ হয়ে যায়। পারাপারের—জীবনের অনৃতের পাড় থেকে অমৃতের পাড়ে যাবার—সম্ভাবনাটুকুও তখন মৃত্যুর অতলান্ত নিঃসীমতায় হারিয়ে যায়।

জন্ম পূর্ব জীবন পার হয়ে পার্থিব জীবনে পার হয়ে আসাটা নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার অবকাশ না ঘটলেও জীবনান্ত পরপার যাত্রা পর্বটি আমাদের অনেকের, সকলেরই, ভাবার বিষয় হয়ে দেখা দেয় যখন সূর্য পাটে নেমে যাবার সময় হয়। যে উপবন ও পারেতে, যেখানে কত জনে কত খেলায় মত্ত, সেই ও-পার যাওয়াটা জীবনান্ত গমন কি?

সন্ধ্যার আঁধারে যদি খেয়া সত্যিই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো 'ওগো, তোরা কে যাবি পারে'-র আবাহনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়, অর্থহীন হয়ে যায় 'তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে'-র ঘোষণাটুকুও। তাই ওপারে যাবার ডাকটি এই জীবনের পরিধির মধ্যেই সত্য হওয়া দরকার। দরকারই নয় শুধু অনিবার্যও বটে। নাহলে 'এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি' এই মূল্যায়ন, এই আহ্বান শাশ্বত হয় কি করে?

এই আহ্বানটুকু আমাদের সকলের জীবনেই একবার-দুবার আসে, এসে যায়। কখন যে তাকে খ্যাপার মতো বস্তুজগতের আগ্রহের আতিশয্যে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে আমরা শূন্য হাতে জীবনকে হাতড়িয়ে ফিরি তার হদিস পাই না। শাশ্বতের সেই পরশ পাথর আমাদের জীবনকে সুন্দর আর স্বর্ণোজ্জ্বল করে তোলে না, তোলার অবকাশই পায় না। বাস্তবের বাধাটুকু পার হয়ে জীবনের উপবনে পেঁছোনোর উত্তরণটি ঘটিয়ে উঠতে পারি না।

অথচ আমরা সকলেই কম বেশি সুন্দরের পূজা করি সত্যের আকর্ষণ অনুভব করি, মঙ্গলের দীপখানি নিজ নিজ জীবনে জেবলে নিতে চাই। একটা দ্বৈতভাব আমাদের চেতনাকে দ্বিখণ্ডিত করে রাখে। আমরা তাই সুন্দরকে গৃহের দেওয়ালে, অঙ্গনের চত্বরে আর বেশভূষায় আরাধনা করি, সত্যকে ভাবনার গভীরে স্থান দেই কিন্তু জীবনের গভীরে দৃঢ়মূলে প্রত্যয়ে আর সাবলীল আচরণে স্থান দিতে পারি না, মঙ্গলকে নিজের জন্যে যতটা দীপময় করতে চাই, ততটা অন্য-মুখী করে দেদীপ্যমান করতে পারি না। এই পারিনা বলেই আমাদের পার হওয়াটাই সফল হয়ে ওঠে না। অনেকেই আমরা কিনারা পর্যন্ত পেঁছোতে পারলেও অন্তরের ভিতর থেকে অপেক্ষার 'আমি'-টির ডাক শুনতে পাই না—যে আমি 'তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে'-বলে আমাদের নাড়া দিয়ে যাবে, ওপারের 'উপবনের' মিলন-ক্ষেত্রটির দিকে নজর কেড়ে নেবে।

তাই তো আমরা একদিন শেষ হয়ে যাই, অশেষ হয়ে উঠতে পারি না। আমাদের জীবনের সূর্য ডুবে যায়, পার হওয়াটাই হয়ে ওঠে না। এটাই কি মানুষের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিগত ট্রাজেডি নয়?

॥ পাতাল থেকে আকাশে ॥

আমার কিছু কথা বলার আছে। প্রত্যেকেরই তো থাকে। কিন্তু যে কথা শুধুমাত্র আমার তাতে আপনাদের তো কোন আগ্রহ থাকার কথা নয় কারণ তার কোন অংশই টক-ঝাল-চাটনির মতো আঠালো নয়। আমি নিজেও অত্যন্ত সাদা মাঠা, আমার কথাও তাই অত্যন্ত সাদামাঠা। তবুও কেন তাকে বলতে চাই? বলতে চাই এই জন্যে যে সেই অতি সাধারণ জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধা-বিপত্তি, সংগ্রাম যন্ত্রণা যখন একের পর এক ধেয়ে আসে তখন তা সর্বজনের হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। জীবনের এক-একটা সময়ে আমরা হঠাৎই নিজেদের হারিয়ে যেতে দেখি। জীবন তখন আর সাদামাঠা থাকে না, বাইরের জগতের বিরুদ্ধ তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত বিক্ষিপ্ত হতে হতে অস্তিত্বকে হাতড়িয়ে ফেরে? নিজ নিজ মতো করে জীবনের অর্থ খোঁজে, তাৎপর্যকে অন্বেষণ করে, আকাশের জন্যে শ্বাসরোধ করে সংগ্রাম করে চলে।

জীবন. প্রত্যেকটি জীবনই, দীর্ঘদিন ধরে অভিভাবকের আঁচলের আড়ালে অতি-সাধারণ বেড়ে ওঠে। এক সময়ে সে নিজেকে নিজের বলে চিনতে শুরু করে, নিজের আপন ধন বলে তৈরি করে নিতে সচেষ্ট হয় এবং ক্রমশই একটা স্বতন্ত্র ভূমি এবং স্বাধীন আকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই পর্বেই সংগ্রাম অনিবার্য ধেয়ে আসে! সহস্র ফণা পরিবেশ তার পূর্বজীবনের পরীর বেশে ধ্বস নামিয়ে দেয়, শতদংশন মনের যন্ত্রণা তাকে ভিতর থেকেই উথাল পাথাল অনিশ্চয়তায় ঠেলে দেয়। প্রত্যক্ষের জগতে ভূমিকম্প, আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতে দিগন্ত প্রসারী বিবর্তন, কামনা-বাসনার গভীরে অগ্নুৎগারের লাভাস্রোত আমাদের প্রত্যেককেই এক একটি ব্যক্তিত্ব দিয়ে ফেলে, দিতে থাকে। তখন আঁচলের আড়ালটিকে আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্বের পথে প্রতিবন্ধক বলে সমূহ বুঝে যাই। তাকে ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দিয়ে, গুটিপোকার সাদামাঠা নিস্তেজ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন প্রজাপতির পাখনা নিয়ে একটা আকাশ খুঁজে বেড়াই।

আর এই নিজের মধ্যে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে আমরা অনেকেই অতি সাধারণ থেকে সরে সরে যাই, বিশেষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি, বিশিষ্ট হয়ে স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নিতে চাই। ব্যক্তিত্ব খোঁজার এই একক এবং স্বাধীন

প্রচেষ্টার প্রতি পদক্ষেপে আমরা সকলেই সঠিক পথে সামনে যেতে চাই ; কিন্তু পারি ক'জনে ? বিপথ চালিত হয়ে আমরা, বহু জনেই, নানাপথে আকাশকে না পেয়ে পাতালকে আপন করে ফেলি ! সেই আমার আকাশ খুঁজতে পাতাল প্রবেশের ইতিবৃত্তই আপনাদের শোনাতে চাই। যদি সেই পাতালে আমি জনমানবশূন্য একাকিত্বের একমাত্র অধিবাসী হতাম তাহলে সে কথা বলার আমার কারণ থাকত না ; সেখানে যে আমি শত-সহস্র 'আমাদের' দেখা পেলাম ? সকলেই যে আকাশের তালাশে সেখানে, নিজেদের অজান্তেই, দিশেহারা ঘুরপাক খেয়ে মরছে ? কেউই সেখানে 'স্বেচ্ছায়' প্রবেশ করে না, স্বাধীনতা হীনতার ব্যর্থ বাঁচার হাত থেকে মুক্তির তাড়নায় তারা অগাধ সলিলের অতলান্ত অতলে কেন হারিয়ে যায় ?

অনেকের মতই কলেজ জীবনে প্রবেশের মুখে পরিষ্কার টের পেলাম যে আমার মধ্যে একটা এতোদিনের 'অচেনা-আমি' যেন পাখা ঝাপটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পরিচ্ছন্ন দেহের ঋজু-তীক্ষ্ন আধারে যেন গানের সুরের মতো সদাজাগ্রত একটা চেতনা মনের পাখায় ভর দিয়ে সুদূরের অন্বেষণে উন্নত গ্রীব হয়ে সদা-সর্বদাই বাহিরকে কর ঘর আর ঘরকে কর বাহির বলে আহ্বান জানাতে ব্যগ্র ! চোখে প্রজাপতির রঙ লেগে অতীতকে জড়ত্বের প্রতিভূ বলে মনে হতে লাগল ; নিজেদের চোখ যে নিজেদের দৃষ্টিকে আড়াল করে দিতে পারে সে তখন মনে হয় নি। মনে হয়েছে গৃহে মা-বাবার অভিভাবকত্ব, সমাজে বহুজনের বঙ্কিম দৃষ্টি আর কলেজের প্রশাসনের অদূরদর্শিতা সবই জড়ত্বের প্রকাশ ; এদের সকলের প্রাণ প্রাচুর্য অতীতের গর্ভে বিলীন বলে এরা অসাড় সমাজদেহের পূজারী। এরা সকলেই শৃঙ্খলার মূল্যে জীবনের ধনের মূল্যায়ন করতে আগ্রহী, নব জলধারার কলকল্লোলকে এরা ডোবা পুকুর দিঘির বাঁধনে আবদ্ধ দেখতে চায়। আর আমাদের প্রাণের চঞ্চল কাজলে রঞ্জিত দৃষ্টিতে সেই নবজলধারাই, সহজের স্পর্শে আর শ্যামলের নৈকট্যে, দিগাঙ্গনার দিশারী। আমরা তাই শৃঙ্খলার আর পুরোনো মূল্যবোধের আঁচল ছেড়ে আসতে তাদের ছিঁড়ে চলে আসি। আকাশের খোঁজে আমাদের দৃষ্টি তখন ধরণীর ধূলিকে অনাবশ্যক বলে ঘোষণা করে দেয় ! বাস্তবের Runway থেকে আমরা সকলেই অবাস্তব কল্পনার পাখায় ভর করে Radar হীন উড্ডয়নে অভ্যস্ত হয়ে যাই।

এই করতে গিয়ে আমাদের গৃহে মন বসে না, পাঠ্যপুস্তক থেকে চোখ বারে বারে সরে সরে যায়, কলমের ঠোঁটে শিক্ষকের বক্তৃতার বদলে চেতনার ভাষা

রূপ পায়। আমরা পেতে গিয়ে হারাই, হারিয়ে ফেলে সময়ের পিছু তাড়া করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যয়নে যেখানে আমাদের অসাধারণ হবার কথা সেখানে 'সাধারণত্ব' আমাদের ছায়ার মতো পিছু নেয়, আর যেখানে আমরা শত-সহস্রের মতো অতীব সাধারণ, সেখানে অসাধারণত্বের খোঁজে হৃদয় তাপে ছুটে মরি; ছুটে মরি একটুখানি আকাশের লোভে তারায় তারায় খচিত ভবিষ্যতের জন্যে। যখন সেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে বুঝতে পারি, যখন সেই সব তারারা হারিয়ে যায় কল্পনার দৃষ্টি থেকে, তখন বিশ্ববিদ্যালয় তারস্বরে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, 'সময় শেষ, সময় শেষ'। তখন তড়িঘড়ি আমাদের মধ্যে যার যতটুকু 'অ-সাধারণ' ধার আছে তার দ্রুত grinding চলতে থাকে; নাকে মুখে বিদ্যা গলধঃ করি, পড়ি-কি-মরি করে অধীত বিষয় মস্তিষ্কায়ত্ব করি, suggestion-এর জন্যে অধ্যাপক থেকে অধ্যাপকান্তরে ছুটোছুটি করি এবং একদিন ঘণ্টাধ্বনিকে সাক্ষী করে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে answer script-এর বুকে নিজ নিজ অদিনের কান্না ঝরিয়ে সুদিনের প্রত্যাশা করি। সেই প্রথম আমরা তলিয়ে যাওয়ার অনুভবকে আঁচলে বেঁধে, বা পকেটে পুরে, ধীর পদে গৃহে ফিরি। কিন্তু সেই পাতাল-অনুভব হারিয়ে যেতে সময় লাগে না—তিন-চার মাস পরে আবার নীল আকাশের দেখা মেলে, টান অনুভব করি, ঝরা পাতা বন্ধুদের ভুলে গিয়ে বসন্তের নবপল্লবে সজ্জিত আমরা আবার প্রজাপতি-পাখনা খুঁজে পাই, আবার ভ্রমর হয়ে গুঞ্জন তুলি, আবার আকাশকে দৃষ্টিবদ্ধ করে অতীতকে হারিয়ে ফেলি।

সময় যখন হাতে থাকে তখন সময়কে অঢেল বলে মনে হয়, সময়কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভাল লাগে, অকাতরে খরচ করতে প্রাণে দোলা লাগে। আবার সময় যখন চুপিসাড়ে, কিন্তু অনিবার্যভাবেই, Hour-glass এর ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে হারাতে হারাতে ঊর্ধ্ব-কক্ষ-সম্পন্নতাকে শূন্য করে ফেলে তখন আবার অতল পাতালের অনুভব অস্তিত্বের মূলে ভয়ের শিহরণ জাগায়। হাহুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের মেলা বসে যায় চেতনার সর্বত্র। যারা মাথায় ন্যাড়া তারা দু'বার যায় না বেলতলায়; কিন্তু যারা সবুজের অবুঝ হাতছানিতে 'ন্যাড়া', যারা আকাশের কুহেলী ডাকে 'ন্যাড়া', অথবা যারা জীবনের রঙে-ফাগে 'ন্যাড়া' তারা যে বার বারই অতলের বেলতলায় পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। তাই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়-মূল্যায়ন যজ্ঞে ঘর্মাক্ত কলম হয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করি: 'আর নয়, এরপরে সময়কে সময়মতোই দৃঢ়মুষ্টি ধরে রাখবো', কিন্তু সময়টুকু

পার হয়ে গেলে সেই প্রতিজ্ঞা, সেই সময় অনায়াস হারিয়ে যায়। বোধহয় বয়সের বিধিলিপি!

তাই অ-সাধারণ জীবন-বোধে উষ্ণ হতে গিয়ে আমরা অনেকেই অত্যন্ত সাধারণ প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে বিদ্যুরের ক্ষুদে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হই; অনেকে সেই সব প্রত্যয়ন-পত্রকে ধুয়ে যাওয়া কাজলের লবণাক্ত জলে ভিজিয়ে ফেলি। তখন টের পাই না আমাদের মাথার উপরে আকাশের নীল না জলের অতলান্ত নীল। অসময়কে বুঝে নিতে অনেক সময় আমাদের পার হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যায়ন-পত্রকে যেমন লবণাক্ত করি ঠিক তেমনি আমরা আমাদের গৃহ-পরিবেশকেও, ততদিনে, ক্লেদাক্ত করে ছাড়ি। ভাই-বোন, স্বজন-পরিজনদের সঙ্গে ছোট ছোট ঈর্ষা, ছোট ছোট স্বার্থের সংঘাতে পারিবারিক জল ঘোলা করি, বড় বড় বিষয়ে মতদ্বৈধের তাণ্ডবে উত্তাল করে তুলি এবং তার পরে, সেই পরিবেশে, যে কোনও ছোট বড় সমস্যাকে অনিবার্য সংগ্রামের চেহারা দিতে অকুণ্ঠ বোধ করি। সকালের চা-জলখাবার হাতের উল্টো পিঠের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করি, বিকেলে যথাসময়ে বাড়ি না ফিরে মনের ঝাল মেটাই আর রাত্রে খাবার টেবিলে বসে নির্বাক অন্য-দৃষ্টি হয়ে অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশিকে গপ্ গপ্ করে উদরস্যাৎ করতে করতে স্বাধীন বোধের ধ্বজা উড্ডীন রাখি। মা-বাবার নিম্ন স্বর বিনীত-অনুশোচনার কণ্ঠ আমাদের দুর্ব্যবহারের মাত্রাকে বাড়িয়েই তোলে কারণ বড়র বিনয় যে ছোটকে আরও ছোট করে দেয় তা উপলব্ধি না করে জয়ের অনুভবে বুকের ছাতি আমাদের ফুলে উঠতে থাকে।

গৃহ পরিবেশেই যে আমরা অবুঝের মতো ব্যবহার করি তা নয়; আমরা এই সময়ে ছন্নছাড়ার মতো চিন্তা-ভাবনা-অনুভবের সকল ক্ষেত্রেই ছন্দহীন, স্বার্থ দৃষ্টি আর আবেগ প্রবণ ব্যবহার করে থাকি। মা-বাবার বাধা নিষেধকে আমরা তখন ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করি, একবারের জন্যেও মনে হয় না যে মাতৃত্বের দায় বহন করতে, কর্তব্য পালন করতে, তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার অধিকারী, সন্তানদের বর্তমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ন্যায়ত বাধ্য। কিন্তু না! তখন আমরা প্রত্যেকেই যে অনেক বড় হয়ে গেছি, নিজেদের ভালমন্দ বর্তমান ভবিষ্যৎ, আমরা সকলেই নিজে নিজে সব চাইতে বেশি বুঝি! অতীত মূল্যবোধের বেড়ি হাতে, মৃত বা মৃতপ্রায় সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কারের দড়ি-দড়া নিয়ে অভিভাবকদের অভিভাবনা

আমাদের কাছে তখন জীর্ণ বস্ত্রের মতোই পরিত্যজ্য, অবহেলায় পাশ কাটিয়ে যাবার মতো।

তাছাড়াও আছে আমাদের তরল-মতি প্রত্যক্ষের জগৎ; সেখানে 'রিফ্রাকশন' 'ইলিউশন' আর 'প্যারালাক্স' সদাসর্বদাই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মায়ের কথা বাবার উপদেশ নির্দেশ ঘাড় নিচু করে শুনলেও refracted হয়ে মনের তলদেশে প্রবেশ করে ওঁরা যা বলেন তা আমরা অন্যার্থে বুঝি, বক্রার্থে গ্রহণ করি আর সর্বার্থে ত্যাজ্য বলে অ-কাতরেই কুলোয় রাখি। মা-বাবাকে পক্ষপাত-দুষ্ট বলে নিশ্চিত হয়ে যাই কারণ 'আমার' প্রতিই ওঁদের যাবতীয় নির্দেশ উপদেশ বর্ষিত হয়, অন্যের প্রতি কখনই নয়। দাদা বা দিদিকে ওঁরা কিছুই বলেন না শুধু আমার বেলাতেই যত সমালোচনা, নিন্দা, শাস্তি। অথবা ওদের কিছুই কখন বলেন না ওঁরা, বলেন শুধু 'আমাকেই'! এই বোধ কেবলমাত্র বিভেদ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয় না প্রচুর 'মন্দরক্ত প্রবাহের' কারণ হয়ে পরিবার দেহকে এবং ব্যক্তির মনকে বিষিয়ে দেয়। এই কাজে ইন্ধনের যোগানটি আসে আমাদের জাগ্রত যুক্তি তর্কের অবতারণায়। বড় হতে হতে যে অস্ত্রটি আমাদের সদাসর্বদার হাতিয়ার হয়ে অপরের প্রতি উদ্যত থাকে তা আমাদের reasoning, arguments বা এক কথায় logic. যুক্তি তর্কের আপেক্ষিকতা বিষয়ে অনবহিত আমরা প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্যে যুক্তি এবং যুক্তি প্রকাশের বাহন শব্দ-বাক্য-প্রবাদবচনকে যেন তেন ব্যবহার করে থাকি। কোথায় কতটুকু আঘাত লাগলো কোন কেন্দ্রে কতটা রক্তক্ষরণ ঘটালো তা তখন আমাদের পরিমাপ্যই নয় কারণ reasoning কেই, logic-কেই আমরা absolute value বলে মনে করতে শুরু করি, সেমতো প্রয়োগও করি। এই করতে গিয়ে যে সব ক্ষত মা-বাবার হৃদয়ে তৈরি করে ফেলি, যে সকল রক্তক্ষরণ অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের অন্তরে ঘটিয়ে ফেলি তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের আস্বাদনে ব্যাপৃত থাকি। প্রতিপক্ষের নীরবতাকে পরাজয়ের স্বীকৃতি বলে ধরে নেই, তাদের বিস্ময়-দৃষ্টিকে অক্ষমতা বলে মনে করি আর তাদের অন্তঃসলিলা রুধিরাশ্রুকে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন বলে মেনে নিয়ে নিজ নিজ 'ঈগো'তে হাত বুলোই, যোগ্যতায় সাফল্যের সুড়সুড়ি দিতে থাকি! অধঃগতিকে ত্বরান্বিত করতে করতে বার বারই উল্লাস বোধ করি যে আমাদের মাথাটা বেশ তরতর ঊর্ধ্বগতি পেয়ে চলেছে। গন্তব্যে পৌঁছেই একমাত্র বুঝতে পারি যে সেটি আকাশের নীল নয় পাতালের কর্দমাক্ত রসাতল। তখন অনেকের ক্ষেত্রেই, বহু জনের জীবনেই, বিলম্ব অত্যন্ত বিলম্বিত মনে হয়ে থাকে,

Hourglass-কে আর বিপরীতমুখী করার সুযোগই থাকে না।

জীবনের এই সময়ে অভিযোগ আমাদের বহুপ্রকারের এবং বহুজনের বিরুদ্ধেই জমা হতে থাকে, দানা বেঁধে ওঠে। আমরা অভিযোগ দায়ের করি, কিন্তু ধৈর্য ধরে বিচারের অপেক্ষা করতে পারি না। অভিযোগের ভাষায় বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের স্থানে অনুপ্রবেশ ঘটাই আবেগ-প্রবণ প্রেষণার কারণ আমরা প্রত্যেকেই বিচারককে পূর্বাহ্ণেই পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করি এবং সুতরাং তাকে 'সত্য বিচারে' উদ্বুদ্ধ করার জন্যে প্রভাবিত করার যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করি। এবং এখানেই থেমে থাকি না ; প্রকৃতি প্রদত্ত যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে—চোখের জল, কণ্ঠের ক্রন্দন অথবা রোষ, শব্দচয়নের নৈপুণ্য এবং ক্ষেপণের কৌশল, সব, সবই—ব্যবহার করে বিচারককে নিস্তেজ স্বপক্ষচারী করে তুলতে চাই, এবং সব সম্ভাব্য সন্দেহকে নির্মূল করে দিয়ে বিচারক কি 'রায়' দেবেন, কি 'রায়' তার দেওয়া 'উচিত' তা ঘোষণা করতে আমরা ক'জন কাল বিলম্ব করি? বাল্যে বলেছি, "ওর কান মুলে দাও", কৈশোর-তারুণ্যে বলেছি "ওকে কঠিন শাস্তি দাও" আর এই স্বাধীন মানস যৌবনে বলি "ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও/ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত কর/ওকে তালাবন্ধ করে রাখ" ইত্যাদি। এই সময়ে আমাদের ধৈর্যহীন ব্যক্তিত্ব প্রতিনিয়তই Personality Clash-এ জড়িয়ে যায়, Prestige নিটোল রাখতে যে কোনও মূল্য দাবি করে ফেলি এবং এই করতে গিয়ে অভিভাবকদের দীর্ঘশ্বাস, তাঁদের রক্ত চলাচল, তাঁদের হৃদরোগের সম্ভাবনাকে আমরা বিলকুল 'কেয়ার' করি না। তাহলে এই জীবনবোধে কি আকাশের নীল আছে, না, পাতালের কর্দম আছে?

এই সময়ে আমরা যে যা করি তাকেই মহামূল্যবান বলে মনে করি। মনে করি আমরা যে যা করছি তা এর আগে আর এমনটি করে কেউই করতে পারে নি। শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যয়ে আমাদের অস্তিত্বে আলোর ঝলক বের হতে থাকে, আমাদের চলনে একটা গট্‌মট্‌ ছন্দ খেলা করে, আমাদের কথনে দৃঢ়তা যেন ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশ পায়! এই air-এর তাপে আমরা শিশুদের কাজকে হেলাফেলার চোখে দেখি, তরুণ-কিশোরদের অকাতরে উপদেশ নির্দেশ দিতে থাকি, আর বৃদ্ধদের কাজকে অকাজ বা rubbish বলে ঘোষণা করি। নিজেদের কাল্পনিক অতীত ক্রিয়া-কর্ম পঠন-পাঠনকে reference হিসেবে উল্লেখ করে ছোটদের পড়াশুনোয় অধিক মনোযোগ এবং তস্যাধিক সময় নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়ে থাকি—এবং একবারও পলক পড়ে না, সঙ্কোচ

বোধ হয় না এই অতীত স্মরণে এবং উল্লেখে কারণ অতীত আমাদের সত্যে মৃত, কল্পনায় জাগরূক মাত্র! এবং আমাদের চাইতে যারা অনেক বড়, আমাদের মা-বাবা, ঠাকুমা-দাদামশাইদের অবলীলায় চতুরাশ্রম জীবন যাপনের মূল্য যে কতো অসীম, কতো কাঙ্ক্ষিত তা উপদেশ হিসেবে অথবা আপ্তবাক্য হিসেবে স্মরণ করিয়ে দেই। সংসার জীবনের প্রান্তসীমায় যে সংসার-দৃষ্টি হওয়াটা আধ্যাত্মিক নয়, জড়ত্বের বা তামসিকের প্রকাশ, ছেলে-মেয়েদের দোষ-ত্রুটির প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি না হয়ে ঈশ্বর-মুখী চেতনায় সদা-নিমগ্ন থাকতে হয় তা আমরা এই মধ্যবয়সে পেঁছোনোর আগেই শেষ বয়সের ওঁদের বুঝিয়ে দিতে থাকি। 'নহিলে বিপদ বাড়ে!'

এই সময়ে তাই আমরা সর্বেশ্বর হয়ে রাজত্ব করতে চাই। ছোটদের চোখ-রাঙিয়ে বশীভূত রাখি, বিপদে-আপদে চকোলেট-বিস্কুট-লজেন্স! বড়দের পাশকাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই 'চুপ করে থাকতে পার না?'—বলে ধমকিয়ে বশে আনতে চাই, অথবা অর্থের-সামর্থ্যের ভয় দেখিয়ে অথবা ভবিষ্যতের ভয় দেখিয়ে নির্জীব করে রাখতে চাই। জীবনের জমিদারী করতে গিয়ে পঞ্চ-ম-কারে ডুব দিয়ে আমরা কোথায় যাই—আকাশের নীলে না পাতালের পাঁকে?

বিজ্ঞানীরা একবাক্য যে ষোল-আঠারোর পরে আর বুদ্ধি বাড়ে না; যা বাড়ে তা অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ধার ও ভার। তা, আমরা বিজ্ঞান পড়ি বা না-পড়ি, সমানে সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বুড়ো আঙুল দেখাতে দেখাতে জীবনের বিচরণ ভূমিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন মন্থনে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ি। যে যার ষোল আঠারোয় প্রাপ্ত বুদ্ধিসম্ভাবনায় দু' চার বার ঘষা দিতেই যে চকচকে আভা ঠিকরোয় তাকেই সর্বোত্তম মনে করে অপরের অস্ত্রকে নিম্নমানের বলে তুল্যমূল্য প্রমাণ করে দিতে চাই, অথবা হীনমূল্য, মরচে পড়া, ধারহীন বলে ঘোষণা করে ফেলি। দু'চার বছরের অভিজ্ঞতায়, দু'চারটি চাকরির পাতা উল্টে পাল্টে, খবরের কাগজ থেকে প্রজ্ঞা আহরণ করে করে আমাদের সর্ব বিষয়ে বৈশিষ্ট্য এমন বেড়ে যায় যে আমরা সব জান্তা, সর্ব বিষয়েই এক একজন expert বনে যাই। সঙ্গে টেলিভিশন এবং ভি, ডি, ও-র ধারা বেয়ে specialisation আমাদের মনে মুখে খৈ হয়ে ফুটতে থাকে। যাঁরা জীবনের মহাসমুদ্রে দু'চারটি নুড়ি কুড়িয়ে জ্ঞানের ধারাপাত-বিষয়ে বিনয় প্রকাশ করেন সেই বয়স্কদের যেমন আমরা অতীতদৃষ্টি কূপমণ্ডূক বলে দূরে সরিয়ে দেই তেমনি যারা, ছোটরা, প্রকৃতই নুড়ি সমূহকে স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চত্বরে খুঁজে ফিরছে তাদেরও

বালখিল্য বোধে অবজ্ঞা করি। জীবন-অভিজ্ঞতার পাঁল পড়ার আগেই আমরা বুদ্ধির ধার পরীক্ষা করতে 'কচ্-কচ্ করে কলাগাছ কাটি' আর ভাবি কত শক্তি আমাদের দেহে, মনে, বুদ্ধিতে। কত ধার কত ভার কত সতেজ! ভিতরের গরমে উত্তপ্ত হতে হতে আমাদের মনে হয় এই তাপ বোধহয় সূর্যের উৎসে প্রাপ্ত আর তাই আকাশকে কাছেই আছে বলে মনে করতে থাকি; প্রকৃত পক্ষে অহংকারের তীব্র ভাবে আমরা আত্মম্ভর অগাধ জলরাশির অতলে সরে যাই। যে নীলকে দেখে আমরা আত্মতৃপ্ত হই সেই নীল যে আমাদের অপেক্ষিত নীল নয় তা বুঝতে আর এক দল তরুণের ধেয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়; তারা এসে তাদের উত্তাল ঢেউএর ধাক্কায় আমাদের প্রৌঢ়ের দলে, বৃদ্ধের জঙ্গলে ঠেলে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় ততদিনে আমরাও অতীত হয়ে গেছি, নিঃস্ব হয়ে গেছি, হারিয়ে যেতে বসেছি।

এটা এক দিনে ঘটে না; সকলের ক্ষেত্রে একই বয়সে ঘটেনা। তরুণের দল যুবকের দখল নিতেই আমাদের সম্বিৎ ফিরে পাই। তখনই আমরা অর্ধচেতনার পাতাল থেকে উর্ধ্ব মুখ চাতকের মতো আকাশের নীলকে আ-চক্ষু পান করতে সময় পাই। যুব চেতনার আগুনে তরুণদলের কুলোর বাতাস লাগলেই আমাদের কাঁচালোহা অস্তিত্বে ইস্পাতের দানা বাঁধে। অনুভবে আসে আত্মজিজ্ঞাসার শুভলগ্ন; হারিয়ে ফেলেই বুঝতে পারি যা এতোদিন ধরে রেখে ছিলাম তা সবই ফেলে দেবার বিষয় ছিল—অহংকার, জেদ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণপ্রয়োগ আর তর্কের বেড়াজাল!

অজ্ঞতার জ্ঞানকেই যতদিন আঁকড়ে ধরে থাকি, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ যতদিন আমাদের বেষ্টন করে রাখে আর অপ্রত্যক্ষের মার খেয়ে খেয়ে যতদিন 'নুড়িকেই' পর্বত ভেবে তুষ্ট থাকি ততদিনই অজ্ঞতার অতলে বোধের শীর্ষাসন করি। মাথাটিকে যখন উর্ধ্বাকাশে দেখতে পাই তখন সহজেই নীলের সঙ্গে সঙ্গে ধরা দেয় ধৈর্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক্ষমতা, উচিত-অনুচিত বোধ, বিনয়, নম্রতা এবং নব নব মূল্যবোধ।

জীবনের চক্র চলনে এর অন্যথা হবার জো আছে কি? কিছু দূর পর্যন্ত অবশ্যই আছে; কিন্তু কজনে আমরা সময় থাকতে সময়কে কাজে লাগাই?

॥ বাঁচা মরা ॥

ইদানীং কাজকর্ম বলতে প্রায় কিছুই নেই। জীবনের যে সময়ে এসে পৌঁছেছি তাতে যে কোনও কাজ করতে গেলেই কোথায়ও না কোথায়ও অসন্তোষ তৈরি হয়, কারো কারো কপালে ভাঁজ পড়ে। তোমার কি দরকার ছিল? আমরা করতে পারতাম না? সন্তান সন্ততিদের কেউ না কেউ প্রশ্ন তুলবে। করতে অবশ্যই পারত, যে কেউই করতে পারত। কিন্তু করে না, অথবা করার কথা মনে হলেও সময়ের অভাব পড়ে যায়। আহামরি কাজ নয়, সামান্য কাজ। টি, ভি, ক্যাবিনেটে ধুলো জমেছে, জানালার গ্রীল ধুলিধুসর, ঘরের কোণে মাকড়শারা জমিয়ে জালের ফাঁদ পেতেছে অথবা পড়ার টেবিলের বইগুলো বেশ অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। ছোট ছোট কাজ। সকলের চোখের সামনেই ছড়ানো। হলে কি হবে, ওদের সকলেরই শত শত জরুরী কাজ আছে। জরুরী এবং ভারি। ছেলের বাজার আছে, অফিস আছে, বিকেলে হিসেব করা আছে, রাজনীতির আলোচনা আছে, আছে আড্ডা, ক্লাব এবং তাস। পুত্রবধূর রান্নাঘর, ছেলেমেয়ের তদবির তদারকি টিফিনের একাধিক বাক্স গুছিয়ে দেওয়া, ঠিকে-ঝি-এর পিছনে কটকট করা, রান্নাঘরের আরশোলা নিধন জন্যে চিৎকার চেঁচামেচি, শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর প্রতি ইতিকর্তব্য এবং অকাজের একচ্ছত্র অধিপতি শ্বশুর মশাইকে লিটপিটে কাজের নেশা থেকে সরিয়ে রেখে, নিরস্ত করে, খবরের কাগজে বা বইতে জুড়ে দেওয়া অথবা দু'চারটে পুতুল ঝুড়িতে-মেঝেতে এগিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে বাচ্চার পাশে বসিয়ে দেওয়া। নাতি নাতনী ঘরে থাকলে তো কথাই নেই। তাদের স্কুল-কলেজ আছে, হৈ চৈ আছে, এটা নেই ওটা নেই আছে, কলম পেন্সিল খুঁজে না-পাওয়ার বিরক্তি আছে, দেরি হয়ে যাবার ভ্রূকুঞ্চন আছে। এবং এখনও সংসার-অন্ত-প্রাণ বাত-ব্যথায়-জর্জর আজীবনের সঙ্গী গিন্নীর আছে সদাব্যস্ত এঘর ও-ঘরের টানাহ্যাঁচড়া, গতিহীন ছুটোছুটি। সকলেরই কাজ আছে এবং সে সব কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র নিষ্কর্মা এই আমি। একেবারে নিষ্কর্মা অবশ্য নই কারণ মাসে একটি দিন, একটি কাজ যথাগুরুত্ব সমাধা করতে হয়। পেনশিয়ন। অন্যান্যরা রোজ রোজ ভি, আই, পি.। আমি ঐ এক দিনের জন্যে স্বীকৃত, অপেক্ষিত গুরু-ব্যক্তিত্ব; ভি, আই, পি।

সংসারের কাজ নেই বলে আমার মনের কাজ বেড়ে যায়। হাত-পা কোলে করে বসে থাকা যায় কিনা জানি না তবে মনকে কোলে নিয়ে যে বসে থাকা যায় না তা বিলক্ষণ জানি। অত্যন্ত চঞ্চল এই মনকে নিয়ে অনেক অকারণ বিপদ যে না ঘটে তা নয়। অনেক দেখে শুনে এটা বুঝেছি যে এই বয়সে মনকে অপরের কাছেপিঠে যত যেতে না দেওয়া যায় ততই ভাল। এক সময়ে নিজের নিজের তরুণ বয়সের সন্তানদের যেমন আমরা আগুনের কাছে বা 'ঘি'-এর নৈকট্যে যেতে দিতে চাই নি ঠিক তেমনি এই সময়ে নিজের মনটিকেও যে কোনও অন্য মনের কাছে যেতে না দেওয়াটাই বোধহয় একটি উত্তম নীতি। তখন পুড়ে যাবার, 'গলে' যাবার ভয় ছিল! এখন তো ছ্যাঁকা লেগে যাবার ভয় হবার কথা। দু'দণ্ড কাছাকাছি হলেই, তখন, সেই তরুণ বয়সে, বিদ্যুৎ স্ফুরণের সম্ভাবনা ঘটে যেতো। আর এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে, দু'দণ্ড কাউকে কাছে পেলেই উপদেশের ফোয়ারা ছিটকানোর তোড়জোড় ঘটে! শেষ বয়সে একমাত্র উপদেশ ছাড়া আর দেবার কিছুই থাকে না; আর যাদের দেখলে এই দান-প্রবৃত্তি উথলিয়ে উঠতে চায় তাদের শত-সহস্র প্রয়োজনের তালিকা আছে, কিন্তু সেই তালিকায় 'উপদেশ' বলে কোনও 'আইটেম' একেবারেই নেই। কোনও কোনও বিষয় আছে যা কেবল মাত্র দানের জন্যেই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, গ্রহণের জন্যে কদাপি নয়! উপদেশ 'সাইফোন'-যোগ্য নয়, 'গ্রীড'-বাহিত হয়ে এক অন্তর থেকে অন্য মনে প্রবাহ-যোগ্যও নয়। উপদেশ-দান স্পৃহাটি তাই মৌচাকের মতোই অন্তরে থিক্ থিক্ করার কথা।

মনের কথা হচ্ছিল। অপরের কাছে না যেতে দিলেই ভাল। কেন ভাল? না, অবজ্ঞার ছ্যাঁকা লেগে যেতে পারে! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে বন্ধু সংগ্রহ হয় না। কেন যে হয় না তা সকল বৃদ্ধেরই জানার কথা। তাহলে ভিতরের পাখা ঝাপটানো চঞ্চল মনটিকে নিয়ে কি করা যাবে? সম্ভাবনা ত্রিবিধ। এক, প্রকৃতি ও প্রাণী জগতে মনকে যথেচ্ছ যোগাযোগ ঘটানোর স্বাধীনতা দিতে পারেন। ওরা কথা বলে না তাই ছ্যাঁকা লাগার সম্ভাবনা নেই। অথচ প্রকাশের আদিগন্ত পটভূমি পাবেন। দুই, নিজের মনে কথা বলতে পারেন। এখানে অবশ্যই অত্যন্ত হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কথা যেন সদা সর্বদাই 'সাব-ভোকাল'—অনুচ্চারিত—হয়, অন্যথা ঢিল-পাটকেল জুটতে পারে! তবে যাঁরা মনের মধ্যে মনকে, জলের মধ্যে মরালের মতো, সহজেই খেলা করার এবং মুক্তির প্রসার দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন, সেই সব কবি সাহিত্যিক শিল্পী-দার্শনিকরা

এই দ্বিতীয় সম্ভাবনার পথ প্রদর্শক। তিন, লোক সমাজে সংযোগ করতে পারেন, তবে উপদেশ-মৌচাকটি নিজের মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যথা সমূহ বিপদ। চিহ্নিত হয়ে যাবার বিপদ থাকবে।

তিন নম্বর সম্ভাবনার ঝুঁকি নিতে পারি না। দুই নম্বর ক্ষমতা আর যোগ্যতার মধ্যে ধরা দেয় না। তাই প্রকৃতি আর প্রাণী জগতই একমাত্র আশা ভরসার এলাকা। আর যদি একঘেয়েমি তাড়া করে তাহলে সন্তর্পণে, পা মেপে মেপে, তৃতীয় নম্বরের এলাকায় একটি-দুটি পা ফেলা চলতে পারে। শতং শূন যা বল নীতিতে নিশ্চয় থাকতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা সমধিক কমে যাবার কথা। তবে একটি স্বস্তির প্রাঙ্গন আছে। বাল্যবন্ধু বা তরুণ কালের বন্ধু পেলে মনের সকল দরজা-জানালা সটান খুলে দেওয়া যায়। জন-সংযোগের এই একটি ক্ষেত্রেই দাক্ষিণে হাওয়া অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে একই সঙ্গে উথাল-পাথাল প্রাণস্পর্শ দিতে পারে। আর সেই দ্বার-গবাক্ষ-পথে যদি উত্তরের বাতাস অথবা শীতের ঠাণ্ডা প্রবেশ করে তাহলেও তা এক মন থেকে অন্য সংবেদনশীল মনের ছোঁয়া পেয়ে সহনশীল হয়ে উঠবে। দীর্ঘ ঘাড় ব্যথার কিছুটা উপশমও হতে পারে। ঘাড় ব্যথা, অথবা বুক ব্যথা অথবা মনের যন্ত্রণাবোধ, বিষণ্নতা।

আমার ঘরের মধ্যে আছে প্রয়োজনের বন্ধুরা, স্বজনরা। তাদের আছে সময় নির্ঘণ্ট, মেজাজ-মর্জির উত্থান-পতন, উপযোগিতার যোগ-বিয়োগ হিসেব। আর আমার ঘরের বাইরে আছে আমার সবুজ বন্ধুরা, অপরিজনেরা। সময়ের ঘোর প্যাঁচ নেই, হেলে দুলে সূর্যের কিরণে আর সমীর প্রবাহে তারা হৃদ্যতা ঘোষণা করে, শিশু-সুলভ প্রাণ চাঞ্চল্যে বেহিসেবী নৈকট্য দিতে চায়। ওরা আছে অনেক, অনেক। কাছে আছে, আছে দূরে। কেউ মাটির কাছাকাছি থেকে ধূসর মৃত্তিকার বুকে সবুজের ছবি, কেউ আকাশে মাথা তুলে নীলের অভিসারী কেউ একা-একা সুদীর্ঘ দেহখানি আদিগন্ত অম্বরের বক্ষলগ্ন করে মৌন-স্থির, কেউ কেউ দলবদ্ধ জটলার ঘন সান্নিধ্যকে গভীরতা দিতে শ্যামলতর। পাখির কলকাকলি এদের মুখে ভাষা দেয় সকাল সন্ধ্যা, বুকে ভালবাসার ছোঁয়া দেয়; তারা নীড় রচনা করে, সন্তান লালন করে আর দেহে চঞ্চলতার স্পর্শ আনে এডাল-ওডাল ছুটাছুটি করে, পাখা ঝাপটিয়ে। সমীরণ এদের যৌথ জীবনে দোলা দেয়, হৃদস্পন্দনকে দ্রুত করে তোলে।

এদের এই সবুজ চাঞ্চল্য আর শ্যামলের দোলদোলানি আমাকে দৃষ্টি ভোজের আনন্দ দেয়। ওদের সঙ্গে কথা বলি না বটে তবে ওদের কথা যেন

শুনতে পাই। অকাজের জীবনে শোনাটাও তো একটা কাজ। তবে ওদের বন্ধুপ্রবর প্রভঞ্জন যখন কোথায়ও দূরে তার নিজের কাজে ব্যস্ত থেকে এই সবুজ প্রকৃতিকে ভুলে যায়, ভুলে থাকে, তখন ওদের বেশ বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখায়। ওরা তো মানুষ নয়, তাই বোধহয় বন্ধু-অদর্শনের বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তখন ওরা কি যেন খোঁজে, কাকে যেন খোঁজে। অথবা, ভরা গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ অবস্থায় ওরা ওদের বিষণ্ণতাকে পাতার মুখে ঝুলিয়ে দিয়ে বোধহয় শান্ত বিকেলের অপেক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের কাছে যাবার বাসনা মনের মধ্যে আঁকু পাঁকু করতে থাকলেও আমার হাত পা বাঁধা! কোমরে ব্যথা নিয়ে স্ত্রী কাছে পিঠে কোথায়ও নিশ্চয়ই পাহারায় আছেন অথবা পুত্রবধূ অথবা তস্য সৈন্যসামন্তরা! যদি সিঁড়ি দিয়ে একপাও নিচে নামার চেষ্টা করি, সেই ভর দুপুরে, তাহলে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যাবে। অপরের দুঃখ যত সংবেদনশীল —কম্প্যাশনেটই হোক না কেন যে মনে সেই সংবেদন তরঙ্গ কম্পন সৃষ্টি করেনি সেই মন নিষ্ঠুর হতে বাধ্য! তাই মনটি দু-পা এগিয়েই আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য। পানের বাটা, বাজারের থলে অথবা পেনশিয়নের টাকা—সবই অপরকে দেওয়া যায়। আমার মনের অনুভবকে অপরের মনের তন্ত্রীতে পেঁছে দেবার পথ কোথায়? সমমনে সঞ্চারণ যদিও বা সম্ভব বিষম মনে তা কি সম্ভব?

সম্ভব যে নয় তা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারি বর্ষার সময়ে। আমার সবুজ বন্ধুরা আকাশে মেঘ দেখলেই সবাই মিলে বন্ধুবর সমীরণের চঞ্চলতায় আলুথালু আনন্দের হাট বসিয়ে দেয়। জানালার ধারে বসে আমার মন অর্ধশতাব্দী পিছনে ছুটে যেতে চায়। ঝরো ঝরো বৃষ্টির খল খল আলিঙ্গনে, বাতাসের পাগলপারা খিল-খিল হাসিতে সবুজের নরম স্নান যেন আমাকে এখনও হাতছানি দেয়। ডাক দিয়ে যায় একেবারে ওদের মাঝমধ্যিখানে সামিল হয়ে যাবার। অতীত ধেয়ে আসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, স্মৃতি ছাপ এঁকে দেয় চোখে মুখে। আমার ভিতরের আমিটা ছুটে চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে। হয়ত বা এই বলি চিহ্ন আঁকা দেহখানাও উত্তেজিত হয়ে উঠতে চায়। ভিতর থেকে জলের ছিটে লাগে, 'জানালাটা বন্ধ করে দাও, ঠাণ্ডা লেগে যাবে!' আর তখনই একটি দীর্ঘশ্বাস অনিবার্য ছুটে যায় ঐ আনন্দমেলার মিলন ভূমিতে যেখানে চলেছে অনাদি অনন্ত প্রকৃতির শৈশবলীলা! ঠাণ্ডা লাগে তো লাগুক, জলের ছাট্ যদি ভিজিয়ে দেয় তো দিক, নয়নের নন্দনকে আমি বাধা দেব না! কম্পস্মৃতি অঙ্গ-সিঞ্চনের শিহরণ দেহে মনে হর্ষময় হয়ে উঠুক তাই চাইব।

কিন্তু বাঁধা পড়ে আছি স্ত্রীর কুঞ্চিত কটাক্ষের ভয়ে আর পুত্রবধূর জাগ্রত প্রহরার জালে!

আমার বাড়ির সামনে যে পিচ ঢালা রাস্তাটা প্রায় পাঁচশ ফুট সটান সোজা চলে এসে আমারই বাড়ির হাতায় দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে সেই রাস্তাটাও, দুপুর বেলায় আমার মতই একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে! একটা দুটো ভাবনা যেমন আমার শূন্য মনের ফাঁকায় ফাঁকায় শ্লথগতি ভেসে ভেসে যায়, ভেসে ভেসে আসে, ঠিক তেমনি করেই দু'চারটি পথিক যেন নিষ্কর্মা ব্যস্ততাহীনতায় ঐ রাস্তা দিয়ে যায়, আসে। কখনও বা দোকান ধারে কারণে অকারণে দু'দণ্ড থমকে দাঁড়ায়। ওর সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে রাস্তার সকাল বিকেল যথেষ্ট ব্যস্ততায় কাটে। শশব্যস্ত যাতায়াত, সময়ের অনটনে তাড়িত লোকজন, অফিসযাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, দোকান বাজার দ্রুত সারার জন্যে ত্বরিতপদ যাতায়াত, দুধওয়ালা-ফেরিওয়ালা। সকলেই শত কাজে তটস্থ। আমার গৃহের অভ্যন্তরেও ঐ একই অবস্থা। সকলেই সচল, ত্বরিত-চরণ; উচ্চ-অনুচ্চ কণ্ঠ কাপ-ডিস থালা-বাসন হাঁড়ি-কড়াই হাতা-খুন্তি, অন্যদিকে বই-পত্র টেবিল-চেয়ার এবং কোনও ঘরে রেডিয়োর সুরেলা কণ্ঠ বা তালবাদ্যের যন্ত্রসঙ্গীত। এমন পারিবারিক অর্কেস্ট্রায় আমার পক্বকেশ ভগ্নকোমর ক্লিষ্ট হাঁটু স্ত্রী পর্যন্ত যথাসম্ভব হন্তদন্ত। একমাত্র আমিই পথপ্রান্তে ব্রাত্য। আমি পথেরও শরিক নই গৃহেও আমার অংশ নেই। তাই মনকে নিয়েই মশগুল আমি।

ওর সঙ্গে, ঐ রাস্তার সঙ্গে, আর একটা বিরাট তফাৎ আছে আমার। রাস্তা নির্বিষয় সর্ববাদী, সকলকেই সমানভাবে স্বীকার করে নেয়, বুকপেতে দেয়। আর আমি? আমিই বা একা কেন? আমরা অনেকেই বিচারবাদী। বিচারবাদী না সংস্কারবাদী? একে পছন্দ তো ওকে পছন্দ নয়, একজনকে ভাল লাগে তো অন্যজনকে ভাল লাগে না। অনেকের 'চলন বাঁকা' মনে হয়, আবার কারো প্রতি অকারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। সবাই সমান—এ কথাটা রাস্তার কাছে যেমন সহজ আমাদের কাছে তেমনই কঠিন। বাস্তব জীবনের প্রতিনিয়তর বাচবিচারে। অবশ্য অনিয়তর ঘোষণায় আমরা এর ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছি: রাজনীতির স্লোগানে, আইনের পুষ্ট কেতাবে আর যাবতীয় বক্তৃতা প্রদানের উচ্চ মঞ্চের তাৎক্ষণিক হাততালিতে!

নিজেকে নিয়ে বলতে বলতে কেমন অনায়াসে 'সকলে' সরে গেলাম! নিজের ক্ষুদ্রতা অক্ষমতা বড়ই পীড়াদায়ক। তাই তাকে সরিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে,

সকলের কাঁধে দায় চাপাতে পারলে 'র‍্যাশনালাইজেশন' ঘটে, স্বস্তি আসে। ক্ষুদ্রতাকে ভাগ করে নিলে সে সহনীয় বোধ হয়! ক্ষুদ্রতার, নীচতার 'দেহ'-ভার একার স্কন্ধে ভারি হয়ে চেপে বসে, তাই বোধ হয় বহু-স্কন্ধ অন্বেষণ! আত্মরক্ষার বৌদ্ধিক ব্যাকরণ—self-defence mechanism !

রাস্তা ছেড়ে মানুষে মন দেওয়া থাক। প্রত্যেক পথিক মানুষ শত শত বিষয়ে বিভিন্ন বিপরীত হয়েও এক জায়গায় সকলেই কেমন এক। প্রত্যেকেই এক একটি সমস্যার বান্ডিল। নিজের মনের মধ্যেও সমস্যার বান্ডিল গৃহে-পরিবারে-সমাজের মধ্যেও এক একটি সমস্যার সূত্র-গ্রন্থি। সবাই সমূহের টানে ছুটে চলেছে, অথবা সমূহর ঠেলায়। দূরের চেতনা মনকে একাগ্র করার সময়ও পায় না, সুযোগও দেয় না। সকলেই যেন এই মুহূর্তটি, এই চলমান সময়টুকু আর আজকের দিনটি নিয়েই ব্যস্ত, তটস্থ। যারা একটু বেশি দূর দেখতে পায় তারা সপ্তাহান্ত শনি-রবি নিয়ে মশগুল হতে পারে মাত্র। তার পর? সেই সোমবার, সেই মুহূর্ত-মুহূর্তের পথ বেয়ে চলমান বর্তমান। সকালে অফিস কাছারি স্কুল-কলেজের, ডাক্তার-বৈদ্য ট্রাম-বাস-ট্রেনের তাড়নায় ত্রস্ত-ব্যস্ত ঘর্মাক্ত দ্রুততা, নাভিশ্বাস ত্বরা, ঠেলাঠেলি-হুড়োহুড়ি, দেহ-পেষন পদ-মর্দন, অন্ধবেগে ধেয়ে চলা। এ সবই তাৎক্ষণিকের আর সমূহের টানে। তাৎক্ষণিকের টানে আর সমূহের উৎকণ্ঠায়। সময়টাই সময়ের কণ্ঠরোধকারী। সময়ের অভাব পরবর্তী সময়ের কণ্ঠরোধ করে চলেছে। প্রত্যেকের কব্জিতে বাঁধা সময়ের বিন্দু-বিন্দু চলন। সেই বিন্দুগুলোই, সেই মুহূর্তগুলোই আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে চলেছে। তাই জীবনের জন্যে কোনও সময়ই বেঁচে থাকছে না, শান্ত চিত্তে শ্বাস নেবার মতো বিন্দুহীন সিন্ধুসময় হারিয়ে যাচ্ছে।

বালিকারা বাল্যকালে খেলার ঘরে সংগ্রহের, খেলনার আর আনন্দের স্তূপ চারধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সময় কাটায়। কল্পনার সুতোয় তাদের সেই জীবনকে সুন্দর করে গেঁথে নেয়, বেঁধে রাখে। তারপর একদিন সেই সুন্দরকে ছেড়ে বাস্তবে জড়িয়ে যায়। আনন্দময় সময়টুকু হাতছাড়া করে তারপর থেকে চলে সমূহের টানে ভেসে চলা। সমস্যা একের পর এক বেড়ে চলে, জমা হয়ে হয়ে পাহাড় প্রমাণ চেহারা নেয়। সমাধান প্রচেষ্টায় যত সমস্যা কূল খুঁজে পায় তার চাইতে বেশি বাস্তবের কোলে নোতুন করে সৃষ্ট হয়। সমস্যার বান্ডিল, বোঝা, প্রত্যেকের ঘাড়ে চেপে বসে যায়! তখন আর বালিকা বা বালক বলে কথা থাকে না। যখন দ্বিতীয় বাল্যকাল বা শৈশব সমাগত হয় তখন এক একজন

পা ছড়িয়ে বসে, চারিদিকের জড়ো করা আবর্জনার জমে ওঠা পাহাড় দেখে দেখে, হাহুতাশ করি। সুন্দর আর আনন্দ কবেই কোথায় হারিয়ে গেছে বলে মনে মনে নিঃস্বতার দীর্ঘশ্বাস দমন করি !

নিজের মনে কথা বলতে গেলে এই অসার আবর্জনার কথাটাই বড় হয়ে উঠবে না তো ? তাহলেই দুঃখবাদ, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তা করা যায় কি ? জরামরণ আদির বাস্তব অনুভবের জন্যে কি মানুষকে গৌতম বুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল ? দুঃখ-যন্ত্রণা তো মানুষের উত্তরাধিকার। সব মানুষের, সব যুগের, সকল সমাজের মানুষের। প্রাণী জগতের জীবনে, আর যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনে, একই বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা, একই দুঃখকষ্ট একই সংগ্রাম চলে আসছে। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে ওরা যেমন গৃহছাড়া ; প্রতিযোজনার টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত, মানুষও তো তাই। তবে একটি বিষয়ে উভয়ের জীবন পরস্পর থেকে বহু দূর সরে যাচ্ছে। মানুষের মাথায় মননের উৎস আছে, হাতে তুলি-কলম আছে, কণ্ঠে গান আছে, মনে স্মরণের মণিরত্নের সংগ্রহ আছে আর হৃদয় বলে একটা উপলব্ধির এলাকা আছে। আছে কিন্তু ক'জনের জীবনে এসব সার্থক হয়ে উঠছে, ওঠার সুযোগ পাচ্ছে ?

সুখের অনুভব প্রাণীদের আছে, আমাদেরও আছে। খাদ্য আমাদের সুখ দেয়, আশ্রয় আমাদের শান্তি দেয়, সন্তান লালন পালন আমাদের আনন্দ দেয়। চোখ কান খোলা রাখলে দেখা যাবে এসবের কোনটাই আমাদের নিজস্ব নয়, প্রাণী জগতে এরা সবই সমান সুখ সমান শান্তি সমান আনন্দ দিয়ে থাকে। সহস্র সহস্র বছর ধরে ওরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহ পেয়ে চলেছে। আমরাও তো তাই। ওদের যেমন অতীত নেই, বর্তমান বিষয়ে অবহিতি নেই, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা নেই, আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্রের, কোটি কোটির ও তাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কতজন পিতৃপিতামহকে মনে রাখছি, মনে রাখার মত করে অধস্তন পুরুষের কাছে থেকে যাচ্ছি ? কিছু কিছু সত্য আছে যা অতিশয় তিক্ত। অভ্যস্ত অহংকারে আঘাত করে বলে বিধ্বংসী মনে হয় ; ধর্মের বিধান না থাকলে আমরা ক'জন পিতামহকে স্মরণ রাখতাম ? প্রতিনিয়ত সামাজিক প্রয়োজনে পিতার নাম উল্লেখ যদি বিধি না হত তা হলে মায়ের শুভ-নামের মতো অনেক পিতার শুভনামই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতো, অন্তত বয়স হয়ে গেলে বা মৃত্যুর পরে ! নিজ নিজ অস্তিত্বের মধ্যে আমরা ক'জনে পিতা-মাতা পূর্বপুরুষদের জন্যে স্থান করে রাখি ? ক'জনই বা স্থানের দাবি রেখে

বাঁচেন-মরেন, বাঁচি-মরি? সংখ্যকোটির অভাব তো শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই রেখে যায় না। স্মরণের পূর্ণতায় যে দু'চার জন দু'দশ জন অমৃত হয়ে ওঠেন তাঁরা নিজের সন্তানের মনেই যে বেঁচে থাকেন তা নয়, তাঁরা সকলের মধ্যে, মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকেন। তাঁরা অবশ্যই সুখ-ভোগের ঊর্ধ্বে উঠে আনন্দের জীবনে নিজেদেরও খুঁজে পান, আবার সেই উপলব্ধ আনন্দকে সর্বজনের জন্যে, আগামীকালের জন্যে, রেখেও যান।

সেই স্বল্পসংখ্যক 'তাঁদের' কথা বাদ দিলে এই লক্ষ সংখ্যক 'আমরা' প্রাণী জীবনই তো যাপন করি। বলা যায় কি যে আমরা আমাদের উত্তর পুরুষের জন্যে অনেক কিছুই রেখে যাই, রেখে যেতে চাই? বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালান্স? কি জানি! প্রাণিজগতে খাদ্য সংগ্রহ করে পূর্বপ্রজন্ম উত্তর প্রজন্মকে আহার যোগানোর ব্যবস্থা অছে, নীড় তৈরি করা আছে, লালন পালন আছে। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে 'কাল'-কের জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। অসময়ের 'চিন্তাভাবনা' একমাত্র মানবিক তো নয়! নয় তার কারণ এ সবই তো ভোগের দেউলে প্রবৃত্তির অলংকরণ। লক্ষ লক্ষ আমরা জন্মাই, বেঁচে থাকি, এবং একদিন মরে যাই, হারিয়ে যাই। কোথায়ও কোনও দাগ কেটে যাই না। অথচ যে কটা দিন মঞ্চে ঘোরাফেরা করি, দাপাদাপি করি, অহংকারে স্ফীত-বক্ষ আর দম্ভে দৃপ্ত-পদ বিচরণ করি, সেই ক'টি দিন ঘুণাক্ষরেও মনে হয় না যে আমাদের সব ব্যাঘ্র-সিংহ-ব্যক্তিত্ব আর শৃগাল-সারমেয়-আচরণ—সবই হঠাৎই একদিন নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে নিজের কাছে, পুত্র-কন্যাদের কাছে, স্বজন-পরিজনদের কাছে। এটাই আমাদের সহস্র সহস্র বছরের ইতিহাস। এই হারিয়ে যাওয়াটাই সত্য। তিক্ত সত্য।

এই সত্য অধিকতর তিক্ত হয় যখন মঞ্চের কেন্দ্র থেকে আমরা ক্রমশই প্রান্তে সরে সরে যাই। যেতে বাধ্য হই। অন্যকে কেন্দ্র ছেড়ে দিতে হয়! তখনও আমাদের অতীত থাকে। থাকে স্মৃতিতে। বর্তমান থাকে। থাকে গঙ্গার ধারে, গাছের তলায়, প্লাটফরমের বেঞ্চে। পরিবারের মধ্যে প্রায়ই থাকে না। থাকলেও 'তুমি চুপ করত'। অথবা 'সকাল-বিকেল একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতেও তো পার'—এমত অনাবশ্যকতার চিহ্ন এঁকে এঁকে থেকে যায়। মৃত্যুর গভীরে চির দিনের মতো চুপ করে গেলে কাঙ্ক্ষিত শান্তি; শুধু সকাল বিকেলের 'মুক্তি' নয় চিরবিদায় সর্বক্ষণের মুক্তি ঘোষণা করে আপনজনের কাছে।

তবে একটি বিরাট প্রভেদ আছে। প্রাণী জগতে স্মরণ নেই বলে পূর্ব

পুরুষকে ওরা যাবতীয় দুঃখকষ্টের দায়ভাগ বহনের জন্যেও স্মরণ করতে পারে না। মানুষের স্মরণ আছে বলেই সে, প্রতি প্রজন্মে, পূর্বপ্রজন্মের স্কন্ধ খুঁজে নেয়। খুঁজে নেয় অভিশাপ দেবার জন্যে, দোষের তল্পিবাহক হবার জন্যে। সব বাবারাই সন্তানদের সকল ক্ষতির, সকল অভাবের, সমস্ত দোষের কারণ!

নিরেট রাস্তা অসাড়। তাই তার বেদনা বোধ নেই। সবুজ প্রকৃতি সহজতম জীবন যাপন করে। তাই তার আনন্দের শেষ নেই। মানুষের মধ্যে স্বর্গ-নরক দুই-ই আছে—স্বর্গের ভাগ অত্যন্ত কৃপণ, নরকের অংশ সর্বগ্রাসী। —এই জন্যেই যে দু' চার জন স্বর্গের পথে পথিক তাঁদের আমরা সকলে মিলে টেনে নামাতে চাই। জৈব জন্মের যাত্রাক্ষণ থেকে জৈব মৃত্যুর সমাপ্তি বিন্দু পর্যন্ত আমরা ভোগের—জৈব ভোগের তাড়নায় ধেয়ে চলি। ধেয়ে চলি এবং একদিন হারিয়ে যাই। যাঁরা এই জৈব স্রোতের খরগতির বাইরে কিছু দেখতে পান, কোনও উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ বোধ করেন তাঁরাই গুহা গাত্রে, পর্বত দেহে, প্রস্তর খণ্ডে, তাঁদের সেই দৃষ্টিকে, সেই উপলব্ধিকে বর্ণে-বর্ণমালায় খোদাই করে রাখতে চান। যেন বলতে চান: তোমরা শোন, জান, দেখ যা আমি শুনেছি, জেনেছি, দেখেছি। এঁরা হারিয়ে গিয়েও থেকে যান, আমরা থাকতে থাকতে এবং থেকে থেকে হারিয়ে যাই। ওঁরা বেঁচে থেকেও বাঁচেন, মৃত্যুর মধ্যেও বেঁচে থাকেন। আমরা মৃতপ্রায় বেঁচে থাকি, মৃত্যুর মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাই।

এই বেদনা বোধটাই মনে হয় আসল। কষ্ট থাকলেই যেমন কেষ্টর প্রতি আগ্রহ জন্মায়, বেদনা বোধ থাকলেও তেমনি উত্তরণের আকুতিটি সেচন পায়। Pessimism-এর অন্ধকার গর্ভেই সম্ভবত প্রকৃত optimism-এর দ্যুতিময় চেতনাটি ভূমিষ্ঠ হতে পারে। বাঁচতে আমরা সকলেই চাই; যোগ্য পথের সন্ধান ক'জনে পাই?

॥ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ॥

স্মৃতি মানুষকে ভাবায়। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনে। সেই স্মৃতি যদি পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো হয় তাহলে প্রতিতুলনার অবকাশ ঘটে। প্রশ্ন জাগে মনে। বিব্রত করে। স্মৃতির ছবিগুলো ভাগ ভাগ হয়ে যেন নিজেরাই আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে পড়ে, জটলা করে। নিজ-নিজ অবস্থানের দোষ-গুণ নিয়ে গুনগুন আলোচনা করে, নিজ নিজ অবস্থানের সমৃদ্ধি আর বঞ্চনার কথাগুলো যেন ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। কি তাদের ছিল আর কি ছিল না, কি তারা পেয়েছে আর কি তারা পায় নি তা নিয়ে তাদের মধ্যে গুঞ্জনটুকু যেন পরিষ্কার শোনা যায়। সেই সব গুন গুন আলোচনা মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার ভিত তৈরি করে, সোচ্চার কথাগুলো যেন প্রশ্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, আর তাদের সমবেত গুঞ্জনটুকু যেন ঢেউ ঢেউ ধেয়ে চলে আসে মনের বর্তমান কুলে উত্তরের আশায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম হয়ে এই যে জীবনের চলন, এই চলন তো স্মৃতির প্রবাহেও সমান সজীব হয়ে ওঠে। আর তখনই প্রশ্ন জাগে মনে ; মন বিব্রত বোধ করে।

ছোট বেলার কথা মনে থাকে। কিন্তু বড় বেলা না হলে মনে পড়ে না। ছোট বেলার স্মৃতি মাথায় দাগ কাটে। কিন্তু বেলা না বাড়লে সে সব যে মনেও দাগ কাটে, কেটেছিল, তা বোঝা যায় না। বোঝা যায় না তার কারণ বোধহয় এই যে ছোট বেলাটাই ছেলেমির বেলা, মাঠে-প্রান্তরের বেলা, নদী নালা খাল বিলের উজান ভাটার বেলা! স্মরণ তখন ছবি মাত্র হয়ে ধরা দেয়, অর্থে-তাৎপর্যে মরমের মাঝখানে স্থান পায় না। সেই সব ছবিগুলো যখন হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, অন্য শত-সহস্র ছবির ভিড়ে চাপা পড়ে যায়, তখন তাদের উদ্ধারের আশা বিন্দুমাত্রও আছে বলে মনেই হয় না। কিন্তু যখন জীবনে অতীতটাই প্রধান উপজীব্য হয়ে দেখা দেয়, স্মৃতিমন্থনই একাকিত্ব ভরাটের একমাত্র উপাদান বলে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে তারা, সেই সব অতীতের ছবিগুলো কেউই হারায় নি। তারা সবাই যেন অসময়ে সময় দেবার অপেক্ষায় নির্জন-বাসে, মনো-বাস করে চলেছিল।

গ্রামের খেটে খাওয়া ঘরের বৌ তারার মা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূ

কাদম্বিনী আর উচ্চবিত্ত বিশিষ্ট সমৃদ্ধ গৃহকর্ত্রী গিন্নীমা। এঁরা সকলেই প্রতীকী। স্মৃতি ছবির পাদমূলে নামাঙ্কনের মতো।

দিবা দ্বিপ্রহর। ঠা-ঠা রোদ। কাকেরা জঠরের তাড়নায় চালার শীর্ষরেখা বরাবর অথবা গাছের ডালে। সুযোগের অপেক্ষায়। উঠোনে ধান-চাল-অথবা-কলাই। বিছানো। সূর্য তাপে তাদের ডাঁটো করা হচ্ছে, গোলাজাত হবে বলে। খ'ড়ো চালার স্বল্পতম ছায়াটুকু সম্বল করে, দাওয়ার একেবারে পাশটি ঘেঁষে, এক-কাপড়ের আড়ালে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে, উবু হয়ে, তারার মা। হাঁটুর উপর বাহু আর বাহুর উপর থুতনি রেখে বসে আছে। বসে থাকবে হাতে যা-হোক-একটা কিছু নিয়ে, কাক-শালিক তাড়ানোর জন্যে; তার শরীর কাজের আঁটুনিতে চনমনে থাকে, তাই এই দ্বিপ্রাহরিক প্রহরা-উপবেশন তার শরীরকে ঢিলা করে দেবে, মনকে নিস্তেজ এবং চোখের পাতাকে করে তুলবে বুজু-বুজু! আর তাই মাঝে মাঝে যখন তাকে উঠে গিয়ে শায়িত শস্যকে উল্টে-পাল্টে দিতে হবে, সূর্যতাপে সকলকেই সমান ঝরঝরে করে তোলার জন্যে, তখন বাঁ হাতের চেটো দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুকে চাপ না দিলে তারার মায়ের শরীর খাড়া হবার শক্তি পাবে না!

আর কাদম্বিনী? মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূ? দ্বিপ্রহরের আহার সমাধা করে গৃহস্বামী অনেক আগেই বাইরের ঘরে বা বৈঠকখানায় ফরাশের আড্ডায় পাশার দান ফেলতে চলে গেছেন। ছেলে মেয়েদের যে-যেমন খেয়ে-দেয়ে যে-যার সরে পড়েছে। অবেলায় স্নানান্ত ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে কাদম্বিনী ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ভাতের থালায় মন দিয়েছেন। রান্নাঘরের ভিতরে ছোট্ট খুরোঅলা পিঁড়িতে পাশ হয়ে বসে আনমনে ছোট ছোট গ্রাস তুলছেন আর হয়তো বিকেলের শত কাজের হিসেব কষে নিচ্ছেন মনে মনে। শতবার তাড়ালেও যে যায় না সেই বিড়ালটি অদূরে বসে আদুরে গলায় ম্যাঁও ম্যাঁও করে কাদম্বিনীকে সঙ্গ দিচ্ছে। একমাত্র সঙ্গী। দৃশ্যমান। অন্য যেটি আছে সেটি রাতের পাহারাদার ভুলো। বাইরে দাওয়ার নিচে লম্বা হয়ে সে শুয়ে থাকবে। দেখা যাবে না। ঝোপে ঝাড়ে পাখির ডাক মাঝে মাঝে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করবে। কাদম্বিনী সকলকেই সেবা দেবে, সঙ্গ দেবে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত একাকিত্বে আপনজন-পরিজনদের কেউ কাছে থাকবে না। থাকবে ঐ 'মিনি' 'ভুলো' আর কোনও অদৃশ্য পাখি। সে তাই রান্না ঘর শেষ করে, ঘরের শূন্য গহ্বরে একমাত্র পানের বাটাটি সামনে নিয়ে মনের নিমগ্ন গভীরে ডুব দেবে।

তারার মা তার সবটুকু বিলিয়ে দেবে অপরের গৃহের কাজে ; কাদম্বিনী তাঁর সবটুকুই ঢেলে দেবে স্বামী-পুত্র-কন্যার বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্যে। একজন বাইরে একা কাটাবে, এমন কি নিজের সংসার বলেও তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকবে না ; অন্যজন ঘরে কাটাবে, একা-একাই, তবে নিজের সংসার বলতে তার স্বামীর সংসার বোঝাবে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তারার মা এই নিঃস্বতার মধ্যে বেদনা বোধ করে নি, এই একাকিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে খুঁজে পায় নি। জীবনের চাপ কর্তব্যের দাবি তার কাছে অমোঘ এবং দৈব বলেই মনে হয়েছে। কাদম্বিনীর অনুভবও একই রকমের। সে রামায়ণ মহাভারতের চেতন-জগতে নিজের মধ্যবিত্ত মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তাপ-উত্তাপকে সামিল করে শান্তি পেয়ে অভ্যস্ত ছিল। ব্রত-পার্বণ অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে তার জীবনে ছুটির বাতাস বয়ে আনত। গৃহবধূর জীবনের সুখ-দুঃখকেই তারার মা তার নিজের সুখ-দুঃখ বলে সমপাত অনুভবে ভাসিয়ে দিত।

কিন্তু উচ্চবিত্ত গিন্নীমা? কুড়ি ইঞ্চি পাকা দেওয়ালের টানা বারান্দার আড়ালে সুপ্রশস্ত সুবিন্যস্ত কক্ষাভ্যন্তরে বহির্জগত থেকে প্রায় নির্বাসিত গিন্নীমার দ্বিপ্রহর কাটে মেহগনি কাঠের মসৃণ পালঙ্কে অর্ধ-শয়ান একাকিত্বে। স্বর্ণালংকারের ঠিন্-রিন্, দীর্ঘশ্বাসের ভারি শব্দ, কড়ি-কাঠের সুসজ্জিত বিন্যাস ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি নাই, দৃশ্য নাই, উপস্থিতি নাই, সম্পন্ন শূন্যতা নিয়ে কাটান সময়কে তিলে তিলে হত্যা করে। কর্তব্য বলতে কড়িডোরে পায়চারি, দাস-দাসীদের প্রতি নির্দেশ এবং অবরে-সবরে উপন্যাসের পাতা ওল্টানো। বিশাল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত গিন্নীমারা বাইরের আকাশ-টাকে যেমন হারিয়ে ফেলেন তেমনি ভিতরের শূন্যতাকে ভরাট করার জন্যে চোখের জল আর অন্তরের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পান না।

গ্রামের এই ত্রি-বিত্ত জীবন শুরুর চলনে অসমান হলেও তাই সমাপ্তির চরণে এসে সমান, একাকার হয়ে যায়। জীবনের সকালে তারার মা জেগে ওঠে ক্ষুধার তাড়নায়, কাদম্বিনীর ভোর আসে, পাখির ডাকে নয়, কর্তব্যের হাতছানিতে আর গিন্নীমা নিদ্রাত্যাগ করেন আলস্যের আড়মোড়া ভাঙ্গতে। তারার মা দিনের সকাল খুঁজে নেয় অপরের গৃহে, কাদম্বিনী দিনের সকালকে সন্তান-সন্ততি আত্মীয় পরিজনদের জন্যে বিসর্জন দিয়ে বসেন আর গিন্নীমা আর একটা দিনকে মৃত-দিন-সমূহের ভিড়ে ঠেলে নিয়ে যেতে ক্লান্ত অবসন্ন পদে রাতের গভীরে নিয়ে যাবার প্রস্তুতিতে নিজেকে নিয়োগ করেন! কিন্তু সমাপ্তি-চরণে এঁরা সকলেই

এক। নিঃসঙ্গ একাকিত্বে, বঞ্চনার বিড়ম্বনায় আর নিঃস্বতার অনুভবে জীবনের বিকেলে দাঁড়িয়ে এঁরা সবাই ধূ-ধূ অতীতকে ধূসর, বন্ধ্যা আর তাৎপর্যহীন দেখতে পান। এঁরা সকলেই অপরের জন্য নিবেদিত। কৃষি-সভ্যতার ক্রমঅভিব্যক্ত পরিণতি পুরুষ শাসিত সমাজ। পুরুষ-প্রাধান্যের বেদীমূলে বলি-প্রদত্ত এই সব তারার মা কাদম্বিনী আর গিন্নীমায়েরা তাই মৌন এবং মূক।

এঁদের পাশাপাশি তারার বাবা, কাদম্বিনীর স্বামী আর কর্তামশাইকে দেখা যাক। সাতসকালে, সূর্য ওঠার আগেই, কোচরে চাট্টি মুড়ি নিয়ে, কাঁধে লাঙল মাথায়-গামছা তারার বাবা যাবে আলপেরিয়ে জোড়াবলদ তাড়িয়ে জমি চাষ করতে। সে জমি তার নিজের নয়, সে ফসলও তার নিজের হবে না। আহ্নিক গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জমি ফালা-ফালা হতে থাকবে, সূর্যের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে গায়ের ঘাম বারে বারে গামছায় মুছবে। দ্বিপ্রহরে গাছের ছায়া যখন ক্ষুদ্রতম হবে তখন ছোট্ট তারার পথ চেয়ে বার বার লাঙল আর বলদ থেকে চোখ সরে সরে আল মুখী হবে। গামছায় বাঁধা পান্তাভাতের গামলায় দু'চারটি কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ নিয়ে তারা আসবে বাবার খাবার মাথায় করে। গরু গুলোকে ধারে কাছের জাঙ্গালে বা গাছে বেঁধে দিয়ে বাপ-বেটি বসবে গাছের লম্ব-ছায়ায়।

কাদম্বিনীর স্বামী ভোরের সূর্য ঘরের মেঝেতে আলপনা আঁকলেই উঠে পড়বেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আগুন-মুখ মাটির কলকেটি বাড়িয়ে ধরা হুঁকোর শীর্ষে স্থাপিত পাবেন। স্ত্রী, কন্যা, অথবা অন্যকেউ সংগ্রহটুকুকে সজীব রাখতে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কলকের আগুনকে উজ্বল রাখবে। তিনি সেই হুঁকোটি নিয়ে, একটু বিলাসী হলে গড়গড়াটি সঙ্গে করে বাইরের ঘরে ছন্দ-লয়ে শব্দ তরঙ্গ তুলবেন। অথবা একেবারেই বাহির বাটিতে প্রস্থান করবেন। সকালের বিশ্রামটুকুকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন। কখনও একা একা শুরু করে সকলে হবেন, কখনও, বিলম্বে গাত্রোত্থান ঘটলে, সকলের মধ্যে মিশে যাবেন। যদি কোনও কাজ থাকে তাহলে একে-ওকে ডেকে-হেঁকে সেই নির্দেশ যথাস্থানে পেঁছে দেবেন। হাদান গুরুবর অথবা সনাতন কেউ না কেউ ডাকের মধ্যে এসে যাবে। ভিতর বাড়িতে কোনও নির্দেশ থাকলে মানদা, মোক্ষদা তারার মা তো আছেই। স্ত্রীর স্বামীত্ব এবং গৃহের সত্বস্বামীত্ব যথেষ্ট গুরুভার কাজ, তার বাইরে এঁরা যাই করেন এবং যতটুকুই করেন তা অবশ্যই অতিরিক্ত। ছেলে মেয়েদের পাঠশালা পর্যন্ত পড়াশুনোর দায় প্রধানতই স্কুলে গুরুমশাই

এবং গৃহে তৎ তৎ জননীদের। একটু উঁচু শ্রেণীতে, বিদ্যালয়ে যখন যাবে তখন মেয়েদের আর দরকার কি? ছেলেরা নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নেবে; বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেত্রাদি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেই দায়িত্ব বোধকে চাঙ্গা করে তুলবে। এই সব গৃহস্বামীরা কখনও সখনও ছাতা মাথায় অথবা লাঠি হাতে জমি জিরেত দেখাশুনা করতে মাঠে যাবেন, চাষ-বাস বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন, শস্য সমাগমের সম্ভাব্য হিসেব নিকেশ করতে করতে গৃহে ফিরবেন। ফলে এঁদের দিনের বেলা এবং পেটের ক্ষুধা দুইই বাড়বে।

উচ্চবিত্ত কর্তামশাইরা কেউ বা কত্তাবাবু, কেউ রাজামশাই কেউবা শুধুই 'হুজুর'। এঁদের সকাল সূর্যের কিরণে শুরু হবে না, বিশ্বপ্রকৃতি যখন শতকণ্ঠে দিনের যাত্রারম্ভ ঘোষণা করবে তখনও সেই শব্দব্রহ্ম এঁদের কুড়ি ইঞ্চি দেওয়ালের প্রতিরক্ষা ভেদ করে ঘরের মধ্যে যে ঘর সেই শয়নকক্ষের গভীরে প্রবেশের পথ পাবেনা। বিগত যৌবন রাত্রির স্বপ্ন অবশিষ্টে এঁরা অবশ ঘুমের অতলে নিমজ্জিত হন বলে তরুণ দিনের স্নাত শুদ্ধ প্রকৃতিকে খুঁজে পাবেন না। বিলম্বিত সকালে ক্লান্ত রাত্রির আলস্য আড়াল করতে এঁরা সমৃদ্ধ আহারের সুসজ্জিত পরিবেশনকে আপন করে নেবেন। ইজি চেয়ারের আধো শয়ান শরীরের গ্লানি মোচনের জন্যে পদসেবার ব্যবস্থাকে আরামপ্রদ করে তুলতে পদদ্বয়কেই সেবকের কোলে পৌঁছে দেবেন। হাতে থাকবে সোনা বা রুপো বাঁধান গড়গড়ার সুদীর্ঘ আলুলায়িত প্রান্তভাগ। তানপুরার বোলের মতো করে সেই পূর্ণকুম্ভ গড়গড়া গম্ভীর নাদ তুলবে। ছন্দ-লয়-তান সুউচ্চ কক্ষের চার দেয়ালে মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে বুলিয়ে ছাদের ঝাড়বাতিকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে যাবে। তন্দ্রালু আঁখি পল্লবে আরামটুকু বাবুই পাখির নীড়ের মতো ঝুলে থাকবে। সূর্যের তাপ আর পৃথিবীর ঘূর্ণ্যন, বহির্জগতের কর্মপ্রবাহ আর অন্দরমহলের নিঃশব্দ একাকিত্ব, এই কক্ষটির বাইরে এসে থেমে যাবে ঃ হুজুর বিশ্রাম করছেন!

গ্রামের পটভূমিতে আঁকা এই সব ছবি স্মৃতির দেয়ালে এখনও ঝুলন্ত। অন্য অনেক ছবিই হয়তো হারিয়ে গেছে, আবছা হয়ে গেছে। কিন্তু এরা যেন এতদিন পরেও, সমান নয়, বেশি পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ছে। এর কারণ বোধহয় এই যে যখন থেকে মনের পটে ছবি নিজে নিজেই ধরা দেয় সেই তখন থেকে এই শেষ বেলায় যখন ছবিরা নিজ নিজ প্রত্যক্ষে সংগ্রহ হতে থাকে তখন, অনেক কিছুর সঙ্গে, দেখার দৃষ্টি-টাই পাল্টে যায়। তখন তুলনা সম্ভব হয় না, আর এখন ছবির সঙ্গে তুলনাটা যেন স্বাভাবিক হয়েই ফুটে ওঠে। নারী ও পুরুষের এই যে পুরোনো

গ্রামভিত্তিক স্মরণ-ছবি এর পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রজন্ম, এবং এখন, তৃতীয় প্রজন্ম ছবিগুলো যেন তীক্ষ্ম রঙে ধরা পড়তে চায়।

তার আগে, সেই একই সময়ে, শহর-আধাশহরে নারী আর পুরুষের স্মরণ ছবিগুলোর ধুলো ঝেড়ে নেওয়া যাক। শহর আধা শহরে আছে কল-কারখানার ডাক, গঞ্জের টান, লেনদেন-সর্বস্ব কর্ম জীবনের হাতছানি। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, ব্যবস্থা। তাই বসতি স্থাপিত হতে হতে কোথায়ও বা বস্তিতে পর্যবসিত, কোথায়ও পাড়াভিত্তিক মধ্যবিত্ত উপবসতি-ক্ষেত্র আবার কোথাও উচ্চবিত্ত কোঠাবাড়ি, বাগানবাড়ি ইত্যাদি। গ্রামের শান্ত বাতাবরণটি নেই, সবুজের নৈকট্য নেই, পরিবর্তে সংযোজন ঘটেছে ধুলো ধোঁয়ার যান্ত্রিক ব্যস্ততার তাড়নায় দৌড়-ঝাঁপ, তাড়াহুড়ো এবং ক্রমশই, সময়াভাব।

ফলে তারার মা ঘরের ছাঁচের ছায়াটুকু হারিয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্রাম এবং স্বস্তিও তার উবে গেছে। এক বাড়ির সুনিশ্চিত কাজের বদলে তাকে এখন শত কাজের উঞ্ছবৃত্তির সাহায্য নিতে হয়। জমি এবং শস্য-উৎস থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মধ্যবিত্ত কাদম্বিনী এবং নিম্নবিত্ত তারার মা উভয়েই জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর কাজের সময় অসময় নেই, সকাল-বিকেল নেই। তারার বাবা কোথায় কোন মিলে যায়, অথবা কারখানায় অথবা গঞ্জের কেনা-বেচায় সামিল হয়। গাছের নিচে প্রকৃতির আপন হাতের ব্যজনে এখন আর শ্রান্তি দূর হয় না, কর্মশালার মাঝমধ্যিখানে ঘর্মাক্ত দিন পার করে ঘরে ফেরে। ক্ষুধার অন্ন এখন আর জমির সম্বৎসর যোগান থেকে স্বাভাবিক আসে না, ব্যাগের তলানিতে বাজার থেকে ঝুলে ঝুলে ঘরে ঢোকে। হিসেবের থই পায় না, পায় না অভাবের হদিস। গ্রামের জীবনে বেঁচে থাকার উপায় সুনিশ্চিত ছিল। এখন দু'জনে আয় করেও দারিদ্র ঘোচেনা। বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারা, তারার মা, তারার বাবা এখন গৃহস্থকে দেখতে পায় না, মালিক প্রকৃতির অক্টোপাসদের দেখতে পায়। কল্পনার আয়নায় বার্ধক্য নয়, কঙ্কাল ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

এদিকে কাদম্বিনী তার পানের বাটাটি হারিয়ে বসেছে। স্বামীর আছে দোকান অথবা অফিস অথবা কাছারি। সকাল এখন দীর্ঘলয়ে যাত্রা শুরু করে না, তড়বড় করে ছুটে আসে। সঙ্গে ধেয়ে আসে ঘুঁটের ধোঁয়া, পথের ধুলো, কলকারখানার তীক্ষ্ম বাঁশির একটানা সময় ঘোষণা। ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজ, কুয়োতলা কলতলার কাচাকুচি এবং প্রতিদিনের বা প্রতি সপ্তাহের শত কাজের জের টেনে টেনে বিকেল, সন্ধ্যা এবং অবসন্ন রাত্রি। এখানেও জমির

উৎস থেকে উৎখাত হওয়া কাদম্বিনীর সময় নেই সংসারের যাতাকলের চলনে পেষণে, স্বামীরও সময় নেই কিছু অধিক অর্থ যোগানের তাড়নায়। স্বামী হারিয়েছেন তার অতি সাধের হুঁকো-গড়গড়া, ধরেছেন সস্তা সিগারেট। তবে সুযোগ পেলেই তিনি তাস-পাশার আড্ডায় চলে যাবেন। পলায়ন স্বামীর পক্ষে এখনও সম্ভব কিন্তু স্ত্রীদের পলায়নের সব পথ গ্রামেও বন্ধ ছিল শহরেও বন্ধই রইল। এরা পেল অর্থ আর হারাল সঙ্গীত। গ্রামের কাদম্বিনীদের ছিল শস্যের যোগান, আর তার সঙ্গে শাস্ত্র সঙ্গীত। টাকার টানে ওঁরা এলেন, অথবা ওঁরাই টাকার হাতছানিতে ছুটে এলেন, শহর-শহরতলিতে। শান্তি কিন্তু সঙ্গ দিল না, সঙ্গীত আলেয়ার মতো, মৃগতৃষ্ণার মতো, অধরাই থেকে গেল।

উচ্চবিত্তের ক্ষেত্রে পৃথক ফল দেখা দিল। অধিকাংশের সমৃদ্ধির উৎস রইল গ্রামে আর ভোগের মুখটি সরে এলো শহরে। অনেকে আবার শহরের সম্পন্নতার উৎসটির সন্ধান পেয়ে গেলেন। বড় বড় থামের আড়ালে মহলের পর মহল তৈরি করে এঁরা সকলেই আয়েশে আরামে, দিনান্ত নিশান্ত উপভোগের অঢেল প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলেন। পত্নী-উপপত্নী-অতিপত্নী সমভিব্যাহারে মনের অবশিষ্ট হুঁশটুকু অন্যত্র গচ্ছিত রেখে ভোগের তীব্র দ্যুতির সামনে পতঙ্গের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিজের অন্তরের গভীরে দ্যুতি এবং হুঁশ দুই-ই খুঁজে পেলেন তাঁরা ইতিহাস তৈরি করে গেলেন। বাকিরা ইতিহাস হয়ে গেলেন মাত্র। গ্রামে থেকেও এঁরা নষ্ট হলেন এবং নষ্ট করলেন, শহরের জীবনে এসেও এঁরা ভ্রষ্ট হলেন। গ্রাম থেকে নিলেন অনেক, দিলেন না কিছুই ; শহরে এঁরা হারিয়ে যেতে বসলেন এবং সেখানেও দিলেন না কিছুই।

বোধ হয় বলাটা ঠিক হল না। দিলেন। অনেক অন্ধকার বাড়িয়ে দিলেন। গ্রাম্য পরিবেশে এঁদের গিন্নীরা প্রদীপের মতো আলোর বিন্দুটি হয়ে তবুও টিমু টিমু করে জ্বলতে চেষ্টা করতেন, শহরের মহলের ঘেরাটোপে সেই গৃহিণীরাই জীবন্ত 'মমি' হয়ে গেলেন। স্বর্ণালংকারের ভার, মূল্যবান শাড়ির পরিচ্ছন্ন আবরণ আর দাস-দাসীর ভিড়ে অন্দর মহলের গিন্নীরা শ্বাসরুদ্ধ প্রাণান্ত জীবন যাপন করে চললেন।

পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের এঁরাই প্রথম পুরুষ। নারী চরিত্ররা আছেন কিন্তু জীবন্মৃত। সেই মৃত-অস্তিত্বের অনুভব তাঁদের পীড়ন করছে না। পীড়ন করছে না কারণ পীড়নের বোধটাই তাঁদের মনের জমিতে অঙ্কুরিত হতে সুযোগ পায় নি। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের নির্দেশ-উপদেশ নীতি-নিয়ম

আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই তাঁরা একমাত্র প্রেয় বলে, কাম্য বলে, মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এটাই তাঁদের মনে একটা বিশ্বাসের মত, শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিকের মত, সহজ হয়ে সত্য থেকে গেছে। গৌরীদান প্রথার প্রাবল্যে বালিকাদের transplantation এ বা পিতৃগৃহ থেকে উৎপাটন এবং স্বামী গৃহে সমূল সংস্থাপন প্রক্রিয়ায়—ব্যাপারটাও বেশ সহজ-সরল ছিল। 'গৌরী' হওয়া পর্যন্ত সময়কালটুকুও মাতা পিতা সমাজ-পরিজনে মিলে বালিকাদের 'গৌরী' করে তুলতে একমন একপ্রাণ একতার সূত্র অনুসরণ করতেন। রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান সমূহ এবং তৎসহ বিচিত্র-বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ আচার-বিচার এই সকল গৌরী-মানস নাবালিকাদের জীবনের অবশিষ্টটুকুকে পারানির কড়ির যোগান দিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবেই সক্ষম ছিল। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণের সকল জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে—শিক্ষা-অনুশীলন মনন-চিন্তন এর 'বাতাস লাগা' থেকে এঁদের দূরে সরিয়ে রেখে বড় করে তোলার, গৌরী করে তৈরি করার, সকল ব্যবস্থাই পাকা হয়ে যেতো। তাই বলছিলাম মানসিক মৃত্যুর চেহারাটাই এঁদের চোখে জীবনের, ন্যায়-নীতির, শ্রেয় প্রেয়র রূপ নিয়ে প্রতিভাত হত। দড়িতে সাপ দেখা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের ন্যায়শাস্ত্র সম্মত বিশ্লেষণেই সত্য নয়, বাস্তব প্রত্যক্ষ হিসেবেই তা সত্য। সেই সাপ দেখে যেমন লাঠির সন্ধান সম্যক প্রতিক্রিয়া, ঠিক তেমনি পুরুষের সামনে নারী তার নিজের মৃতদেহখানি দেখলেই পাদোদক সেবনেচ্ছায় পাথর বাটির অন্বেষণ করবে একটাও অজ্ঞতার সম্যক প্রতিক্রিয়া। আর তখনই মধ্যবিত্ত স্বামীত্ব অথবা উচ্চবিত্ত পৌরুষ গড়গড়া-আলবোলায় নিশ্চিন্ত মনোনিবেশের সুযোগ পায়। অন্তরের তৃপ্তিকে গড়গড়ার ধ্বনিতে প্রকাশ করেন।

কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে ক্রমে এ-ব্যবস্থার ভিত ধ্বসে গেল। ধ্বসে গেল কারণ সময় লক্ষ্মীর মতোই চঞ্চলা, সময় করো মুখ চেয়ে বসে থাকে না। তার আগে দ্বিতীয় প্রজন্মের কিছু স্মরণ ছবি মনের দেয়ালে টাঙিয়ে নেওয়া যাক।

তারার মায়েরা এখন আরও সকালে ওঠে। পাঁচ বাড়িতে কাজ করে, সাত বাড়িতে জলের যোগান দেয় এবং নিজের সংসারে তাতোধিক সন্তানের জন্ম দেয়। ছায়া এদের জীবন থেকে চিরতরেই হারিয়ে গেছে। অলস অপরাহ্ন নেই, দু'দণ্ড বিশ্রামের অবকাশ এদের মনের আকাশেও নেই। গ্রামে আর শহরে তারার মায়েরা সমান ব্যস্ত। শুধু কাজের ধরনই যা আলাদা আলাদা। সংসারের যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা সামলাতে তারার মায়েরা যত বেশি ঘাড় পেতেছে

তারার বাবারা তত বেশি বেশি করে খাটিয়ায় চিৎ হতে পেরেছে, বিকেলের হাঁড়িয়ার আসরে হাজিরা দীর্ঘায়ত করতে পেরেছে অথবা অপরের দাওয়ায় বসে পরনিন্দা পরচর্চার সুযোগ পেয়েছে। যে শ্রম অর্থ সংগ্রহ করে সেই শ্রমই পরিশ্রম এবং সুতরাং বিশ্রামের দাবি রাখে। যে শ্রম অর্থোপার্জনের জন্যে ব্যয় হয় না সেই শ্রম শ্রমই নয়! কিন্তু এ নীতিতে তারার মায়েরা বিশ্রামের দাবি তুলতেই পারে। কিন্তু না। ঘরে বসে বসে এখানে সেখানে, এ বাড়ি ও বাড়ির কাজ আবার একটা কাজ নাকি? যন্ত্রপাতি, কারখানার ঘর্ঘর, সকাল দুপুর বিকেলের বাঁশি এবং আট-দশ ঘণ্টার অনুপস্থিতি থাকলে তবেই তো কাজ! তাই তারার মায়ের নারী-শ্রম শ্রমের মর্যাদা পাবে না। যুক্তি খোঁজে শুধু বলীর বাহু, চাহে না ন্যায়ের পানে—মেষ ও নেকড়ের জলঘোলা করার উতোর চাপান স্মর্তব্য!

এই একপুরুষের ব্যবধানে তারার মা খুব জোর হারুর মা হয়েছে কিন্তু কাদম্বিনীরা সুজাতা শ্রীপর্ণা মালবিকায় রূপান্তরিত হয়ে সংসারের কাঁসার বাসনকে স্টিলে পাল্টে নিয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। ভোগের সামগ্রী শহরে ঢল নামিয়েছে। সেই স্রোত ধীরে ধীরে গ্রামের পথে পথে জীবনকে প্রভাবিত করেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্র-সংখ্যা বাড়ছে, ছাত্রীরা মধ্যবিত্ত সমাজে স্বীকৃতির শিরোপা পেতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, দেশভাগ, এবং মতাদর্শের পূজারী পুরোহিতদের তাড়নায় চেতনা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে দলবদ্ধ আদায়-ক্ষমতা বাড়ছে। তাই পাঠশালা, প্রাথমিক বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয় ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। শস্য সংগ্রহের বদলে অর্থ সংগ্রহ, ফসলের বীজ জমিতে রোপণ করার পরিবর্তে মতাদর্শের বীজ মনের জমিতে উপ্ত করা চলছে। মূল্যবোধ পাল্টাচ্ছে, জীবনের আদর্শ স্থানান্তরিত হচ্ছে, শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্র এখন আর মননের এবং মানসমন্দিরের স্থান নয়, সংগ্রামের পথ এবং পাথেয়। মধ্যবিত্ত জীবনের লক্ষ্যটি অচিরেই স্থির হয়ে গেল : অধিক অর্থ, অধিক শিক্ষা, অধিক ভোগ। দেখতে ত্রিবিধ হলেও আসলে এরা সকলে মিলে এক; অর্থ শিক্ষার এবং ভোগের জন্যে, শিক্ষা অধিক অর্থোপার্জনের জন্যে এবং অধিক অর্থ অধিকতর ভেগের জন্যে। রামায়ণ মহাভারত অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। পশ্চিমের উন্মুক্ত দ্বার পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উপহারের (?)—উপভোগের—লক্ষ্যকে সামনে সটান 'খুড়োর কল'-এ ঝুলিয়ে জীবন দ্রুত ধেয়ে চলল।

এই অবস্থায় তারার মা, হারুর মা, লছমীরা, বাইরের কাজ নেই বলেই, ভিতরের সব কাজ পেয়ে গেল। সুজাতা, শ্রীপর্ণা, মালবিকারা অঢেল সময় পেয়ে নাটক-নভেল, সিনেমা-থিয়েটার, ঘর-গোছানো ঘর-সাজানোতে অধিক মন এবং বেশি সময় দিতে পারলেন। শিক্ষার প্রবাহকে সতেজ রাখার জন্যে সকাল বিকেল সন্তানদের পাশে থাকলেন। গ্রামের প্রথাসিদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এঁরা রুচি সম্মত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে লেগে গেলেন। গয়ংগচ্ছ আহ্নিকগতি সংসার নয়, পরিবারের টানে এঁরা সীমিত পরিবারের মধ্যে অসীম উপভোগকে দেখতে পেলেন।

গৌরীদান কোথায় হারিয়ে গেল। 'পার্বতী' হয়ে শিক্ষা পর্বতের ধাপে ধাপে বালিকারা কন্যা হয়ে বেড়ে উঠতেই অভ্যস্ত হয়ে গেল। গৌরীদানে যে কাঁচা অপরিণত দেহমনের বান্ডিলটি স্বামীর উত্তরীয়তে সংযুক্ত হয়ে শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করত এখন আর তেমনটি হবার সুযোগ রইল না। ডাঁট, পরিণত নারীটি হতে হতে এখন কন্যাদান ঘটতে লাগল। Transplantation এখন অনেক আয়াসসাধ্য ব্যাপার হয়ে গেল। আগে, গৌরী দানের আমলে, যারা শুধুমাত্র পুতুল খেলার সাথীদের ছেড়ে আসত তারাই এখন, এই কন্যাদানের সময়ে, অনেক ছল-ছলাৎ অতীত, অলিগুঞ্জরিত কুঞ্জবীথির স্মৃতি পিছনে ফেলে আসতে বাধ্য। তুলনা, প্রতিতুলনা। মূল্যায়ন প্রতিমূল্যায়ন। আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-অনুভব। মুক্ত জীবন, বদ্ধ জীবন, স্বাধীনতা-পরাধীনতা। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। শত শত। শিকড় ছেঁড়া, আশৈশব মৃত্তিকা-উৎপাটিত এই সব পার্বতী-কনেরা প্রতিস্থাপনার পর্বে-পর্বে বেদনার বোধে জর্জরিত। পুরুষ শাসিত ব্যবস্থায় এই সব নীলকণ্ঠ জীবন আগামী দিনের, তৃতীয় পুরুষের সূতিকাগার। অর্থ ও ক্ষমতার নেশায় গ্রস্ত পুরুষরা 'নীরো'র বাদ্য ঝংকারে আকণ্ঠ সন্তোষ পান করে বুঁদ। তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের একটি করে এক্স 'ক্রোমোসোম'-এর সঙ্গে এক ফোঁটা করে এই বিষকুম্ভ নীলকণ্ঠের দান অনিবার্য হয়েই ঝরে পড়তে পারে—এ কথা শক্তির মদির নেশাগ্রস্ততায় পুরুষরা বুঝতে পারেন না।

নিম্নবিত্ত সমাজে আর উচ্চবিত্ত সমাজেও নীলকণ্ঠ নারীরা সামাজিক অগ্নেয়গিরি হয়ে উঠলেন। তারার মা, হারুর মা, লছমীরা দিনান্ত পরিশ্রমের পর স্বামীর দম্ভ দেহের সর্বত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়। অভাবের সংসারে নারীর চুল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পিঠ সেই দম্ভকে ধারণ করে, বহন করে। আর স্বভাবের

টানে সেই নারী দেহই জঠরের গভীরে তৃতীয় প্রজন্মকে লালন করে—করতে বাধ্য। বিষ, কণ্ঠ ছাড়িয়ে সেই বীজে ঝরে পড়তেই পারে। চার পাশে ভোগের উপকরণ কল্ কল্ খল্ খল্ প্রবাহিত। দীর্ঘ উজান যাত্রা স্বাভাবিক নয়। হাতছানিতে কাবু হয়ে পড়া নিম্নবিত্ত জীবন শিক্ষার পথেই অর্থের প্রাচুর্য মনে করে সেই পথে পা বাড়ায়। শক্তির সংগ্রহ ক্ষীণ বলে স্বল্পবিদ্যাই প্রাপ্য হয়। ভয়ংকর সেই অবস্থান। না ঘরকা না ঘাটকা এই সব ছেলে মেয়েরা জীবনকে দেখতে পায় মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের জানালা পথে, কিন্তু অধিকারের আওতায় খুঁজে পায় না সেই হই হই থই থই ভোগের জীবন। এরাও তাই কণ্ঠেই শুধু নয় দেহমনের সর্বত্রই নীল-বোধ নিয়ে বাঁচে। বিষাক্ত তৃতীয় প্রজন্মের এরাই হবে ভিত্।

উচ্চবিত্ত সমাজ? অর্থ সমৃদ্ধি আর ভোগের প্লাবন সেখানে আর গিলে করা পাঞ্জাবী, চুনোট ধুতি, আতরের গন্ধে বাইরের জগতের বিষয় নয়, অন্দর মহলের ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুনের তাপে আর সেলারের তরল-শীতল অমৃতে স্থান পেয়ে গেছে। ভোগের স্বর্গদ্বার যে নারী সে এখন বাইরেই অন্বেষণের বিষয় নয়, গৃহাভ্যন্তরের একান্ত নির্জনতাতেও প্রাপ্তব্য বলে স্বীকৃত। গৃহ, ক্লাব, বাগানবাড়ি—সবই এখন সাময়িক, 'ট্রানসিটরি', পাসপোর্ট ভিসা-ব্যবস্থায় ভোগোজ্জ্বল! নির্বাসিত যে নারী গিন্নীরূপে অতীতের দৃশ্যপটে বিষাদের মূর্তি, বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ, সেই নারী এখন নর্মসহচরী। বিষাদের যে সিন্ধু অতলান্ত, অঢেল জমে উঠেছিল দীর্ঘ দিনের উপেক্ষায়, নির্বাসনে আর নির্জনে, সেই সাগর মথিত হয়ে যখন বাইরের আকাশের ছোঁয়া পেল, বাতাসের স্পর্শ পেল, তখন অমৃত যত উত্থিত হল আনন্দের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে, গরল তার চাইতে কিছু কম জমা হল না নারীকে নীলকণ্ঠ করে তুলতে। সেই রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ-সিন্ধু যখন প্লাবনের মহাতেজে সমাজের উচ্চস্তরে ছড়িয়ে পড়ল, অবশ্যই পুরুষের প্রয়োজনে, ভোগস্পৃহাকে অধিকতর তৃপ্তিদানের কারণে, তখন হলাহল কি দূরে থাকতে পারে। পরিবারে পরিবারে 'টেন্শন্', ফাটল, ধ্বস, ভাঙাগড়া অনিবার্য হয়ে উঠবে না? তৃতীয় প্রজন্ম এই টেনশন, এই প্রতিযোগিতা, এই দ্বন্দ্ব নিয়েই আবির্ভূত হল।

তৃতীয় ধাপে এসে তারার মা নিঃশেষে হারিয়ে গেছে ছায়া, মায়া, তপতী, শান্তিদের মধ্যে। অপরের গৃহ এঁদের আকর্ষণ করে না আর। এঁরা অফিসে দপ্তরে, কলে-কারখানায়, দোকানে কাউন্টারে কাজ খুঁজে নেন, সারাদিন এবাড়ি

ওবাড়ি ঘ্রে ঘ্রে গলদঘর্ম উঞ্ছবৃত্তিতে এঁদের মন বসে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পিঠ-চুলের এঁরা যত্ন নিতে চান, পুরুষের দম্ভ প্রকাশের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত দেখতে চান না। সম মান, সমান স্বাধীনতা, অভিন্ন অধিকার বোধ এঁদের কণ্ঠকে 'নীল'-মুক্ত করবে বলেই এঁরা দৃপ্ত হতে চান, গতিশীল জীবন অন্বেষণ করেন, অর্থের সঙ্গতি খুঁজে বেড়ান। শিক্ষার চত্বরে এঁদের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু চেতনার জগতে এঁদের বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এঁরা জানেন অনেক শোনেন প্রচুর, বলেন তার চাইতেও বেশি। 'ট্রানজিস্টার' আর টি, ভি, এঁদের শিক্ষার মাধ্যম, ট্রাম-বাস-ট্রেন এঁদের অবহিতির দিঙমণ্ডল, মালিকের নির্দয় নিয়ম কানুন, পেষণ শোষণ এঁদের মনের ধনুকে ছিলা টান্‌টান্ করে দেয়, দল সমিতি ট্রেডইউনিয়ন এঁদের মধ্যেকার প্রতিরোধকে, সংঘর্ষ চেতনাকে আর পুঞ্জীভূত 'নীল'-কে প্রকাশের শক্তি দেয়। এঁদের শব্দ ভাণ্ডার সীমিত; সেই অভাব এঁরা শব্দ ঝংকারে পুষিয়ে নিতে চান। ভলিউম দিয়ে ভোকাবিউলারি-র অভাব মিটিয়ে দিতে তৎপর। এঁদের এতোটুকু আঘাত দিলে শতখান হয়ে প্রত্যাঘাত হানেন—সঞ্চিত অবমাননা, অবরুদ্ধ হীনমন্যতা আর আর্থ-পোশাক ব্যক্তি-মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এই প্রতি-আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে। সঞ্চয় এঁদের কম বলে হারানোর ভয়ও কম, চিত্তের সম্পন্নতা এঁদের অধিগত নয় বলে বিত্তের সম্পন্নতার প্রতি এঁরা অত্যন্ত বিরূপ। পূর্ব-পূর্ব প্রজন্মের মতো এঁরা আর তাই গৃহকাজে সহজলভ্য নন। প্রসাধনে পরিপাটি হয়ে এঁরা হাতে-বটুয়ায় 'টিপিন' নিয়ে 'অপিস' যান। পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এঁরা অপরিচিত এলাকায় কাজের সন্ধান করেন, কাজ করেন। যে কোনও কাজই তখন করার মতো যা টাকার যোগানটি স্থির রাখে। সংঘ, সমিতি, দলের সদস্যা হয়ে কাজের মধ্যে—যে কোনও কাজই হোক—তখন স্বাধীনতা ভোগ করার মতো অর্থ থাকে হাতে, অপরিচিত পরিমণ্ডলে কাজের বংশ-গোত্র-জাত ধরা পড়ে না বলে হীনতা-বোধ থেকে মুক্তি মেলে, সিনেমা-উপন্যাসের চরিত্রদের মতো প্রেম-ভালবাসার ফুল সহজে ফোটে, প্রকাশ পায়, পাত্র পায়।

অনুরূপ আলোড়ন ঘটে যায় মধ্যবিত্ত সমাজেও। সুজাতা, শ্রীপর্ণা মালবিকারা এখন তনুশ্রী, মধুমতী, বিদিশা, আত্রেয়ী হয়ে সর্বত্রই স্বাধীনতার কেতন আর শিক্ষার পতাকা হাতে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্রোত কলেজস্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার ছাড়িয়ে বি, টি, রোড ধরে প্রবাহিত; হাওড়ার পুল অতিক্রম করে শতধা ধাবিত। কেন্দ্র থেকে প্রবাহের ঢেউ শত তরঙ্গ ভঙ্গে মধ্যবিত্ত চিত্তটিকে

আপ্লুত করে ফেলল। যাদবপুর, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী। সহস্র সহশিক্ষা কলেজের নার্ভতন্ত্র এই প্রবাহকে সবল আর সাবলীল রাখল। শত-শত বিদ্যালয়ের অঙ্গনে সেচনের ব্যবস্থা রয়ে গেল। শিক্ষা অন্তপ্রাণ মধ্যবিত্ত সমাজ এই নবতম প্রজন্মকে ক্রমশই সার্টিফিকেট অন্তপ্রাণ হয়ে বেড়ে উঠতে দেখল। বিদ্যালয় সমূহ যতটা বিদ্যার ভারবাহী করে তুলল ততটা দ্যুতিমান করল না, বিশ্ববিদ্যালয় যতখানি বিশ্বচেতনা জাগ্রত করল ততটা আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারল না। বিদ্যা ও শিক্ষা আসবাবপত্রাদির মতো decorative হয়ে দেখা দিল, অলংকারের মতো, উজ্জ্বল প্রকাশের সামাজিক ঘোষণার পতাকা হয়ে বাজার দরের ওঠানামার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তনয়-রা গলায় টাই-এর মতো হাতে শিক্ষা প্রত্যয়নের কেতন নিয়ে প্রতিযোগিতায় গলদঘর্ম হতে লাগল। তনয়ারা সিন্থেটিক শাড়ির আঁচলের মতো শিক্ষা প্রত্যয়ন পত্রকে সমাজ-চাকরি-বিবাহের বাজারে পতাকার মতো উড্ডীন রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। গৌরী-পার্বতী পর্যায় পার হয়ে এখন উমা-রা আর শিব না খুঁজে, মহাদেবের ধ্যান না করে, ধূর্জটি আর মহেশ্বরদের খুঁজে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্পে আর সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ—এই বোধ এই তৃতীয় প্রজন্মকে তাড়িত করতে লাগল। এই ভূমা অবশ্যই বেদ-উপনিষদের ভূমা নয়, এই ভূমা ভোগের ভূমা বিষয়-আশয়ের ভূমা, ইন্দ্রিয়সেবা আর বিলাস-ব্যসনের ভূমা।

শিক্ষার প্রবাহ পূর্বমুখীতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে প্রায় সম্পূর্ণতই পশ্চিমমুখী হয়ে যাবার ফলে উন্মুক্ত শত শত দ্বার পথে সেই পশ্চিমে প্রবেশের পথটি নানাভাবে এঁদের সামনে খুলে গেল। এবং সেই দ্বার পথে বেরিয়ে আসা, ধেয়ে আসা, আধুনিকতার সহস্র ধারা দ্রুতগতি ছেয়ে ফেলল শহর-উপশহর গ্রাম-গঞ্জের মানস-প্রান্তর, সমাজ-ক্ষেত্র আর জীবন চেতনার চিত্তভূমিটুকু। মধ্যবিত্ত মনটি সমগ্র সমাজের শোষক-ক্ষেত্র, ব্লটিং পেপার, আত্মীকরণে সে অগ্রনী, উন্মুখ এবং উদ্বেলিত। তাই তনুশ্রী মধুমন্তী বিদিশা আত্রেয়ীরা যখন নিজ নিজ হৃদয়টি পশ্চিমের ঘাটে বাঁধা রেখে 'উমা-রূপে' 'যদিদং হৃদয়ং মম' মন্ত্র উচ্চারণ করে তখন শূন্য অন্তর ঘটখানি নব-জীবনের গৃহ-অভ্যন্তরে যোগ্য প্রতিষ্ঠার অভাবে টনটন করে ওঠে! অচিরেই একদিকে মহিষাসুর-মর্দিনী রূপে দশভূজা, দশপ্রহরণধারিণী, উমা transplantation-এর শততন্ত্রী-ছিন্নতাজনিত যন্ত্রণায় পরাধীনতারূপ অসুর নিধনে তৎপর হয়ে ওঠেন অন্যদিকে ধূর্জটির পুরুষ-প্রধান জটাজালে পৌরুষের

আস্ফালন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট চমক; হস্তপদে ভৈরব নৃত্য এবং তৎসহ নন্দী-ভৃঙ্গীদের তালবাদ্য গৃহে গৃহে ভূমিকম্পের আলোড়ন সৃষ্টি করে। অগ্ন্যুগার, লাভাস্রোত। এবং ডিভোর্স-চেতনা ঊর্মিমালার মৃদু মৃদু অনুভব থেকে ক্রমশই ঢেউ ঢেউ তরঙ্গভঙ্গে কুল-ধ্বংসকারী ধ্বসে পরিণত হয়। অনেকের জীবনে স্বাধীনতার স্পৃহা দাউ দাউ চিতা হয়ে গৃহাভ্যন্তরেই জ্বলে ওঠে, অনেকের 'নীল'-কণ্ঠ জীবনান্ত ঘটে। কেউ শূন্য-ঘটটি কাঁখে করে ফিরে আসে কখনও নিঃসীম অসহায়তায়, কখনও পুনর্বাসনের একান্ত কামনায়। কেউ বাঁচে, কেউ বাঁচে না। কেউ হারায় কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কুল ও কিনারার খোঁজে মনের হাত পা ছোঁড়া চলতেই থাকে মন-মগ্ন দাম্পত্য জীবন খুঁজতে গিয়ে আধুনিকতা জলমগ্ন বিচ্ছিন্ন-জীবনে পেঁৗছে যাচ্ছে।

নিম্নবিত্ত জীবনের পুরুষ দম্ভ এবং অধিকার প্রকাশের মাধ্যমগুলিকে যথেচ্ছ প্রয়োগের মত করে পাচ্ছে না বলেই রোষানলে দাউ দাউ জ্বলছে, নারীরা স্বাধীনতা চেতনায় হস্তপদ এবং দন্তকণ্ঠ প্রয়োগের হিংস্র পথে দপ্ দপ্ জ্বলে উঠছে। তাই কাক-শালিক গৃহ-বৃক্ষ-চালা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য। মধ্যবিত্ত জীবনের পুরুষ দীর্ঘ অভ্যস্ত বাবরি চুলে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, নারীরা ছেটেকেটে প্রগতির বাষ্পে ফোলানো ফাঁপানো আধুনিক কেশে ছন্দ-লয় তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এদিকের মাতা পিতা আর ওদিকের শ্বশুর শাশুড়ীরা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে রেফারী করে ষণ্ড-সংগ্রামে অজা-যুদ্ধে আর মুরগী লড়াইয়ে মত্ত, উমাদের নিয়ে শাশুড়ী গালে হাত দিয়ে 'ওঃ মা!' বলে বসে পড়ছেন; গৃহ-প্রত্যাগমনের পর গর্ভধারিনী জননী 'উঃ মাগো!' বলে আঁচলে চোখ মুছছেন। অন্যদিকে পুরুষ প্রতিনিধি পিতা-ভ্রাতা এবং শ্বশুর-ভাসুর উকিল-মোক্তার পুলিশ-পেশকার করে করে পকেটের রসদ আর মনের শান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে চলেছেন।

প্রতিবাদের কুঞ্চিত ভ্রূ এখন আর অদৃশ্য নেই। তাই বলে রাখতে চাই যে, চিত্রটি যতটা বর্তমানের তার চাইতে বেশিটাই ভবিষ্যতের। মধ্যবিত্তরা যা চায় তা সব সময়ে ঘটিয়ে তুলতে পারে না বলে পরিসংখ্যান সংখ্যা খুঁজে পায় না; ঘটনা খুঁজে পায় না। মনোভাবের যদি পরিসংখ্যান সম্ভব হত তাহলে কুঞ্চিত-ভ্রূর অনেকগুলিই আর কুঞ্চন ঘটাতো না। মধ্যবিত্ত মনের হাত-পা বাঁধা। শতেক বন্ধন—অর্থের বন্ধন, পাছে-লোকে-কিছু-বলে-র বন্ধন, বিবাহ কালীন লেনদেনের বেদনাদায়ক বন্ধন এবং প্রত্যাবর্তিতার উত্তর-মানস-চরিত্র

সমঝোতার-adjustment-এর—সমস্যা-বন্ধন, ইত্যাদি। যা ঘটছে তার চিত্র নয়, যা ঘটতে চলেছে তার কল্প উদ্ঘাটন মাত্র। পশ্চিমকে পূর্বের হাঁড়িতে সিদ্ধ করে না নিলে আমরা পূর্বকেও হারাব, পশ্চিমকেও কাছে পাবনা। পূর্বের জমিতে সংস্কারের শিকড় আর পশ্চিমের আকাশে ভোগের বাতাস—অক্সিজেন—এই দ্বিত্ব আমাদের জীবনে দৈত্যের সংসার পেতে আছে। বাস্তবে আইসবার্গের একদশমাংশ, গভীরে অবশিষ্টটুকু অপেক্ষারত।

তৃতীয় পুরুষে এসে উচ্চবিত্ত সমাজের মেমসাহেবরা লিসি, সিমি, নিনি রিনিদের কেটে-ছেটে ট্রিম্-স্লিম্ করে 'হর্টিকালচারের' প্রদর্শনী-যোগ্য নমুনা করে তৈরি করলেন। গিন্নীমার অতীত থেকে সংস্কারের সকল শিকড় ছিন্ন করে ধাপে ধাপে, আর্থসামাজিক সমৃদ্ধির তাপে, মেমসাহেব জীবনেই এঁরা পূর্বকে 'গঙ্গাজলি' করলেন আর পশ্চিমকে আঁচলে—আঁচলে নয়, আঁচল কোথা?—গাউনে-নাইটিতে প্রবাহ দিলেন। পশ্চিমকে এই আধুনিকারা শুধু পশ্চিমেই নয় পূর্বের গৃহাভ্যন্তরেও—'গৃহ' কোথায়?—বাংলোয়, হাভেলিতে, কুটিরে সংস্থাপিত করে নিলেন। ভোগের স্রোতে, অশন-ব্যসনের প্রবাহে আনন্দ উত্তেজনার তরঙ্গ-শীর্ষে ভেসে ভেসে অতীত-বিস্মৃত বর্তমান-সর্বস্ব এঁরা স্বাধীনতাকে অঞ্জলি ভরে—অঞ্জলি নয়, কাট্ গ্লাস্ ভরে—পান করতে চাইলেন। এঁদের জীবন থেকে ছাতনাতলা চিরবিদায় নিল, উষালগ্নে হরিদ্রা-লেপন শুভারম্ভের অনুষ্ঠান বলে আর স্বীকৃতি পেল না; সানাই-এর সুরে নয়, বহ্বাড়ম্বর সঙ্গীত-সন্ধ্যার দ্বৈত-ছন্দ পদ-ক্ষেপণে হস্ত-স্কন্ধ-ধৃত গুন্ গুন্ কণ্ঠ আর আবেশ-জড়িত দৃষ্টি-মিলনে এঁরা matrimonial alliance-এর পথে পা বাড়ান। এই পথ সপ্তপদী পার হয়ে সহস্রপদী জীবন যাত্রা সূচীত করে কিনা তা আমরা, মানুষেরা কোন্ ছার্, দেবতাদেরও অজানা! তবে মিলন-বিচ্ছেদ নিয়ে হাহাকার নেই, পশ্চিমী মন্ত্রের গুনে পুনরায় অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আছে। এঁরা কেউই অভাগা নয় ভিক্ষাও এদের কাম্য নয়। এঁদের কানে ভোগের মন্ত্র পুনঃ পুনঃ অনুরণিত হয়। তাই এঁরা জীবনের সন্ধানে জলচর মীনের মতো সচল স্বচ্ছন্দ, গতিশীল। Alliance থেকে এক-পা বাড়ালেই Living together. জীবন যে মাত্র একটাই। 'ইপিকিউরিয়ান' ভোগবাদ আর চার্বাক সুখবাদ তাই জীবনের মোক্ষ।

মুক্তি তত্ত্বের মূর্ত প্রতীক এই সব পরিশীলিত-অঙ্গ, অনুশীলিত-কণ্ঠ, চর্চিত-কেশ, স্বল্প-বেশ অত্যাধুনিকারা পুরুষকেও মুক্তি দিয়েছেন, নিজেদের

মুক্তিও খুঁজে নিয়েছেন। মুক্ত পুরুষ, মুক্ত নারী। সহাবস্থান। রান্নাঘরহীন গৃহ তাই ড্রাগের ড্রাগনদ্বারা আক্রান্ত, নেশার নিশাচরদ্বারা অধ্যুষিত বেডরুমের কেবলম্ জীবন-দর্শনের স্পর্শে বীচিবিক্ষুব্ধ ফেনিনিভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শারীর ও পেশীজ শক্তির দাপটে কতিপয় সর্দারভোগ্যা পৃথিবী এখন, বলয়-গমন-পরিক্রমান্তে, আর্থ শক্তির আধুনিক দর্পে, কিছুসংখ্যক উচ্চবিত্ত-ভোগ্যা ধরনী মাত্র। এই বর্তমান-সর্বস্ব বর্তমানের জীবনদর্শন প্রশাসনের কম্পজ্বরের কারণ, বিচার বিভাগের দুশ্চিন্তার আর সমাজ বিজ্ঞানী-মনোসমীক্ষকের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

একটু অন্য ভাবে দেখা যাক। স্বল্পবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবন ঊর্দ্ধমুখ তাকিয়ে আছে মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে। মধ্যবিত্ত মন চাতকের মতো তাকিয়ে আছে উচ্চবিত্ত জীবনের দিকে। আর উচ্চবিত্ত সম্পন্নতা উত্তর পুরুষকে উচ্চবিত্তের গ্রানাইট ভিতে সংস্থাপনের মানসে অধীর। কেন এই বিত্ত-দৃষ্টি? ভোগের জন্যেই তো? দেখতে হবে ভোগের এই হাতছানিটিই আমাদের দৃষ্টির 'ছানি'-র কারণ কিনা।

ভোগ বলতে দেহের ভোগ, মনের ভোগ। অন্তর বা চিত্ত ভোগ করে না, সে উপভোগ করে। দেহের ভোগস্পৃহাটির উৎস যৌন বাসনায়, পাকস্থলীর ক্ষুধা তৃপ্তির কামনায়, শরীরের আরাম-আয়েশের প্রয়োজনে, সুরক্ষা-প্রতিরক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। তাই যখন রোটি-কাপড়া-মকান-এর কথা বলা হয় তখন সম্ভবত লজ্জাবশতই প্রাগৈতিহাসিক জান্তব প্রয়োজনটির কথা অনুল্লিখিত, অনুল্লেখিত থেকে যায়—যৌন প্রয়োজনের কথাটি। অথবা 'মকানের' মধ্যে সেটি বিধৃত? প্রাণিজগতের সকলক্ষেত্রেই, সবিশেষ মানুষের পুরুষানুক্রমিক উদ্বর্তনে যে ক্রিয়াটি, যে প্রকৃতিদত্ত-প্রকৃতিগত-প্রকৃতিস্বীকৃত পথটি সৃষ্টিকে সক্রিয় সচল রেখেছে সেই Procreation-ই তো প্রজন্মযাত্রার গতি ও শক্তির উৎস। দেহ-মনের ভোগের তাড়নায় কে বড় কে ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর। অবান্তর, কারণ উভয় ভোগই একে অপরের মুখাপেক্ষী। এই ভোগ স্পৃহা যে বিত্ত বিভেদের তোয়াক্কা করে না তার সাক্ষি দেবে ইতিহাস। গণিকালয়, পতিতালয়, বেশ্যালয় হয়ে বরাঙ্গনারা কখনও রক্ষিতা, কখনও উপপত্নী, কখনও call-girl কখনও message-কারিনী, নর্মসঙ্গিনী। এই যৌন ভোগ স্পৃহা অভাবের সংসারে যেমন আগ্নেয় আঘাত হানে, স্বচ্ছল-উদ্বৃত্ত জীবনেও তেমনি ফেনিলে প্লাবন ঘটায়! এই একটি ভোগ স্পৃহা তাই অভাবের শূন্য গর্ভে অথবা প্রাচুর্যের আধিক্য চূড়ায় গজায়-না,

স্বভাবের গভীরে পাতা ছাড়ে। একে তাই স্বকৃতি না বলে বিকৃতি বলাই শ্রেয় ঃ perversion, অথবা, অপ্রাকৃত প্রকৃতি।

এই আদিম ভোগ বাসনাটি একাধারে আদিম এবং অত্যাধুনিক। বিস্তারিত চিত্রকল্প না এঁকেও শুধু এটুকু বললেই চলবে যে যা ছিল গ্রামের উপান্তে খোলার ঘরের একাকিত্বে সর্বজনবিদিত সামাজিক fuse, খড়ের চালার প্রায়ান্ধকার নির্জনতায় অথবা, আরও পরে, গলির বা পল্লীর নিশ্চিত পাংশু-পাণ্ডুর জীবন যাপনের একান্ত নির্বাসনে তাই এখন আলো ঝলমল হোটেলে, স্বল্পালোকিত 'বারে-পার্লারে' অথবা 'মেন্টাল এন্ড স্পিরিচুয়াল রিভাইভাল' কেন্দ্রে সর্বজন সমক্ষে স্থান পেয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক যখন কোনও বিকৃতির শিকার তখন তা অসুস্থতা, রোগ। সমাজের চোখে, চিকিৎসকের চোখে এবং রোগীদের নিজের নিজের চোখেও। পুলিশ-চিকিৎসকরা তখন রোগ এবং রোগীকে আক্রমণ করেন, বিচার-চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন শাস্তি-সংশোধনের বিধি হাঁকেন—রায় দেন ; আর সমাজ মানসের পুরোহিতরা শান্তি-স্বস্ত্যয়নে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু আধুনিকতার বিত্ত-প্রাধান্য যখন সেই আদিম ভোগ স্পৃহাকে সামান্যীকরণ করে অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে মাঠে-ময়দানে হোটেলে-পার্লারে যানে-বাহনে অফিসে-ক্লাবে ছড়িয়ে দেয়? সর্পাঘাত শিরে ঘটলে 'তাগা' বাঁধা হবে কোথায়? সব শির 'ভূ'-লুণ্ঠিত হলে 'তাগাটি' বাঁধবেই বা কে?

না, এখানে 'সকল' মানে সংখ্যাগত সকল নয় গণতন্ত্রগত সকল—অধিকাংশ, আর আধুনিক পরিভাষায় অধিকাংশকেই 'সকল' বলার কথা, যদিও অধিকাংশ সময়েই স্বল্প সংখ্যক দাপটে-ভারিরাই সকল হয়ে প্রকাশ পান। এমন কি এক এক সময়ে এক-জনই সকল জনগণ বা অধিকাংশ জনগণ হয়ে সুউচ্চ stage-এ, ভরভরাট press-conference-এ বিদ্যমান, দ্যুতিমান দেখা দেন।

নিম্নবিত্ত-স্বল্পবিত্ত জীবনে পাকস্থলীর শূন্যতা মস্তিষ্কের কোষে কি কি বিক্রিয়া ঘটাতে পারে তার হদিস না জানলেও এটুকু বলা যায় যে 'বিকৃতি' ঘটানো অসম্ভব নয়। সকলের খাদ্যের সংস্থান সম্ভব নয় বলে সেখানে একজন সবটুকু খরচা করে নিজের পাকস্থলীতে খাদ্যের বদলে হাঁড়িয়া বা মদের যোগান দিতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত নিম্নবিত্ত-বিত্তহীনরা 'বিকৃত' আচরণ করলে তার কারণ খুঁজতে বিশেষ প্রজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রয়োজন পড়ে যখন যাদের আছে তারাও যখন বিকৃত ভোগ প্রবণতার টানে 'বিভিন্ন হাঁড়িয়া'র সন্ধানে অন্ধ বেগে ছুটে চলে। ভোগ দৃষ্টি

বিত্ত-বিভ্রমের কারণ। আবার বিত্ত-বিভ্রমও ভোগ দৃষ্টির কারণ।

কেন, তাই বলি। একই সময়ে একজোড়ার বেশি জুতো পায়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। তবু কেন সহস্র জোড়া জুতোর সংস্থান কারো কারো ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়? যার সম্পদের আর অর্থের হিসেব কাগজে আঁটে না সে কেন কোটি কোটি টাকার লোভে দিশেহারা হয়ে ওঠে? একুশ বছরের অর্বুদ-পতি কেন বিদেশে বিপন্ন আত্মহত্যা করে? ক'টি শয়ন কক্ষ, ক'টি পোশাক, কতটুকু খাদ্য একটি ব্যক্তির নিত্যকার প্রয়োজন? তাহলে কেন এই পর্বত-প্রমাণ অর্থ লালসা, বিত্ত-চাঞ্চল্য, ভোগ-প্রাবল্য?—বিকৃতি নয়?

মদ খেতে খেতে একদিন মদই মাতালকে খেতে থাকে। অর্থের বা বিত্তের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাই অর্থ বা বিত্তই ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলে। ভোগের তাড়নায় ভোক্তা কখন যেন নিজেই ভোগ্য হয়ে ভোগের উদরে অদৃশ্য হারিয়ে যায়। বার্নার্ড শ' বলেছিলেন: বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রই দরিদ্র ব্যক্তি, যার অনেক ট্যাকা আছে। অথবা; আদর্শহীন বিত্তবান ব্যক্তি চরিত্রহীন নারীর চাইতেও বেশি ভয়ংকর।

ভয়ংকর যে তার চিহ্ন দেশের সুদীর্ঘ অতীতে শত শত' ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে ভোগের নষ্ট-চরিত্র-স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে। রাজা-মহারাজা-জমিদারদের ভোগ দৃপ্ত প্রাসাদ-অট্টালিকার জয়স্তম্ভগুলো লতাগুল্ম-বনস্পতির আক্রমণে পরিত্যক্ত পতিত হয়ে সাপ-খোপ-জংলী জীবনের আবাসস্থল হয়ে ভবিষ্যের বাণী বহন করে চলেছে। ক'জন সেই বাণী শুনতে পাই? শত সহস্র জীর্ণ-শীর্ণ মৃতপ্রায় প্রজাসাধারণের—নিম্নবিত্তের—খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের বঞ্চনায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা সেই সব ভোগের সৌধগুলো ক'টি উত্তর-প্রজন্মকে লালন করতে সক্ষম হয়েছিল? এই সব অর্থবান দরিদ্ররা কি তাঁদের উত্তর-পুরুষকে অধিকতর দরিদ্র করে যান নি? আবার বলা দরকার যে ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

মধ্যবিত্তরা? জীবন সংগ্রামে ঘর্মাক্ত হয়ে সন্তান সন্ততিদের জন্যে যে সমৃদ্ধ বাসস্থান, উন্নত জীবন আর পুষ্ট অর্থসম্ভার রেখে যেতে বদ্ধপরিকর সেই প্রাপ্তি উত্তরপুরুষকে বিলাস প্রবণ ভোগ প্রবণ এবং অহংকারী করে তুলছে মাত্র। সব সহজলভ্যই জীবনে সহজগতি দেয় না। দেয় না তার কারণ বোধ হয় এই যে দমন, দান ও দয়া দেহমনের ভোগ লালসা থেকে জন্মায় না, চিত্তের প্রসন্নতা থেকে উদ্ভাসিত হয়। ভোগের বা অত্যন্তের দমন, অধিগত-অর্জিতের অধিকটুকু সৎকাজে দান এবং দুঃখি জনে দয়া—এসব মানসিক গুণ অনুশীলন সাপেক্ষ।

এই ত্রিবিধ গুণের অনুশীলন সম্ভব শান্ত-জীবনের উৎস-থেকে বিচ্ছিন্ন-বিবিক্ত আমরা প্লাস্টিক আর ইলেকট্রনিক, কমপিউটার আর সুপার কম্পিউটারের ভোগ স্রোতে দিশেহারা। কূল থেকে উৎপাটিত আধুনিকতার কিনারাহীন বর্তমানে আমরা ভেসে চলেছি পশ্চিমের ভোগ্যপণ্যের ভোক্তা হিসেবে, লেনদেনের সুতোর টানে।

কতদূর যেতে হবে কারো জানা নেই। না আমাদের না ওদের। যেতে হবে এবং যাচ্ছি। এটুকুই বর্তমান, সত্য, অনিবার্য। অনিবার্য কি? ফিরে তাকানোর অবসর-অবকাশ কি কোনও দিনই আসবে না? সকলের চোখেই ভোগের কাল পট্টি আঁটা বলে কি কেউই সেই কৃষ্ণবর্ণ পট্টিটি দেখতে পাচ্ছি না? কে জানে?

॥ চশমা আর ভাজা কুলো ॥

কতো রকমের চশমা দিয়েই তো জীবনকে দেখলাম। সকলেই দেখেন। তারপরে একসময় চশমাগুলো নিজেরাই 'ছানির' পদশব্দে ভারি হতে হতে বোতলের তলা, অথবা চ্যাপ্টা পেপারওয়েট হয়ে সব কিছুকেই আবছা করে দেয়। চোখ বন্ধ হবার আগেই দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়!

প্রকৃতি আমাদের প্রত্যেককেই একজোড়া করে তার নিজের কারখানায় তৈরি 'চশমা' জন্মসূত্রেই দিয়ে থাকেন। (যাদের দেন না তাদের একটা স্বতন্ত্র 'দৃষ্টি' ক্ষমতা সঙ্গে পাঠান, আজীবন কষ্টের মধ্যেও তাদের ঐ অতটুকু সান্ত্বনা নিয়েই বাঁচতে হয়!) আমরা সকলেই সেই একই চোখজোড়া নিয়ে বড় হয়ে উঠি; কিন্তু আমাদের দৃষ্টি, আমাদের দেখার জগৎ কতই না বিভিন্ন হয়, হয়ে উঠতে থাকে। আমরা বলি স্থান-কাল-পাত্র। এই ত্রয়ীর মধ্যে কে প্রধান কে অপ্রধান সে বিতর্ক অনাবশ্যক। সুযোগ পেলে এদের প্রত্যেকেই সবিশেষ বলবান হয়ে উঠতে পারেন, হয়ে ওঠেনও! পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে দেখে তাই আমাদের বিভিন্ন সময়ে এঁদের এক এক জনকে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়। আসলে এঁদের মধ্যে কাল বা সময় গতির প্রতিভূ; 'ভেক্টর'। তাই সব কিছুকেই ওলট-পালট করে দেবার ক্ষমতা সময়ের আছে। কলকাতাকে সময় দিয়ে গুণ করলে কি হয় তা তো পায়ে-পায়ে, হাড়ে-হাড়ে আর হাতলে-ঝুলে সদা সর্বদাই টের পাচ্ছেন। একই ভাবে ট্রেনের কামরা, বাজারের হাতা, শহরের ফুটপাথ—সবই সময়ের আক্রমণে কেমন নাভিশ্বাস অবস্থায় পৌঁছোয় তা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার বিষয় নেই! পাত্র? আমাদের শৈশবটি সময়ের মার খেতে খেতে অথবা সময়ের উসকানিতে উত্তেজিত হয়ে হয়ে কোথায় কি ভাবে জীবন কাটিয়েছে সে তো আমরা সকলেই জানি বা জানছি! আমাদের মতো অনেককেই সময় তার বেলচায় করে আটান্ন-ষাটের ওপারে 'আনলোড্' করে দিয়ে গেল, দিয়ে যাচ্ছে। হিসেবের এতোটুকু হের ফের নেই. নির্দয় প্রহরীর মতো ঘড়ি ধরে, ক্যালেণ্ডার মিলিয়ে, গন্তব্য-রেখার ওপারে ঠেলে ফেলে দেয়, দেবেই। সময়ের নিজের অন্দরমহলে দু'নম্বরি নেই; দু'নম্বরি কারবার যা কিছু তা আমরাই, মা-বাবা-অভিভাবকরাই, যথাসময়ে ঘটিয়ে থাকি; সময় অন্ধের

মতো 'ব্যুরোক্রাট্' নির্দয়ের মতো বড়বাবু, আর পাথরের মতো সহানুভূতিহীন করণিক। আপনি ষাটেও তাজা টগ্‌বগে ঘোড়া? সময়ের তুলাদণ্ডে তার কোনও মূল্য নেই; আপনি পঞ্চাশ থেকে ধুঁকছেন? সারাদিন দপ্তরের চেয়ারে বসে হাঁপানির টান সামলাচ্ছেন? আপনার কম্প্র-হস্ত লেখনী কাগজের বুকে ছবি আঁকে, লেখে না?—এ-সব প্রশ্ন ডাক্তারের কাছে অর্থবহ, সংসারের কাছে যন্ত্রণাদায়ক, অধস্তনের কাছে অকারণ বিরক্তিকর (উন্নতির জন্যে ভেকেন্সি রোধকারী)—সবই ঠিক। কিন্তু সময়ের চোখে-পট্টিআঁটা বিচারে তাৎপর্যহীন! আপনি আটান্ন? ঘ্যাচাং। অথবা আপনার ধাট তো সেখানেই আপনার হাড়িকাঠ। গন্তব্যে এসে গেছেন নেমে পড়ুন, সিট্ ছাড়ুন, সরে পড়ুন। ব্যাস্। ইতি অফিস উবাচ!

আপনি 'ছাতা-ছড়ি' হাতে নিয়ে অথবা ফুলের তোড়া এবং ইত্যাদিতে ভূষিত অভিনন্দনান্ত হয়ে (অনেকটা অফিসের পূজান্তে দক্ষিণান্ত হবার মতো করে) চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরবেন। দশটা পাঁচটার জীবন শেষ করে যেন একটা জন্মই শেষ করে এলেন। আপনার দ্বিতীয় জন্ম হল; অফিসের নার্সিং হোমে। সদ্য ছাড়া পেয়ে স্বগৃহে এলেন বৃদ্ধ শিশুটি হয়ে। এ বারে শুরু হবে আপনার দ্বিতীয় বারের লালন-পালন।

এই দ্বিতীয় শৈশবে আপনার মা-বাবা হবেন আপনার পুত্র এবং পুত্র বধূ। নিজের তাঁরা কবেই গত হয়েছেন; নিজেরই এরা এখনও বর্তমান। এবং সময়ের কারসাজিতে বারে বারেই 'ফ্ল্যাস ব্যাক্' ঘটতে থাকবে। কখনও আপনার অতীত উঠে আসবে চোখের সামনে; কখনও বর্তমান হু হু করে ছুটে যেতে চাইবে অতীতের জীবনে। আপনাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে 'সনাতন' সত্যকে জানা-চেনা-বোঝার জন্যে। যদি প্রস্তুতি না থাকে তাহলে ভবিষ্যতের জন্যে 'থুকদানি' যেমন সংগ্রহ করবেন তেমনি সংগ্রহে রাখবেন 'অশ্রুদানি'! সভ্যতার দাবিদার বলেই ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকাটা আমাদের দায়!

'পেসিমিস্টিক্' শোনাচ্ছে, নেতিবাচক? একেবারেই না। শিশু বা রোগীকে দেখে ডাক্তার যখন অসুস্থতার বর্ণনা শোনেন বা বলেন তখন কি তা এই নেতিবাচক? দ্বিতীয় শৈশবে কোমরের ভাঙ্গা, বাতের পঙ্গুত্ব, দৃষ্টিতে ছানিপড়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট বা হৃদরোগের সম্ভাবনার বিবরণ কি নেতিবাচক হবে? জরা-মৃত্যুর কথা বললে সত্যের নির্জলা বর্ণনা করা হয় মাত্র। সিদ্ধান্ত? সেই কথায় পরে আসছি!

প্রথম শৈশবে আমরা সঙ্গে আনি এক ঝাঁক কান্না, অবসান ঘটাই দীর্ঘ পাথর-চাপা দুশ্চিন্তার। দ্বিতীয় শৈশবে বয়ে আনি এক রাশি অর্থ, উদ্বোধন করি একরাশ অবসরের পরিকল্পনাহীন অবকাশ। দীর্ঘ রুটিন থেকে আমূল উৎপাটিত হয়ে নিজের সর্বদেহ দিয়ে অম্ল-অজীর্ণ-হৃদরোগ আর বাতের বাসস্থান তৈরি করি। বিনিদ্র রজনীর প্রহর গুনি ক্লান্ত অবসন্নতায়। চাকরিতে প্রথম ঢুকে জীবন বীমার ব্যবস্থা করি, ব্যাঙ্কে জমা টাকার পৌনঃপুনিক হিসাবে তীক্ষ্ন নজর রাখি আর ব্যাঙ্কের ব্যালান্স এবং নিজের দেহভার একটু নাদুস্-নুদুস হলে পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রবিবারের সকালগুলো আঠার মত আটকে রাখি। দ্বিতীয় পাতায় খুঁজি, চারের পাতায় চোখ রাখি; তারপরে টোপর মাথায় সানাই-এর সুরে অনেক খরচা করে এবং ততোধিক 'সংগ্রহ' করে সংসার পেতে বসি। সেই সংসারের শেষ প্রান্তে পুত্র-কন্যা-বধূ-জামাতা এবং নাতি নাতনীর 'অরকেস্ট্রা'-শেষে যখন বিদায়ের ঘড়ি ঢং ঢং করে দু'তিন বছরের দূরত্বে বেশ পরিষ্কার বেজে ওঠে তখন পি. এফ-এর হিসেব কষি, গ্রাচুইটির অঙ্ক মুখস্থ করি আর ধাপে ধাপে সীমানার কাছে পৌঁছে যাই। শেষ চাকরি জীবনের ক'একটা বছর বেশ টানাটানির মধ্যে কাটিয়ে এগুতে হয়। সকলের প্রয়োজন, পুজোগণ্ডার দাবি, সামাজিকতা, দেওয়া থোওয়া এবং সর্বোপরি আয়করের হাত থেকে মুক্তির জন্যে থোকে থোকে, থরে থরে টাকা সরিয়ে ক্রমশই তো অনটনের পরিমাণ বাড়িয়েই চলতে হয়। চাকরি জীবনের শেষ সীমানা রেখাটি পার হলেই মুক্তি। বর্ষার জলধারার মতো টাকার খাল-বিল-নদী-নালা ঝুর ঝুর করে অবশিষ্ট জীবনের অঙ্কে এসে জমা হতে থাকবে। নিজের অঞ্জলি ভরে উঠবে, থৈ থৈ অর্থ-ধারায় মনের মধ্যে একটা কুল কুল ধ্বনি যেন বাঁশির সুরের মতো অনবরত বেজেই চলবে। শেষের শুকনো দিনগুলোর কথা মনে করে করে একটু দরাজদিল হতে কার না মন চাইবে? তাই এটা দাও ওটা দাও, এটা করা যাক ওটা করলে কেমন হয়, করে করে এবং বাজার ঘাটের রং ফিরিয়ে, থলের মুখে ইলিশের ল্যাজ দেখিয়ে, মৃদুহাসিটি নিজের মুখে ঝুলিয়ে, সংসারে ফিরতে কার না ভাল লাগে?

এর পাশাপাশি ঘর-বাড়ির চেহারা, বাসগৃহের সৌন্দর্য অথবা নোতুন ফ্ল্যাট কেনা; ছেলের জন্যে ব্যবস্থা, মেয়ের জন্যে চিন্তা ভাবনা, নাতি নাতনীর ভবিষ্যৎ। কতো চিন্তাই তো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। টাকার পরিমাণের সঙ্গে সমতা রেখে হৃদয়ের প্রসার বাড়বে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব স্পর্শযোগ্য অনুভবে এসে যাবে, স্ত্রী পান মুখে দিয়ে পরামর্শের জন্যে বারে বারে চা নিয়ে শোবার ঘরে বসার ঘরে অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াবেন, বসবেন। বর্ষাস্নাত চকচকে সবুজের বৃন্তে সদ্য ফোটা ফুলের মতো সূর্য-দৃষ্টি হয়ে আপনার দিকে তাকাবেন ; কতদিন দেখেন নি এই হাসি মাখা আরক্ত মুখের স্ফুটনোন্মুখ অভিভাষণ! মনের মধ্যে অতীত কথা কয়ে উঠবে, শব্দ গান গেয়ে উঠবে আর আপনি হারিয়ে যাবেন কোথায় কোন পাহাড়ের শীতল একাকিত্বে, গঙ্গার ধারের তরঙ্গ-ভঙ্গ নিঃশব্দ সূর্যোদয় শোভা দর্শনের কল্পজগতে!

এটাই অবসর জীবনের প্রথম পর্ব। এই প্রথম পর্বটি যেন আপনাকে একেবারেই অবশ করে না দেয় সেটি দেখবেন। প্রথম পর্বে মৌমাছিরাই শেষ পর্বে মাছির মতো আপনাকে কিন্তু এড়িয়ে যাবে। তখন আপনি বিছানায়। বিছানাই আপনার আহ্নিকগতি-বার্ষিকগতির একমাত্র গতি হবে তখন। সেই শেষ পর্বের জন্যে প্রস্তুত হওয়াটাও কিন্তু এই প্রথম পর্বের অবসরে করে রাখতে ভুলবেন না। মাঝে আছে একটা দ্বিতীয় পর্ব। সেটা মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট-যন্ত্রণার পর্ব জানবেন। প্রথম পর্বে মনটি হবে পাখির মতো উড়ন্ত, হালকা-পাখা চলনে আনন্দঘন ; দ্বিতীয় পর্বে রেশান দোকান, কেরোসিনের ডিবে, লনড্রির প্যাকেট, বাসস্টপেজে নাতি-নাতনীকে 'এসকর্ট' করার মতো অনেক কাজ থাকবে। কিন্তু তখন কোমরে ব্যথা, হাঁটুতে বাত, চোখে ঠাহরের অভাব আর শ্বাসপ্রশ্বাসে অধিকতর মুখের ব্যবহারের দিন এসে যাবে। যন্ত্রণাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে, কষ্টকে গেটের বাইরে জমা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হবে। অন্যথা অকারণ বক্র-ভ্রূ দৃশ্য আপনার মনকে আরও কাহিল করে দেবে, শরীরের আর বইবার ক্ষমতা নেই বলে ঘোষণা করবে।

তৃতীয় পর্বের সব থেকে যেটা ভাল দিক তা হল বোধ-শক্তির অভাব, বা একেবারেই লোপ পেয়ে যাওয়া। আপনার আর কষ্ট হবে না, যন্ত্রণা থাকবে না। বোধ না থাকলে কষ্ট হবে কার? শরীরের? তাতে আপনার কি? চেতনাকে ধরে রাখার অকারণ চেষ্টা না করে যদি একেবারেই 'গয়াগঙ্গাগদাধরহরি' বলে বিসর্জন দিতে পারেন তাহলে সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন। কিন্তু যদি চেতনা থাকে, অনুভূতির তন্ত্রীগুলো কিছুটাও টনটনে থাকে তাহলে আপনার কপালে সমূহ বিপত্তি আছে জানবেন। 'আর ওষুধ খেয়ে কি হবে মা'—না বলে তখন ওষুধ চেয়ে মনকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থাটি পাকা করে নিলেই উত্তম, সর্বমঙ্গল!

অবসর জীবনের এই ত্রিপর্ব বিন্যাসটি না-হয় মেনে নিলাম, কিন্তু এই পর্ব বিন্যাসের কারণ কি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান তো নিশ্চয়ই অপেক্ষিত ? আসুন, চেষ্টা করা যাক।

মনটা কার বশ ? টা কা র বশ। প্রশ্নের উচ্চারণেই উত্তরের ঝিলিক। শুধু মন কেন বিশ্বসংসারইতো শুনতে পাই টাকার বশ। অবসরজীবনের পূর্বে তখনও মাসান্ত মাইনে; পরিমাণ 'রাই' তুল্য। অবসর কালীন প্রাপ্যে সেই রাই জড়ো হয়ে 'বেল' হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত সংসারের অপসয়মান জন (!) এক সঙ্গে এতো টাকার মালিক হলে সেই টাকার সম্ভাব্য ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ওয়ারিশানদের মধ্যে একটা অনুক্ত দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে ওঠাই স্বাভাবিক। কেউ তো আর সন্ন্যাসী নয়! প্রত্যেকেই তখন আদরে আপ্যায়নে যথা সম্ভব হৃদয়ের কাছাকাছি, মধ্যস্থলে স্থান নিতেই চাইতে পারে। একটা প্রতিযোগিতার মতো চলতেই পারে! একজন যদি চা-এর সঙ্গে বিস্কুটের ব্যবস্থা করেন, অন্যজন তাহলে পরদিন সকালেই হালুয়ার সঙ্গে জলপানের যোগ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। জামা কাপড় চটি জুতো গামছা-তোয়ালে কতো দিকেই কতোজনের নজর তখন তীক্ষ্ম হয়ে সতর্ক থাকতে পারে। এটা করলে কেমন হয়, ওটায় কিরকম সুবিধা অসুবিধা—এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অবসর প্রাপ্ত পিতার-শ্বশুরের সঙ্গে আলোচনা অনিবার্য বোধ হতে পারে; সবিশেষ পিতার-শ্বশুরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণ অনুভব, এবং আরও যা যা অতীতে ছিল বলে মনে হয় নি, তা সব এখন এক দেহে সমাসন্ন বলে যদি পুত্র কন্যা পুত্রবধূরা মনে করে তাহলেও তো তাদের দোষ দেওয়া যায় না! আগে যেখানে পিতার ডাকে সাড়া দেবার সময় 'বাড়ন্ত' ছিল, তার মতামত যেখানে 'অ'-মূল্য ছিল, এখন ছেলে মেয়েরা পিতার খোঁজ খবর নিতে সকালে এবং বিকেলে সময় করে আনুষ্ঠানিক হাজিরা দিতে পারে, তার মতামতকে ওরা এখন প্রজ্ঞায় 'অমূল্য' বলে মনে করতেই পারে। চশমার আমূল পরিবর্তন আর কি! পিতাও তো চশমা খুলে চশমা পরেন; দৃষ্টি শক্তির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গিও পাল্টায়। এটাই প্রথম পর্ব; এবং মাছি এবং মৌমাছি স্বভাব আমাদের বৃত্তান্ত। যে চশমা আমাদের চোখে সেই স্বরূপ আমরা প্রকাশ করি। অলমিতিবিস্তারেণ।

দ্বিতীয় পর্বে আমাদের কোনও ডাল শুকিয়ে গেছে, পাতার অনেকগুলিই ধূলিধূসর হয়ে সবুজ হারিয়ে ফেলেছে। মোটা টাকার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ক্রমশ হাড় সর্বস্ব হয়ে উঠতে আর দেরি নেই। জলের সঙ্গে তুলনা করলে বলা

যার প্রথম প্রথম যা ছিল 'স্টোরেজ ট্যাঙ্ক' এখন তা ঘটি-মগে এঁটে যাবার মতো দশায় এসে গেছে। কারোজন্যে বসার ঘরের পরিবর্দ্ধন, কারো পড়ার জন্যে একপাশে 'এক্সটেনশন'; মেয়ের জন্যে একটু স্বতন্ত্র করে আবরু-সহ কক্ষ-বিন্যাস, স্ত্রীর বৃদ্ধবয়সের শান্তির জন্যে একটা গোছানো গাছানো ঠাকুর ঘর—এই সব করতে গিয়ে হিসেবের—এস্টিমেটের দ্বিগুণ-ত্রিগুণ খরচা হয়ে যায়, যাবেই; কাজে নেমে তো আর মাঝপথে থেমে যাওয়া যায় না। তাছাড়া ওদের জন্যেই তো সব, নিজের আর ক'দিনই বা? ভোগ করার আর আছেই বা কি? তাই একটু বদান্য হতে, একটু দিল দরাজ হতে সাধ যেতেও তো পারে! আর প্রশংসার সুড়সুড়ি, দিলে বা পেলে আমরা সহজেই তরল হয়ে যাই; যে পাত্রে রাখা যাবে সেই পাত্রের চেহারা নিতেই পারি—যে পাত্রটি এই সুড়সুড়ির নল-কল-বা-পালকটি ব্যবহার করবে সে তো সব কিছুই তার মতো করে দেখতে একজোড়া চশমার ব্যবস্থা করেই দেবে!

দ্বিতীয় পর্বে তাই আমরা প্রত্যেকেই 'ভাঙা কুলো'; অথবা চটের থলে; অথবা 'বেবী-সিটার'! ছেলে পুলে নিয়ে সংসার এখন বেশ বাড়বাড়ন্ত। পুত্র অফিস যায়; সকালে নাকে মুখে গুঁজে ছুটবে, বিকেলে ট্রাম-বাস-ট্রেনের ভিড় ঠেলে ঘর্মাক্ত দেহ ও ক্লান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরবে। তাছাড়া সেই সম্ভবত সংসারের মোট আয়ের সিংহভাগ ঘরে আনে এবং বয়স ও পৌরুষের জোরে সে প্রধানও বটে। তাই তার সময় কোথায় সংসারের নানাবিধ উটকো কাজে নিয়োগ করার মতো? পুত্রবধূ সকাল থেকে সংসারের ঘানি টেনে টেনে, ছেলেপুলেদের খিদমদ্ খেটে খেটে ছিলেটি টান টান করে থাকবে। মেয়ের পড়া আছে, পাড়া আছে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, চিঠি লেখা আছে চিঠি পড়া আছে এবং আরও কতো কিই তো আছে। পুত্রবধূটিও যদি অফিস যান তবেতো কথাই নেই! মেয়ে যদি চাকরি করে তাহলে তার জন্যে দেরি করা আছে, গেট খোলা আছে এবং তার বন্ধু বান্ধব এলে ফুটফরমাশ খাটা আছে। আর এই সবের উপরে আছেন স্বয়ং গৃহিনী। কোমরের ব্যথার ওষুধের জোগাড়, বাতের জন্যে ডাক্তারের নির্দেশ এবং বার বার 'একবার শুনবে?'-র কাছে ডাকা। সকলেই ব্যস্ত, সবাই কোনও না কোনও কাজে ডুবে আছে বা ডুবে থাকতে হবে ভেবে অস্থির। একমাত্র কর্মহীন 'কলিং-বেলটি' হয়ে জাগ্রত থাকতে হবে অফুরন্ত অবসরের মালিক অবসর প্রাপ্ত দ্বিতীয় পর্ব বৃদ্ধকেই।

কেন দ্বিতীয় পর্বেই তিনি 'কলিং বেল' হবেন? প্রথম পর্বে তার শাঁসে

জলে' অবস্থায় সকলেই সমীহ করেছেন ; দেহে বল ছিল, পাওনা গণ্ডার বকেয়া হিসেবের কুল কিনারা করতে প্রায়ই অফিসে যেতে হয়েছে, তেজ ও শক্তি, মেজাজ ও মর্জির তখনও দাম ছিল গ্রাহ্য ও স্বীকৃত। ক'এক বছরের মধ্যে গঙ্গায় যেমন অনেক জল বয়ে গেছে, তেমনি, সময় ক্রমশই ধোবীখানার পাটাতনটি হয়ে বৃদ্ধকে অনেক পাল্টে দিয়ে যাবে ; ততদিনে টাকার উষ্ণতা কমে গিয়ে ট্যাঁক যেন শীতল হয়ে উঠবে, শরীরের রস-রক্ত-শক্তি ভাঁটার টানে শীর্ণ হয়ে কঙ্কালে বইবে, মনের তেজ ও চেতনাশক্তিও কমে যাবে। তাই র‍্যাশনের দিনে তুমি যাবে চটের ব্যাগ হাতে করে ; সকাল সকাল বাজারটা সেরে নিলে তাজা তরি তরকারি স্বাদু মাছটুকু পাওয়া যায়, তাই তুমিই একমাত্র ব্যক্তি ; হঠাৎ আটা ফুরিয়ে গেছে, তো চট্ করে কাছের দোকান থেকে নিয়ে এসো। এমনি কতো! বৌমার হাত জোড়া, তাই তুমি যাও ছেলেকে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিতে। বিকেলের ঝামেলায় ফুরসত্ হবে না বলে তুমিই যাবে স্কুল ফেরৎ ছেলে-মেয়েকে হাত ধরে ধরে নিয়ে আসতে। বাচ্চাটা হাওয়া না হলে একেবারেই ঘুমুতে পারেনা, 'লোড শেডিং'-এ পাখাটা একটু নাড়লে ভাল হয়, না হলে উনুনে ভাতের তলা ধরে যাবে, ডাল পুড়ে যাবে, অথবা মাছের পিঠ একেবারে অখাদ্য ঝামা হয়ে যাবে! যাও, পাখা হাতে নাতির পাশে গিয়ে একটু বসবে! এ-সব কাজ তোমার বিধিলিপি ; কারণ তুমিই এখন ঘরে নিষ্কর্মা, অফুরন্ত সময়ের মালিক।

দুপুরে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে নেবে! একটু দিবানিদ্রার আয়েস অনুভব করতে চাও? কিন্তু পাশের ঘরে টি. ভি. তে সেই সময়টুকুই তো মহিলাদের জন্যে ধার্য। জাতীয় স্বীকৃতি নয়? মহিলা মহল। টেলিভিশন হোক বা রেডিও হোক, আসলে শব্দ-দুন্দুভি, কণ্ঠ-ব্রহ্ম অথবা যন্ত্র-তারণা। সুতরাং কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়। ছোট, স্কুলের গাড়ির সময়ও তো হয়ে এলো! তার পরে? বিকেল গুলোতে যদি ছোটদের হাত ধরে বা কোলে নিয়ে একটু বেড়াতে না যাও তাহলে ছোটরা শুনবে কেন? রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া গরু-ছাগল না দেখালে ওরা চিনবে কি করে, অভিজ্ঞতার পাল জমবে কিভাবে? মাঠের সবুজে দৌড়-ঝাঁপ করলে চোখ ভাল থাকে, মন চাঙ্গা হয়, খিদে বাড়ে, প্রসার বাড়ে চিত্তের। তাই ওদের নিয়ে বাইরে যাও!

বারে বারেই, এই দ্বিতীয় পর্বে, অফিসের কর্মজীবনের কথা মনে পড়বে। পাখার নিচে অকাতর বসে বসে সময় পার করার দিনগুলো এখন মনের ঘাড়ে চেপে বসবে। কতো স্বাধীনতা ছিল, কতো জনে সম্মান করত, একটু কাজ

আদায় করার জন্যে কতো বিনয় দেখাত, ধন্যবাদ দিত এবং আরও কতো কী? এখন গোঁফে সেই স্মৃতির সুধা-মাখা অতীত গন্ধবহ হয়ে উশখুশ করে উঠবে।

পুত্র তার সংসার নিয়ে অফিসের টাকায় হিল্লি-দিল্লি করে আসবে; তুমি ঘর পাহারায় গৃহে মজুদ থাকবে। তোমার হাঁটুতেও বাতের আক্রমণ ঘটবে, চোখে ছানির, মনে জড়ত্বের। ক্রমে ক্রমে তুমি মনের দিক থেকে, অনুভবের একাকিত্বে, অসাড় হয়ে উঠবে। চশমাটিকে বাধ্য হয়েই সহ্যের কাঁচ লাগিয়ে নেবে; উত্তেজনা ক্ষতিকর; তাই একটা সুখ-দুঃখের বাইরের অবস্থানে সর্বংসহ নিরুত্তাপ অস্তিত্বের মালিক হয়ে উদ্ভিদ জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হবে।

এবং এই প্রস্তুতিই তোমাকে তোমার তৃতীয় এবং শেষ পর্বে পৌঁছে দেবে। এখন তোমার হাঁটু শক্তি হীন, হৃদয় আবেগহীন, মন নিস্তেজ, চোখ আলোহীন। এখন তোমার সর্ব অস্তিত্ব 'হরি পার কর আমারে'-র মৃদু সঙ্গীতের মূর্ছনায় অপেক্ষাকে একাগ্র করে ভব সাগরের কুলে প্রতীক্ষারত। সংসার তোমার কাছে কিছু আর আশা করে না, প্রিয়জন প্রথম পাশে দাঁড়িয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করতে করতে এখন দরজায় দাঁড়িয়ে জীবন-যন্ত্রণার পরিমাপ করে মাত্র! অনুভূতিপ্রবণ দু'একটি প্রাণ সংসারে, সব সংসারেই, এখনও আছে বলে, থাকে বলে, তোমার চেতনার দ্বারে বারে বারে হাজিরা দেয়। বন্ধু, বান্ধব, আপনজন, প্রিয়জন এবং আত্মীয়স্বজন ধীরে ধীরে বহুদিন ধরেই তোমাকে ত্যাগ করতে থাকবে, বা করেছে। এখন তোমার দ্বিতীয় শৈশবের সর্বতো নির্ভরশীল জীবনে নির্ভর করার মতো কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম্ জননী পাবে না; প্রথম শৈশবের চপল চঞ্চল স্ফুটনোন্মুখ দিনের মতো রাত্রিজাগরণ আঁখি কোনও মাসি-পিসি ঠাকুমা-দিদিমার দেখা মিলবেনা। কোনও পিতা তোমার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবে না অফিস পালিয়ে, কোনও দিদি কোনও বালক-বালিকা তোমার শয্যা পার্শ্বে তোমার হাত-পা নেড়ে নেড়ে খেলা করা দেখার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে না। তোমার সঙ্গী সাথী বলতে এখন ঘরের দেওয়াল, ছাদের নক্সা আর শিকার লোলুপ দু'চারটি টিকটিকি সদাসর্বদাই তোমাকে ঘিরে থাকবে, তোমার ঘরের সিলিং-এ ঘোরা ঘুরি করবে। মাছি উড়বে ভবিষ্যতের আশায়, মশারা নিরামিষ দেহখানি—তোমার দেহে এখন রক্ত যা আছে তা ওদের শুঁড়ের দৈর্ঘ্যের বাইরে —ঘিরে তাদের বিরক্তি আর ধিক্কারকে ধ্বনিময় করে তুলবে।

কিন্তু এসব তোমার মনে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটবেনা। আঁচড় কাটবে না তার কারণ আঁচড় লাগার মতো তোমার মনটিই কবে উধাও হয়ে গেছে, হারিয়ে

গেছে, ফুরিয়ে গেছে! এসব আমাদের, দ্বিতীয় পর্বের বন্ধুদের, মনের অনুভব মাত্র; আমরাই আমাদের অনুভবগুলোকে তোমার অলস-অবশ মনে আরোপ করে চলেছি মাত্র। তোমার কোনই কষ্ট নেই; কারণ কষ্ট বোধটুকুও তুমি ততদিনে একে একে হারিয়ে ফেলেছ। তুমি তাকিয়ে থাক কিন্তু দেখনা, তুমি 'কে?'—বলে শব্দ কর, প্রশ্ন করনা; তুমি এখন শ্বাস নাও, কখনও নাকে কখনও কখনও মুখে, কিন্তু বাঁচ না; তোমার শ্বাসযন্ত্র যান্ত্রিক নিয়মে সচল, জীবনের প্রয়োজনে নয়। তুমি তোমার মৃতদেহটাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে ভিতরে বসে পাহারা দাও মাত্র; আর সেই পাহারাও চেতনার শেষ পর্বের, সুসুপ্তির পর্যায়ের, অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মানসগোচর। এটা তোমার চোখে তোমার বর্ণনা নয়; আমাদের চোখে তোমার বর্ণনা মাত্র। তুমি যে আছ তাও যেমন তুমি জান না, তুমি যে নেই তাও তুমি বোঝনা। আমরাই জানি, আমরাই বুঝি। প্রকাশ করি কারণ আমাদের তৃতীয় পর্ব এখনও আসেনি, কারণ আমরা নিজের স্বজাতিকে নিজেদের টানা গাড়িতে করে বধ্যভূমিতে বয়ে নিতে পারিনা, চেতনা আমাদের পীড়ন করে, অতীত আমাদের তাড়না করে, ভবিষ্যৎ আমাদের অবশ করে তোলে। তাই আমরা চেঁচাতে চাই, ঘোষণা করতে চাই, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'তোমরা দেখ, তোমরা জান, তোমরা ঝোঝ'; বলতে চাই চশমার কাঁচটাকে মুছে নাও, প্রয়োজন হলে পাল্টিয়ে নাও, সময়ের নদীতে সামনে পিছনে সাঁতার কেটে কেটে নিজ নিজ শৈশব, যৌবন, বার্ধক্যকে অনুপুঙ্খ তদন্ত করে দৃষ্টিকে পরিষ্কার কর, স্বচ্ছ কর; চশমা খুলে ফেলে সাদা চোখে প্রকৃতির আলোয় নিজেকে দেখ, নিজেদের দেখ এবং আমাদের দেখ।

এ-সবই তো ভাষণের মতো শোনাবে; ভাসানের, বিসর্জনের, সময়ে ওতে কি কাজ হবে? তাহলে শেষ করার আগে দু'চারটে কাজের কথাই বলা যাক।

প্রথম কথা: সময় থাকতে থাকতে সময়ের পিঠে চেপে বস; অসময়ে তাকে সাপ হয়ে ছোবল বসাতে দিও না। বার্ধক্যের নির্জন অন্ধকারে তোমাকে একা পেলে সময় ছেড়ে দেবে না, ছোবল বসাবে আর তোমার অবশিষ্ট জীবনকে বিষময় করে দেবে। জীবন মধ্যাহ্নের এবং অপরাহ্নের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ, খোঁজ খবর নাও এবং দাও। চিঠি পত্রে, ছুটির দিনে, পুজোপার্বণে, উৎসবের মেলামেশায় আর বেড়াতে যাবার সময়ে। সমান বয়স একই রকমের সমস্যা বয়ে আনে, বিশেষ করে বয়স-ভিত্তিক সমস্যা গুলো। যন্ত্রণাকে ভাগ করে নিতে পারলে, সঞ্চারিত করে দিতে পারলে, সহানুভূতির প্রলেপে যন্ত্রণার

বিষ অনেক খানিই কমে যায়। অন্ততঃ কষ্ট-দুঃখ-যন্ত্রণা যে আমার একারই বিধিলিপি নয় সেই অনুভবটুকুই বা কম কিসে? পুত্রশোকে কাতরা মাতাকে গৌতম বুদ্ধ সেই বোধে উদ্দীপিত করার জন্যেই তো মৃত্যুশোকহীন গৃহ থেকে এক মুষ্টি শস্য সংগ্রহ করে আনতে বলেছিলেন। বার্ধক্যের প্রথম পর্বে প্রয়োজন না হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে, সবিশেষ দ্বিতীয় পর্বে, নির্জনতা-নির্বান্ধবতা অনেকটাই কেটে যাবে।

দ্বিতীয় কথা ঃ সময়কে স্বাস্থ্য দিয়ে আক্রমণ কর; সে দূরে পালাতে পথ পাবে না। পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যায়াম এবং পরিকল্পিত সময়-নির্ঘণ্ট অনুসরণ কর। পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার এবং পুস্তক থেকে নির্দেশ নিয়ে নিজে নিজের বার্ধক্যের প্রথম পর্বকে দীর্ঘায়িত করে তোল। এর ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভাগে বেশি সময় পড়বে না!

তৃতীয় কথা ঃ সময়কে শূন্য হতে দিলে সে তোমাকে দিক্‌শূন্য করে ছাড়বে! তাই সময়কে কাজ দিয়ে, প্রচেষ্টা দিয়ে ভরাট করে তোল। লেখা দিয়ে, বইপত্র পঠন-পাঠন দিয়ে, রং-তুলি নিয়ে ছবি এঁকে, মাটি-পাথর-কাঠ দিয়ে শিল্প তৈরি করে; কাঁথা সেলাই করে, আসন বানিয়ে, গান করে, ছেলেমেয়ে পড়িয়ে—যার যেটা পছন্দ, যা যা পছন্দ তাই তাই করে সময়কে অর্থবহ করে তোল, ভরাট করে তোল, সার্থক করে তোল। যদি সেই কাজের সামাজিক বা অর্থনৈতিক মূল্য থাকে তাহলে তো কথাই নেই, একেবারে মা ভৈঃ। যদি তা নাও থাকে তাহলেও তার যেন মনের মূল্য থাকে, নিজের কাছে যেন সেই সৃষ্টি মূল্যবান বলে মনে হয়। মন তাজা থাকলে শরীরও তাজা থাকতে বাধ্য; নিজের মন-মর্জির মালিকানা হাতছাড়া করবে না।

চতুর্থ কথা ঃ বসনকে নয়, মনকে ছুপিয়ে নাও গেরুয়া রঙে। সন্ন্যাসীর মন তৈরি করে নাও। যত মত তত পথ; যত মন তত মঞ্জিল; যতো চোখ তত দৃষ্টি ভঙ্গি। পিতা মাতা মাত্রেই সন্তানের ভালর জন্যেই সব করেন! তাঁরা করুন। তাঁদের বয়স থাকলে, যুদ্ধে প্রবৃত্তি থাকলে এবং মনে বল থাকলে তাঁরা সন্তানের ভালর জন্যে সন্তানদের ত্যাজ্যপুত্র-ত্যাজ্যকন্যা করুন, সংগ্রাম করুন। সত্য ন্যায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রক্তের গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুতি বাড়ান—আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা সময় পার হয়ে গেলে তাদের এবং সকলের ভাল মন্দ ন্যায়-অন্যায় তাদের এবং সকলকে ভাবতে দাও, তাদের এবং সকলের নিজ নিজ হাতে ছেড়ে দাও। অবসরপ্রাপ্তদের জন্যে বিশ্বসংসার

অপেক্ষা করে বসে নেই ; জীবন নদীর গতিপথ থেকে আমরা তো অনেকটাই পাশে, দূরে সরে এসেছি। আমাদের কাজ এখন দ্রষ্টার, কর্তার নয়। মতামত চাইলে দেবো, অকারণ অনপেক্ষিত পরামর্শ বিপত্তির কারণ হতে পারে। ঈগোকে ত্যাগ করে মনকে সম্বল করে আত্মস্থ হয়ে পড়। চোখ এবং কান খোলা রাখ ; মুখটিকে যথাসম্ভব বন্ধ রাখার অভ্যাস কর। এটাই সন্ন্যাসের প্রধান পাঠ।

পঞ্চম কথা ঃ বিদুরের ক্ষুদ অথবা বিড়লার সম্পদ, যাই তোমার থাক তা ন্যায়ের দৃষ্টিতে ভাগ করে দাও। এবং কিছু নিজের বলে রাখ। এখানে সময় থাকতে ভাবনার এবং প্রস্তুতির প্রয়োজন সমধিক। তিনবার প্রত্যেককে ভাবতে হবে ; তিনটি চশমা লাগিয়ে। প্রথমবার যখন সদ্য অবসর নিয়ে 'বৃদ্ধ' হবে। এই বার্ধক্য প্রীতিপ্রদ ঠেকবে। শরীর ঋজু, মন চনমনে, স্বজনরা ভারি মিষ্টি মিষ্টি ঠেকছে, হৃদয়খানি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মতো সুপরিসর, সন্তানসন্ততি এবং প্রিয়জনেরা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতায় আর আতলান্তিকের নীলে মাখো মাখো, আবেগের আনন্দের আর স্বস্তির ঢেউগুলো পুরীর সমুদ্রসৈকতের শুভ্রশীর্ষ লহরীর মতো মনের আনাচে কানাচে মথিত করে চলেছে। এই সময়ে একটা পরিকল্পনা করবে, একটা খসড়া করবে—মনে মনে অবশ্যই। প্রকাশ করে নিজের পায়ে বেড়ি পরাবে না, ধোঁকার সম্ভাবনা আছে। যা কিছুই চক চক করে তা কিছুই কিন্তু সোনা নয়! দ্বিতীয় বার, যখন তুমি ভাঙ্গা কুলো, তখন আর একবার, একেবারে মাটির কাছাকাছি থেকে, ভাববে। হৃদয় তখন সংকুচিত, সাগর তখন গভীরতা এবং নীল উভয়ই হারিয়েছে, তরঙ্গ ভঙ্গ তখন বাক্য-ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়েছে এবং স্বজন-পরিজনেদের প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ বিন্দুতে স্থির হয়ে স্ব স্ব 'জ্যোতি' বিতরণ করে চলেছে। ঘাসের সবুজের নিচে তখন তুমি মাটির বর্ণ-গন্ধ-রূপ দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে। এই দ্বিতীয় পর্বে পুনর্বিবেচনা করবে। চশমাখানা আপনিই পাল্টে যাবে, অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে!

এবারে শেষ বার, তৃতীয় বার। যখন বুঝবে যে এ বারে নিজের দেহবহনের সময় এসে গেল তখনই ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলবে। নিজের জন্যে তিনহাত জমি অথবা চল্লিশ মণ কাঠের ব্যবস্থা রাখবে আর, সম্ভব হলে, একজন সেবিকার যাবৎ জীবন (তোমার, অবশ্যই) পারিশ্রমিকের সংস্থান রাখতে ভুলবে না। নিজের চিকিৎসা ওষুধ-পত্র-পথ্য—সেও ভাবতে হবে। আর সেই সংস্থান এমন হাতে রাখবে যে হাত পরিচ্ছন্ন, পশ্চাদাঘাতে দড় নয়। বাকি যা বাঁচবে, যদি

বাঁচে তখনও, তাহলে ন্যায়-নির্ণয়ে বাঁটোয়ারা করে দাও—তোমার চোখে যা ন্যায়। কালো রক্ত—ব্যাড্‌ব্লাডের—সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাবে না কারণ যে কোনও ব্যবস্থাতেই তার উদ্ভব অনিবার্য—কারণ মানুষের, প্রিয়জনের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্ব-স্ব-মূল্যায়ন আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য; তার উপরে সামাজিক প্রাণী হিসেবে মনে এক মুখে আর তো আমাদের বিধিলিপি! বিধিলিপি না, মানস লিপি?

তবে যদি বাড়িতে মন না বসে, ভাল না লাগে, এবং টাকার অংকে সম্ভব হয় তা হলে কোনও বৃদ্ধাবাসে চলে যেতে পারো। অনেক রকমের ব্যবস্থা আছে, আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে।

সমস্যা এখানেও সেই টাকা এবং মানসিকতা। যাদের টাকার সংস্থান নেই, দরিদ্র, তাদের সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। আটপৌরে জীবনের সমাপ্তিও আটপৌরে হয়ে থাকে। আঁচলে বা বালিশের নিচে যদি চাবির ব্যবস্থাটাই না থাকে তাহলে স্বার্থের সংঘাতটাও থাকে না। অর্থসামর্থহীন নিম্নবিত্ত জীবনে তাই অনটন সারাজীবনই পিছুতাড়া করে বলে দুঃখ কষ্ট ব্যাপারগুলোও গা সওয়া হয়ে যায়! ভাবনা বা দুশ্চিন্তার হেতুই থাকে না সেই জীবনে। গড়ানে জীবনের গয়ংগচ্ছ 'তিনমাথা' সমাপ্তি সকলেরই জানা, অপেক্ষিত। সেখানে যন্ত্রণা যা কিছু তা শরীরে, অনটনের জন্যেই। বার্ধক্য বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র যন্ত্রণা বয়ে আনে না; আনলেও তা অনুভবে ধরা পড়ে না।

অঢেল সম্পদের এবং অর্থের বেলাতেও বিশেষ কোনও সমস্যা নেই। সেখানে সমস্যা গুণগতভাবেই আলাদা। সমুদ্রে জলের অভাব হয় না; যদিও পানীয় জলের অনটন হতে পারে; মানসিকতাই সেখানে এককাত্র সমস্যা। মনকে মন্দির বানাতে পারলে, সন্ন্যাসে দীক্ষিত হতে পারলে শেষ জীবনের অনেক কষ্টকে নরম করে নেওয়া সম্ভব হয়।

যত যন্ত্রণা মধ্যবিত্ত সংসারের বৃদ্ধদের। অর্থসম্পদ একেবারে নেই তা নয় বলে মুক্ত নয়; অনেক বেশি, অঢেল নেই বলে ভারহীনও হতে পারে না। ব্যাঙের আধুলি নিয়েই সমস্যা। ভাগ করলে প্রায় থাকে না, কম পড়ে যায়। যে পায় সে বিতৃষ্ণ বোধ করে, যে পায় না সে মনে করে পেল না। না দিলে সকলেই নঞর্থক একাত্মতা বোধ করে, 'বুড়ো কেমন কৃপণ!' মনে মনে তারা জোট বাঁধতে পারে; 'দেখা যাবে শেষের সেই ভয়ংকর দিনে!' হাড়ের টুকরো

একখানা হলে সারমেয় সংঘর্ষ এড়ান দায়! এই ব্যাপারটা সমানভাবেই সত্য তোমার ছোট্ট বাড়িটা নিয়ে, কৃশ-শীর্ণ ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে এবং ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া স্বর্ণালংকার নিয়ে। আবেগ-অনুভব প্রেষণার দাবি উঠবে, যুক্তি-তর্ক আইনের কচকচি আসবে, ন্যায়-অন্যায়-এর সূক্ষ্ম বিচার তোলা হবে এবং সব শেষে সকলের মনেই 'গাছের ও তলার' প্রতি সমান দৃষ্টি থাকবে! কেকের খাওয়া ও পাওয়া একই সংঙ্গে কাংঙ্ক্ষিত থাকবে! সেই সমস্যার সমাধান?

নিজেরটুকু রেখে বাকিটা ওদের হাতেই ছেড়ে দাও! এবং তারপর? চোখ-কান খোলা রেখে মুখটি কুলুপ এঁটে বন্ধ করে দাও।

বাড়িতে কাকের বাসা হলে অথবা সারমেয় সংঘর্ষ হলে, গঙ্গার ধারে, বন্ধুর বাড়িতে অথবা মাঠের ধারে হাওয়া খেতে সরে পড়!

সকলেই যদি সহাবস্থানে তোমাকে পৌরহিত্য করতে বলে তাহলে সানন্দে দক্ষিণাটুকু উপভোগ কর।

॥ লেখকের অন্য বই প্রসঙ্গে মতামতের উদ্ধৃতি ॥

১। এবং জলবাংলার মনচিত্র

"এবং জল বাংলার মনচিত্র" 'প্রসঙ্গে ভূমিকায় সুসাহিত্যিক **শ্রীশৈবাল মিত্র** বলেন—

"অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য-এর 'এবং জলবাংলার মনচিত্র' গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি পাঠের সময়ে আচম্বিতে পুষ্পভারাবনত একটি গাছ আবিষ্কারের রোমাঞ্চ জাগলো।…লেখক এমন এক শৈলী উদ্ভব করেছেন, যার মধ্যে সাহিত্যের পরিচিত আঙ্গিকগুলির প্রায় সব লক্ষণ মিশে স্বতন্ত্র এক আকার গড়ে তুলেছে…"

"অর্ধেন্দুবাবুর স্মৃতিচারণায় দার্শনিকতার সঙ্গে আছে সরসতা, সাবল্য।… প্রথম হলেও পরিণত, পোক্ত রচনা। পাকা লাঠিয়ালের মতো পয়লা অঘাতেই তিনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর নৈপুণ্যে পাঠক যে বিমোহিত হবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।"

ঐ একই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্যিক **শ্রীসুনীল আচার্য** বলেন—
"সচেতনে বা অবচেতনে আবেশময় প্রকৃতির রসে সম্পৃক্ত হয়নি এমন বাঙ্গালীমনন সংখ্যায় সম্ভবতঃ নগণ্য।…পটভূমি পূব বাংলার দিগন্ত প্রসারী পরিবেশ প্রতিবেশ এবং মনীষা…সৃজনশীল, সংবেদনশীল।…সেখান থেকে তুলে আনা কিছু সোনালী ফসলের সম্ভার নিয়ে এই বইটির আত্মপ্রকাশ। এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর ঝিলিক…রসসৃষ্টির নিরিখে তিনি (লেখক) চিরন্তনের পাষাণে নিজের আখর চিহ্নিত করেছেন নি সন্দেহে।"

২। এবং প্রেম-অপ্রেম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের **অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়** ভূমিকায় বলেন—

"অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের গল্প সংকলন **'এবং প্রেম অপ্রেম'** এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। লেখক পেশায় দর্শনের অধ্যাপক নেশায় জীবনের রূপকার। তাঁর ছোট গল্প জাতে সত্যি ছোট গল্প। কয়েকটি অনু-গল্পও আছে।···শ্রীভট্টাচার্য ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া নরনারীর জীবনের প্রতি একটা গূঢ় আকর্ষণ বোধ করেন।···অনুচ্চকণ্ঠে নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এই সব ভাঙা মাস্তুল নরনারীর ছবি এঁকেছেন লেখক।

"···রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয়েছে এমন কিছু ছোট গল্প বা কবিতা এবং এমন কিছু কবিতা যা ছোটগল্প।···ছোট গল্পে কাব্যধর্মিতা বা কাব্যিক মেজাজ থাকলেও তাতে সোশ্যাল রিয়েলিটির প্রকাশ ঘটানো যায়।···শ্রীভট্টাচার্য এই শিল্প সত্য জানেন এবং আয়ত্বে এনেছেন এর শিল্পপ্রকরণ। তার পরিচায়ক প্রথম তিনটি গল্প···বস্তুত এই তিনটি গল্পে যে জীবনানুভূতি, কাব্যময়তা, শিল্প দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা তারিফ করার মতো।···

"···শতাব্দির সায়াহ্নে এমন সব গল্প পড়ার সুযোগ দিয়েছেন বলে গল্পকার শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

ঐ একই বই প্রসঙ্গে **শ্রীসুনীল আচার্য** পূর্বাভাষে বলেন—

"কিছু গল্প আর কয়েকটি ফিচার নিয়ে সংকলিত এই বইটি পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত। কখনও কৈশোরের আবেগানুভব, কখনও যৌবনের হৃদয়ানুভূতি কখনও বা পৌঢ়ত্বের জীবন জিজ্ঞাসা রচনাগুলির কেন্দ্রমূলে, কিন্তু সব কিছুকেই এক মানবিক মানদণ্ডে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াসে লেখকের আন্তরিকতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। ভিন্নধর্মী স্বাদের বৈচিত্রে সমুজ্জ্বল লেখাগুলি পড়ে পাঠক তৃপ্তি পাবেন···আবেগের যে ঘূর্ণি নিরন্তর দ্বন্দ্বের অভিঘাত আনে···লেখকের বর্ণনায় তার পরিচয় পেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই

"বইটিতে কিছু প্রেমের গল্পও আছে যার কয়েকটি আবার রোমানস্টিক-ধর্মী।···'তুমি ও সময়' গল্পে···আপ্লুত পাঠক অনায়াসে চলে যেতে পারেন রোমান্টিক কবি Keats-এর কাব্যভাবনায় যেখানে অনবদ্য চিত্রকল্পে কবি বলে ওঠেন—'Bold lover, never, never canst thou kiss,···For ever will thou love, and she be fair'."

৩। এবং তুমি

'এবং তুমি' প্রসঙ্গে শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"চরিত্রগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত।...কিন্তু নিতান্ত সাদামাঠা সাধারণত্বের মধ্যেও অসাধারণত্বের অন্বেষণে লেখকের আন্তরিকতা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট।...হৃদ্য আবেদনে সম্পৃক্ত চরিত্রগুলি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্পর্শে সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়ে গল্পকে এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে।"

"গল্পগুলিতে পুরুষের মত নারীও এসেছে অনিবার্যভাবেই, কিন্তু লেখকের কলমে তাদের ভূমিকা প্রায়ক্ষেত্রেই এক বিশেষত্বের দ্যোতনা পেয়েছে।" কোথায়ও পাঠক দেখতে পাবেন কেমন করে 'নারী তার আপন বৃত্তে সুস্থিত থেকেই পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠতে পারে' অথবা, 'স্নেহ ও প্রেমে পুরুষ ও পরিবারকে ভাঙনের সীমানা থেকে সরিয়ে এনে নিরাপত্তার রাজপথের দিকে চালনা করতে করতে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে', কোথাও পাঠক পাবেন 'লেখকের... অনবদ্য ভাবনার ফসল, মাতৃস্নেহের স্বরূপ উদ্ঘাটনের এক অসাধারণ মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা।' দেখবেন '...উপেক্ষিত শিশুদের স্নেহকাঙাল অন্তরের মন সমীক্ষণ...একটি শিশুর অন্তর্লোক ও বহির্লোকের ক্রমবিকাশের কিছু উজ্জ্বল বিবরণই শুধু নয়, পরিবারের প্রেক্ষিতে প্রবীন ও শিশুর পারস্পরিক চিৎ-অনুভবের আনন্দিত আখ্যানও।' দেখবেন—'একজনের সন্দেহের বিষ কিভাবে একটি গোটা পরিবারের মানসলোককে এক বিষম ঘূর্ণাবর্তে দিকহীন করে', এবং পাবেন আরও কত 'মরমী অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি... ।'

"বইটি তাই সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে,...কঠোর কঠিন এই বাণিজ্যিক যুগ হৃদয়ের নিরিখে কৃপণ বলেই...বিষন্ন পাঠকের অতৃপ্ত মন... অনুভবে প্রশান্ত হবে।"

৪। এবং ভূত

'এবং ভূত' প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপির শ্রোতা-পাঠকরা কি বলেন ?

তুলিকা (৮) : ডিটেকটিভ গল্প সব থেকে ভাল লেগেছে আমার। আমাদের মধ্যে যে কথাকাটাকাটি গুলো আছে, ঝগড়া আছে, সেগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।

পাপাই (১০) : অনেক মজা আছে। হাদান আর বনমালীর জন্যে কষ্ট হয়েছে। চোর ধরার ব্যাপারটা দারুণ ভাল লেগেছে। অন্য ভূতের গল্পে শুধু ভয় থাকে। তোমার গল্পে আমরা জড়িয়ে গেছি—এটা খুব ভাল লেগেছে। আমাদের ঝগড়াগুলো দারুণ জমেছে।

টুকান (১৩) : ভূত, গোয়েন্দাগিরি, মিনি-পুষি এবং হাজুকাকার ভূত, ছিনাথের ভূত—সব একসঙ্গে এসেছে বলে বেশি ভাল লেগেছে। ছোটদের, আমাদের, ঝগড়া-তর্ক—এসব বেশ নোতুন, বেশ ইণ্টারেস্টিং হয়েছে। লেখার মধ্যে একটা মজা যেন সর্বক্ষণ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বলার কায়দাটা সব সময়েই টেনে ধরে রাখে।

শ্রীজয় (২২, বিজ্ঞান ছাত্র) : জোর দিয়েই বলতে পারি যে এই গল্প সম্ভারের প্রতিটা গল্পই নিজ নিজ বিষয় সাপেক্ষে এক একটি ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ভূত সম্বন্ধীয় গল্পগুলো আমার পড়া অন্যান্য ভূতের গল্প থেকে একেবারেই আলাদা। আমার মত অন্যান্য যুক্তি এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের এই গল্পগুলি ভাল লাগবে।

সানুশ্রী (অধ্যাপিকা) : কিশোর মনের এলোমেলো চলার সেই চিরচেনা পথে 'এবং ভূত' এক নতুন মোড় এনেছে। লেখকের চিন্তার পরিশীলনে এবং প্রকাশনৈপুণ্যে ফেলে আসা সেই ভূত-প্রেত, পুতুল-মিনির পুরোনো জগৎটাই নতুন চোখে দেখার সুযোগ পেলাম।

সমীর (৬২) : 'এবং ভূত' শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও অনাবিল আনন্দ দেবে!

সুনীল (৬২) : 'এবং ভূত' গ্রন্থের গল্প গুলিতে এক মোহময় অথচ দৃপ্ত সুরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য যা টানটান আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে পাঠককে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখবে। হাজুকাকার চরিত্রটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি, যিনি অত্যন্ত নাটকীয় রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোটদের হাজুদাদু হয়ে সরাসরি গল্পের আসরে হাজির হয়ে সকলকে মাতিয়ে যান। এমনকি শ্রীনাথ বহুরূপীও এসে যায় তাঁর আকর্ষণে। 'এবং ভূত' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নবতম সংযোজনই শুধু নয়, এক অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষাও।

৫। **দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা ঃ** [মিত্র এণ্ড ঘোষ]

শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্য সুসাহিত্যিক, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা তাঁর পেশা। 'দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা' নামের যে পাণ্ডুলিপিটি তিনি অতি সম্প্রতি প্রকাশনার জন্যে মিত্র এন্ড ঘোষকে দিয়েছেন সেখানে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর সাহিত্য সত্তার হাত ধরে রমনীয় পদচারণায় স্বাভাবিক ভাবেই সাবলীল। বস্তুতঃ আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে এখানে ঝংকৃত হয়েছে বিজ্ঞান ও কলার দুটি ভিন্নমুখী সুরের যুগলবন্দী, যা পাঠক সমাজের সম্মুখে এক মনোরম অর্জন এবং উপভোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই শাস্ত্রটি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের অনীহার কারণগুলি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল, তাই যুক্তি তর্কের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা-গুলি নিছক পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যে কোথাও নীরস বা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি; বরঞ্চ ব্যবহৃত উপমাগুলিও মাঝে মাঝেই শাণিত কৌতুকের ছটায় রংমশালের দ্যুতি ছড়ায় যা সর্বশ্রেণীর পাঠকের ঔৎসুক্যকে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখে।

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অন্তপুরে প্রবেশ করার এমন যে এক আলো উদ্ভাসিত সহজ সরল সরণী থাকতে পারে সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের লেখায় আমরা অবশেষে তার হদিস পেয়ে যাই। বাংলাভাষী পাঠকের দরবারে এ বিষয়টিতে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে পূর্বসুরির আসনে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

—**শ্রীসুনীল আচার্য**